পদাবলীর পথ

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য



ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রী সুরেশ চন্দ্র দাশ
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন
কোলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৭

মুদ্রণ ঃ
শ্রী শিবব্রত ভট্টাচার্য
জোনাকি প্রেস
৭৯-এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রী বিন্দুভূষণ পাল

পদাবলীর পথিককে

PADABALIR PATH

(Alochana on Vaishnava & Shakta Padavali)

by

Prof. Dr. Ramjiban Acharyya M. A. (Beng. & Sans.)

Ph. D. (cal)

Kabyapuranatirtha, Puranaratna, Sahitya binod.

॥ ভূমিকা ॥

'পদাবলীর পথ' নির্দিষ্ট একটি ভক্তি, অনুরাগ ও সাধনার পথ। 'পদাবলীর পথ'-গ্রন্থের বিদগ্ধ গ্রন্থকার ডক্টর রামজীবন আচার্য দু'রকম ভাবে ঐ পথের পরিচয় দিয়েছেন: একটি রস-ভাব-সুবলিত-মাধুর্যপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্যকাননের কুসুমাকীর্ণ পথ, আর অপরটি সাধনানুসৃত প্রত্যক্ষ-জীবনানুভূতির পথ। তবে পথ দু'রকম বলে মনে হলেও চরম ও পরম-লক্ষ্য তাদের এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। সুবিজ্ঞ ও সুলেখক গ্রন্থকার এই দু'টি পথের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর সাংস্কৃতিক আলোচনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

পদাবলীর 'পদ'-বল্‌তে গানকে বুঝায়। বিশেষ ক'রে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক-পর্যন্ত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা-সাহিত্যে শিব ও শক্তির মাহাত্ম্যই লক্ষ্য করার বিষয়। একথা ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন আরও অনেক বিদগ্ধ সাহিত্যিক। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ ও পরে সাধক কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ এবং আরও অনেক শক্তি সাধকেরা শাক্ত-পদাবলীর রূপ ও বিকাশকে আরও সরল, সুপরিচ্ছন্ন ও সুবিস্তৃত করেছিলেন বাঙলার তথা তদানীন্তন বৃহত্তর-বাঙলার সমাজে। অবশ্য কোমল-কান্ত-পদাবলীহিসাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে ও মধ্যভাগে মহাকবি জয়দেব-বিরচিত শৃঙ্গার ও শান্ত-রসাত্মক 'গীতগোবিন্দ'-পদগান বাঙলার সাহিত্য ও কাব্য-জগতে এক অসাধারণ অবদান সৃষ্টি করেছিল,—যদিও ঐ পদগান রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্যের রসায়িত বর্ণনায় ও আলোচনায় পূর্ণ। গীতগোবিন্দ-পদগানের বহু টীকা বর্তমান থাকলেও সঙ্গীতরসিকেরা বিশেষভাবে 'রসিকপ্রিয়া' ও 'রসমঞ্জরী'-টীকাদুটিকে রস-ভাব-সৃষ্টির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। 'গীতগোবিন্দ'-গীতিকাব্য রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় মুখর ও প্রাণবান সেকথা বলেছি। রাধাকৃষ্ণের লীলানির্য্যাসই ঐ পদগানে বিশেষভাবে নিহিত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি জয়দেবকে বহিঃপ্রকৃতিসম্পন্ন সাধক বলেছেন কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা ক'রে। তিনি বলেছেন: "বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর একদল বাহ্য-প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন।......প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী-যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিতকুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনী-

তরঙ্গবৎ সতত চাক্‌চিক্য সম্পাদন করিতেছে। ......বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ নাই......। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য ; বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তরপ্রকৃতির রাজ্য।...... বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা (পদাবলী), বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা (পদাবলী)' বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। ...... জয়দেবের গীত (পদগান) রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ, বিদ্যাপতির গীত (পদাবলী) রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্খা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। ......জয়দেবের কবিতা (পদগান) স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা (পদাবলী) রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ-গীতি, বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস" (বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাপতি ও জয়দেব)।

মোটকথা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত যে, কবিতা, গান, পদাবলীর ধারা যতই বহিঃপ্রকৃতিকে ত্যাগ ক'রে অন্তর-প্রকৃতিমুখী হয়, ততই তার মহিমা ও মাধুর্য্য "ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া উঠে"। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তে—যে গীতিকবিতা, গান, সাহিত্য ও কাব্য অন্তর-প্রকৃতির শুচি-শুভ্র-ভাবধারায় অভিষিক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়ে অসীম ও শাশ্বত আনন্দরাজ্যের পথে পরিচালিত হয়, সেই গীতিকবিতা, গান, সাহিত্য ও কাব্যই স্বভাবগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহান চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস প্রভৃতি বিদগ্ধ বৈষ্ণব তর্কবিদের এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি জীবনসিদ্ধ শাক্ত কবিদের কবিতায়, শাক্তপদে ও গানে এই অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মভাবের স্ফুরণ ও প্রকাশই সমধিক দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় পনেরো-ষোলশো শতকের পূর্বে বৈষ্ণব-ভাবধারানির্মুক্ত কিন্তু তন্ত্র-যোগ-নিষ্ণাত বৌদ্ধ-গাথা ও বজ্র পদগানের লীলায়ণে লক্ষ্য করা যায় বহিঃ প্রকৃতির পাশাপাশি অন্তঃপ্রকৃতির স্পর্শ বা প্রকাশ। মহাযানী ও বিশেষ ক'রে বজ্রযানী-বৌদ্ধ সাধকদের শূন্যরূপিণী নৈরাত্ম্যদেবী উপাসনায় আভিপ্রায়িক ভাষার প্রলেপে সাধনমূলক পদগানগুলিকে 'পদাবলী' নামের পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।[১] বৌদ্ধ-চর্যা ও বজ্র পদগানগুলি ছিল শাস্ত্রীয় রাগে ও তালে সম্পৃক্ত হ'য়ে অধ্যাত্মভাবের প্রেরণাদায় করে যদিও পঞ্চদশ থেকে অষ্টদশ শতকের বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি এবং তার পরবর্তী মহাজন-বৈষ্ণব-কবি ও সাধকদের রচিত পদগানের ভাষা, সারল্য ও লালিত্য এবং শাক্তকবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-গীতিকারদের রচিত শাক্তপদগানের ললিত-শান্ত-রসায়িত ছন্দ ও ভাষা সমগোত্রীয় ছিল না, তবুও অধ্যাত্মভাবে, রসে ও ব্যঞ্জনায় বাংলার গীতিকাব্যের ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে তারা অপরূপ ও অমূল্য-রত্নসামগ্রী ব'লে গণ্য ছিল।

কিন্তু তাহলেও বলি যে, বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলীর সমপ্রকৃতিক রস-ভাবধারার কথা বাদ দিলেও ঐ উভয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য

১। পদগুলিকে প্রবন্ধরূপে শাস্ত্রীয় রাগে ও তালে গান করা হত।

অবশ্যই আছে এবং একথা বহু কাব্য-সাহিত্য-রসিক মানুষই স্বীকার করেন। বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলী এই পদ-সাহিত্য-দুটির পদ-রচনার রীতি-প্রকৃতি ও ভাববৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখি যে, বৈষ্ণব-পদাবলীর রচনার সমগ্রই গান, কিন্তু তাহলেও সেই গানের নিজস্ব একটি ছন্দ, ভাষা ও ভাব এবং বিশেষ ক'রে একটি উদ্দেশ্য আছে, শুধুই তা কীর্তিগাথাসমাকীর্ণ কীর্তন অর্থাৎ কীর্তনগান নয়, এবং সেজন্যই মনে হয় যে, বৈষ্ণব-পদাবলীকে নিছক কাব্য ও সাহিত্য বলেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য এ'কথা ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও তাঁর অসামান্য 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শক্তি-সাহিত্য'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শাক্ত-পদাবলী সেদিক থেকে কবিতার চেয়ে গানের মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তাকেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাছাড়া আবার তত্ত্বদৃষ্টি ও তাত্ত্বিক-ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে দেখি যে, বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্তপদাবলীর এই উভয় রচনার মান ও মূল্য প্রায় সমানই, কারণ কবি বিদ্যাপতি যেখানে ব্রজ-সম্বন্ধীয় ব্রজবুলি-ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাস সেখানে স্বাভাবিক বাংলা-ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদগান রচনা করছিলেন,—যদিও তত্ত্ব-ভাবনার দিক থেকে উভয়েই সচেতন ছিলেন। 'পদাবলীর পথ'-গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর রামজীবন আচার্য ঠিক কথাই বলেছেন ঃ "বিদ্যাপতি যেমন ব্রজবুলিতে, চণ্ডীদাস তেমনি স্বাভাবিক বাংলায় রাধা-কৃষ্ণ-গীত গাহিলেন। বিদ্যাপতি প্রবর্তিত ব্রজবুলি যেমন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসে শুষ্ঠু রক্ষিত, চণ্ডীদাস-বাহিত বাংলা তেমনি জ্ঞানদাস, বলরামদাস-প্রমুখে সহজ-বাহিত। পরবর্তীকালে ব্রজবুলি ও বাংলা মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে"। ব্রজবুলি ভাষা কিন্তু একটি মাত্র ভাষার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় গড়ে ওঠেনি। ব্রজবুলির গঠনে বাংলা-সংস্কৃত-অবহট্ট, প্রাকৃত ভাষাগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা স্বীকৃত। কিন্তু তাহলেও বলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত রস-ভাব-মাধুর্যপূর্ণ পদগান বা পদাবলী যেমন নিগূঢ় ও সুগভীর তত্ত্বাবগতির ক্ষেত্রকে প্রসারিত বা উন্মুক্ত করেছে, সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-রচিত শাক্ত-পদাবলীর রচনা তেমনি শক্তি-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বের ও মর্মকথার অবগুণ্ঠন মোচন করার ইঙ্গিত দিয়েছে। সেজন্য উভয়-পদাবলীর রচনা শুধুই রাগ ও তালযুক্ত গান বা কীর্তন নয়, ঐ গানের বা কীর্তনের প্রতিটি কথায়, ভাষায় শব্দের উচ্চারণে ভাবের ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বরসনিহিত নির্যাস তাদের প্রাণময় ও আনন্দময় করেছে।

সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্তসাধক অযথাই অর্থ-ভাব-হীন ভাষার সমাবেশ দিয়ে গান রচনা করেন নি। তাঁরা জীবনে শক্তি সাধনা ক'রেও গভীরানুভূতির অতলে ডুব দিয়ে প্রকৃততত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। সাধনায় বাধা-বিপত্তির অবরোধ ও তাদের থেকে মুক্তির কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁদের গানে (পদগানে)—এতে ক'রে পরবর্তী অনুগামী সাধকেরাও আলোকের ইঙ্গিত ও আশ্বাস লাভ করেছেন সাধনজীবনে। সুতরাং দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ও তার পরবর্তী সমাজে গানের সাধনার মধ্যে পাশাপাশি প্রত্যক্ষ-তত্ত্বাবগতির ভাবধারাকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। সেজন্যই বলি

যে, বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলী দুটি রচনার ও সাধনার ধারা বাংলা সাহিত্যের ও গীতিকাব্যের সমুন্নত ক্ষেত্রকে সার্থক ও মহিমান্বিত করেছে। চৈতন্যপরবর্তী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তন বৈষ্ণবগণের প্রধান সাধনরূপে স্থান পেলেও লীলামাধুর্যের স্মরণ-মনন-কীর্তনের অবসরে আধ্যাত্ম-তত্ত্বসাধনা ও প্রত্যক্ষতত্ত্বাবগতির উপযোগিতাও কোন দিনই কোনদিক দিয়ে অবহেলিত হয়নি। শাক্তপদাবলীর ক্ষেত্রেও তাই। শাক্ত-পদাবলীর পদকর্তারা সকলেই প্রায় আধ্যাত্ম সাধনার পথচারী ছিলেন এবং গান বা সঙ্গীত বা কীর্তন ছিল তাঁদের জীবন-সাধনার ও অনুভূতির অঙ্গ ও সহায়ক।

সুতরাং এই প্রসঙ্গে পুনরায় বলি যে, শাক্ত-পদাবলী মূলত সাধন-সঙ্গীত হলেও তার বিকাশ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত : একটি লীলাগীতি—কাব্যরসমিশ্রিত ও অপরটি ছিল বিশুদ্ধ-সাধনগীতি—তত্ত্বদৃষ্টিমূলক। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের ভক্তি-যোগাশ্রিত তান্ত্রিক-সাধনা ছিল অতীন্দ্রিয়-অনুভূতির প্রত্যক্ষ-স্পর্শযুক্ত। সেখানে কুণ্ডলিনীশক্তির পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এই তিনটি বিচ্ছুরণ বা প্রকাশ অনাহত-নাদ নামে পরিচিত এবং কুণ্ডলিনীর চতুর্থ বিচ্ছুরণ বা প্রকাশ বৈখরী আহত-নাদ। চর্যা ও বজ্র-গীতিকারগণ ঐ অনাহত পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমাকে বীণাযন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন। কুণ্ডলিনীর ঐ তিনটি অন্তর্বিকাশ স্বর্গের 'ত্রিপাদ' নামে অভিহিত। বৌদ্ধ-সাধকরা অনাহত-বীণাযন্ত্রের লাউকে বলেছেন সূর্য ও চন্দ্র বীণারতন্ত্রী বা তার। চন্দ্র-সূর্য-নিদর্শনাঙ্কিত তত্ত্বসমৃদ্ধ চর্যা-বজ্র-পদগীতি সাধকের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত ক'রে সগুণ ব্রহ্মরূপ নাদ বা প্রণবকে প্রাণময় করতো এবং তখন নির্গুণ ব্রহ্মে-সাধক উপনীত হতেন। বৌদ্ধ-তন্ত্র-সাধকরা কিন্তু নির্গুণের উপাসনায় শূন্যরূপ নৈরাত্মদেবীর উপাসনা ও ধ্যান করতেন। সুতরাং পদগানে মনের সঙ্গে প্রাণের এবং মন-বুদ্ধির সঙ্গে বোধির যোগসূত্র রচিত ছিল, সেজন্যই বলি যে, দশম একাদশ শতকের পদাবলীতে (বা পদাবলীগানে) সাধ্য-সাধনালক্ষিত কর্মরূপে উপাসনা ও প্রাণদীপ্ত অনুভূতি এই দু'রকমেরই অন্তর্ভুক্তি ছিল।

শাক্ত-পদাবলীর কথা পূর্বে বলেছি, কিন্তু তাহলেও কিছুটা পুনরাবৃত্তির পথ নিয়ে বলি তার তত্ত্বাংশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল পদাবলীতে তত্ত্বাংশই প্রধান, আর রচনাংশ ও সাধনাংশ অপ্রধান হলেও সহায়ক। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি জীবনসিদ্ধ রচয়িতা ও সাধকগণ তাঁদের পদগান রচনা করেছেন একটি লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে,—যে লক্ষ্য প্রতিটি মানুষের জীবন-সমস্যার ও সাধন-সমস্যার চিরসমাধান করতে সক্ষম। সাধক রামপ্রসাদের একটি গানের কথাই বলি। রামপ্রসাদ বলেছেন—

কালী পদ্মবনে হংসসনে
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে
সদা যোগী করে মনন ॥

আত্মারামের আত্মা কালী
প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জাননা কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম
অন্য কেবা জানে তেমন ॥

শক্তিরসমিশ্রিত যোগে কুণ্ডলিনী কালীর ধারণা ও ধ্যান করেন সাধক প্রথমে এবং পরে সহস্রারপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলনসাধন করেন মহাসুখ বা মহামুক্তি রূপে সামরস্য-রস পান করার জন্য। প্রথমে সুপ্তি ও পরে জাগরণ। এটি তন্ত্র সাধনার হলেও 'অদ্বয়তত্ত্বগ্রন্থ' এবং বেদান্তেরও এটি অনন্যদৃষ্টি ! আমরা জানি যে, অদ্বৈতবেদান্তের অদ্বয়তত্ত্ব ও তন্ত্রযোগাশ্রিত-তত্ত্বসাধনার অদ্বয়তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা আছে। পদ্মবনে 'হংসী' মহাশক্তি হংসরূপ শিব বা বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের সঙ্গে যখন সমাসক্ত বা মিলিত হন তখনই শাক্ত-পদাবলীর সার্থকতা সম্পন্ন হয়। বাচক প্রণব কার্য-কারণ-ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বররূপ সগুণ-ব্রহ্ম তখন নির্গুণব্রহ্ম তুরীয়ের পথপ্রদর্শক। সাধক রামপ্রসাদ শ্যাম ও শ্যামা—শিব ও শক্তি —ব্রহ্ম ও কালীকে এক ও অভেদ-দৃষ্টিতে উপাসনা করেছেন, ফলে শাক্ত-পদাবলী চরমানুভূতির ক্ষেত্রে নিজেকে শুধু মৃন্ময়ে নয়, চিন্ময়সত্তায় বিধৃত ও উন্নীত ক'রে শক্তিসাধনার চরম-সার্থকতা লাভ করেছে। সেখানে ভেদ ও অভেদের পারে সর্বাশ্রয়ী-সত্তায় সাধক উপনীত হন। সুতরাং সেখানে না থাকে আকার, না থাকে নিরাকার ; না থাকে দ্বৈত ও না থাকে অদ্বৈত ; তখন কেবলই সর্বচরাচরব্যাপী চিন্ময়-আলোক আর আলোক। সাধনসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ তাই ভিন্নভাবে বলেছেন—

হৃৎকমলমঞ্চে দোলে
করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে
দিবস-রজনী'ওমা ॥

এখানে তন্ত্র-যোগাশ্রিত সাধনার সহায় ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরূপ স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী নদী তিনটি। সুষুম্নার মধ্যে ব্রহ্ম-সনাতনী-কালী সেখানে জাগ্রতা। পথ অতিক্রম করার পরেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার নিদর্শন, সাধনাকে অতিক্রম করার পরই সাধ্যতত্ত্ব-অনুভূতির সঙ্গে মিলন ও আনন্দ। এই আনন্দ নিত্য ও শাশ্বত। তন্ত্রে ও যোগে দুইয়ের মিলন, কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তে একমাত্র এক ও অখণ্ডেরই একমেবাদ্বিতীয়মে স্থিতি। এই স্থিতিতে সকল-কিছু আপাতপ্রতীয়মান দ্বৈত ও বৈচিত্র্য একাকার হ'য়ে অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। যথার্থ-শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকেরা তাই তন্ত্রের কালীতত্ত্ব, যোগের পরমাত্মা-তত্ত্ব, বেদান্তের ব্যাখ্যাতত্ত্ব ও বৈষ্ণবসাধনার রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে একই রসে জারিত ক'রে

শাশ্বত আনন্দানুভূতিতে বিভোর হয়ে থাকেন। এই আনন্দানুভূতির ক্ষেত্রে শ্যাম ও শ্যামা, শিব ও শক্তি এবং ব্রহ্ম ও রাধা এক ও অভেদ। 'পদাবলীর পথ'-গ্রন্থের বিদগ্ধ গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে তাঁর গ্রন্থের "শ্যামাগানে শ্যামভাবনা"-পর্যায়ে এই অভেদতত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "যে জাতি মৃদংগ-করতালে রাধাকৃষ্ণ-গানে মাতোয়ারা, সেই জাতি খঞ্জনী একতারায় শ্যামাগানে বিভোর"। পুনরায় বলেছেন "আর এমন এক সময় আসে যখন শ্মশান ও মাধবী-কুঞ্জের ভেদ ঘুচিয়া যায়, বিল্বদল ও তুলসীপত্রের পার্থক্য থাকে না, রক্তচন্দন ও হরিচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, অস্থিচূর্ণ ও কুমকুম প্রভেদ হারাইয়া ফেলে"। গ্রন্থকারের এই দৃষ্টি প্রশংসনীয়। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলী অনুশীলনের চরমসার্থকতা কিন্তু তাই। গ্রন্থকারের আলোচনা এখানে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

পরিশেষে বলি, ডক্টর রামজীবন আচার্য 'পদাবলীর পথ'-গ্রন্থে পদাবলী-সম্বন্ধে বিচিত্র আলোচনার অবতারণা ও আলোচনা করেছেন, সুতরাং সেই সবের পুনরাবৃত্তির পথ থেকে আমি নিবৃত্ত হলাম। তিনি শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি রসের আলোচনাও সুনিপুনভাবে করেছেন—যে আলোচনা বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলী-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়। পূর্বরাগ ও অনুরাগের আলোচনায় তিনি বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রমতে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত 'উজ্জ্বলনীলমনি'-গ্রন্থের প্রমান দিয়েছেন। পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গাররসেরই একটি অংশ বা বিকাশ। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের যে চারটি প্রকাশ—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস তারা নায়ক-নায়িকার ও সাধক-সাধিকার জীবনে সার্থক-অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত আনন্দানুভূতি সঞ্চার করে। বৈষ্ণব-সাধকেরা মান, মাথুর, কলহান্তরিতা, রাস প্রভৃতি বিভিন্ন পালাগানের ডালি সাজিয়ে সাধ্য-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মহিমা ও লীলামাধুর্য আস্বাদন করেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ রাধাকৃষ্ণ-রস আস্বাদন করাই পদকর্তা ও সাধকগণের মুখ্য-উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের সুনিপুণ ও সুপণ্ডিত গ্রন্থকার সকল-কিছু প্রসঙ্গের এবং প্রমাণের ও আলোচনার ক্ষেত্রকেই সম্প্রসারিত করেছেন শুধুই যুক্তি বিচার দিয়ে নয়, একান্ত নিষ্ঠার, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রলেপ দিয়ে। গ্রন্থের আলোচনা সুসঙ্গত, সাবলীল এবং তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কথামুখ

বাঙ্‌লা সাহিত্যের অতি অমূল্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পদাবলীর কালব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাহার কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠককে যেমন বলিয়া দিতে হয় না তেমনি বলিয়া দিতে হয় না সহৃদয় পাঠকের আস্বাদে তাহার ক্ষণে ক্ষণে নবত্বপ্রাপ্তির রমণীয়তা প্রসঙ্গে। বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় পদাবলীর উৎস সংস্কৃতভাষাবাহিত বেদ, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি। অগ্রজ সাহিত্যরূপে বৈষ্ণবমহাজনপদের আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী। আর অনুজসাহিত্যরূপে শাক্তমহাজনপদের আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী। উভয় পদসাহিত্যের কাব্যকায়াপরিগ্রহের কাল সময়সীমায় বহুব্যবহিত হইলেও উভয়ের প্রভাববিস্তার বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের এমন সমন্বয় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বিরলদৃষ্ট। বৈষ্ণবভাবধারার ক্ষেত্রে যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্য, শাক্তভাবধারার ক্ষেত্রে তেমনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। বাঙ্‌লার ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অনবদ্য ভাব ও অলৌকিক পবিত্রতার পরিচায়ক শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণের মঙ্গল-মধুর স্পর্শ উভয় পদসাহিত্যকে এক দিব্যবিভা ও স্বর্গীয় সৌরভ দান করিয়াছে। বাঙালী হৃদয়ের যে ভক্তিভাবুকতা বৈষ্ণবগীতিকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ভক্তিভাবুকতাই শাক্তগীতিকাব্যের মূলকারণ। যে জাতি মৃদঙ্গ-করতালে রাধাকৃষ্ণগানে মাতোয়ারা সেই জাতিই খঞ্জনী-একতারায় শ্যামাগানে বিভোর। আর এমন এক সময় আসে যখন বল্লরীবিতানিত কুঞ্জকানন ও ভীষণ-রুক্ষ শ্মশানস্থলীর ভেদ ঘুচিয়া যায়, তুলসীপত্র ও বিল্বদলের পার্থক্য থাকে না, মাধবী ও জবা ভিন্নতা ভুলে, হরিচন্দন ও রক্তচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, কুংকুম ও অস্থিচূর্ণ প্রভেদ হারাইয়া ফেলে, মৃদঙ্গ-করতাল-খঞ্জনী-একতারা অভাবিত ঐকতানে উদ্দাম হইয়া বাজিতে থাকে, আর সেই বাঙালীর হৃদয়মন্দিরে শ্যাম-শ্যামা একাকার হইয়া যান। যে হিমগিরির গহনকন্দরে গঙ্গোত্রী সেই নগরাজের দুর্ভেদ্যদরী-স্থলেই যমুনোত্রী। গঙ্গাই হউক যমুনাই হউক সাগর-সঙ্গামিনী হইয়া অনন্ত অম্বুধিতে মিশিয়া গিয়াছে। শিবমৌলীবিহারিণী জাহ্নবী গঙ্গার তরঙ্গ-বিভঙ্গে অবিরত ধ্বনিত হইতেছে হর হর হর হর। আর রাধাকুঞ্জাবিলাবিনী কালিন্দী যমুনার স্রোতোমুখে সতত শব্দিত হইতেছে হরি হরি হরি হরি। কিন্তু উভয় প্রবাহেই আনন্দবেদনার কলগীতির মুখরতা। বাঙালীর ভক্তকবিচিত্তে আনন্দ-বেদনার প্রকাশনা বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী সাহিত্যের সুধারসসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মনন ধর্ম ও মানসবিশ্লেষণ, যুগজীবন ও পরিবেশ প্রতিবিম্বন ইত্যাদির ঊর্দ্ধ্বে ও মহাজনগীতিকাব্যধৃত ললিতপদবন্ধনের শ্রবণরোচন গুণগৌরব ও ভাবগাম্ভীর্য্যে চমৎকার-বিধায়িনী হৃদয়স্পর্শক্ষমতা বিতর্কাতীত।

প্রথম পর্য্যায় বৈষ্ণবপদাবলী ও দ্বিতীয় পর্য্যায় শাক্তপদাবলী—এই পরিকল্পনাক্রমে পদাবলীর পথ রচিত। তবে আরম্ভে পদাবলী প্রসঙ্গ-বিভাগে ও পরিশিষ্টাংশে উভয় পদাবলী বিষয়ক নানা আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থে বিবিধ আলোচনার অবসরে বিভিন্ন আকর ও রসগ্রন্থ হইতে উৎকলনের সঙ্গে

সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের তুলনীয় অংশের উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছে। এখানে উল্লেখ থাকে এই গ্রন্থরচনার প্রাক্‌কালেই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে ঋতু প্রকৃতি, শ্যামাগানে শ্যামভাবনা, ভক্তের আকৃতিতে রূপকের রূপ, শাক্তপদসাহিত্যে শক্তিদেবতার রূপ ও কবিমন, শাক্তপদসাহিত্যে সুভাষিত সমীক্ষা, শাক্তপদাবলীসাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্ত, আগমনী ও বিজয়াগানে মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত শাক্ত গীতিপ্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের শ্যামাগীত—বাল্মীকি প্রতিভা, বিসর্জন ও অন্যত্র, রজনীকান্তরচিত শক্তিগীতি, প্রভৃতি অনালোচিতপূর্ববিষয়ক প্রবন্ধনিচয় বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববাণী, প্রণব, আর্যদর্পণ, বাসুদেব, সাধনপথ, উজ্জীবন, ভাবমুখে, উজ্জ্বলভারত, গায়ত্রী, শ্রীসুদর্শন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পদাবলীর পথ পদাবলীবিষয়ে পথনির্দেশ নহে। পথনির্দেশনার ধৃষ্টতা আমার নাই। বৈষ্ণব-শাক্ত কবিজনের পদসমুচ্চয়ে সঞ্চিত ভাবরাশি ও সৌন্দর্য-রাজির বিনম্র বীক্ষাবিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। মহাজন-গমন-সরণিকে শরণ্য করিয়াই আমার অগ্রসরমানতা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকশ্রেণীতে পাশ ও বাঙ্‌লা সাম্মানিক বিভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তমহাজনপদকে পাঠ্যরূপে স্বীকৃতি দিয়া উভয় পদাবলীর যথোচিত গুরুত্ব বিধান করিয়াছেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে এম. এ. পাঠক্রমে বৈষ্ণবসাহিত্য একটি পত্ররূপে নির্দিষ্ট আছে। পদাবলীর পথ বৈষ্ণব-শাক্ত পদসন্দোহের প্রায় সর্বাত্মক সুমিতায়ত এক আলোচন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে উভয় পদাবলী-উপজীব্য একত্র গ্রথিত এতাদৃশ রসানুকূল বিশ্লেষণ-ধর্মী গ্রন্থ সংখ্যায় সীমিত বলিয়া মনে হয়। স্নাতক শ্রেণীতে বাঙ্‌লা বিষয়ে অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি পড়িতে হয়। পদাবলীর পথ গ্রন্থে উভয় পদাবলী হইতে সংস্কৃত সংজ্ঞা ও তার বঙ্গানুবাদসহ বিবিধ অলংকারের উদ্ধৃতি ও ছন্দোবিভাগ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা তো বটেই আমার সমানধর্মা সকল পদাবলী-পাঠকের জন্য আমার এই পুস্তক-প্রণয়ন-প্রযত্ন।

আমার দুর্লভসৌভাগ্য পদাবলীর পথ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন বর্তমান বাঙ্‌লা তথা ভারতের অন্যতম পরমপ্রাজ্ঞ পুরুষ শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ডি লিট্‌। এই ভূমিকা তাঁহার আশীর্বাদরূপে আমার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধানত প্রণামাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থ রচনায় সকল সারস্বতের ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। পদাবলীর পথ প্রকাশিত দেখিলে যাঁহারা সর্বাধিক আনন্দিত হইতেন তাঁহারা হইলেন আমার বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণবশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় প্রেরণাদাতা সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডি. লিট্‌., আমার গবেষণা-নির্দেশক অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, আমার সাহিত্য কর্মে সকল সময়ের উৎসাহদাতা জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচী, আমার পিতৃদেব জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত পুরুষোত্তম আচার্য ও জননী রুক্মিণী দেবী। তাঁহারা আজ নিজ নিজ সাধনোচিতধামে প্রয়াত। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করি। এই প্রসঙ্গে আমার বিদ্যালয়জীবনে মেদিনীপুরের কালিন্দী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের যোগ্য

শিক্ষকবর্গ, মহাবিদ্যালয় জীবনে ঋষি প্রতিম অধ্যাপক শ্রীযুত বনবিহারী ভট্টাচার্য এম. এ. (ডবল), কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, অগ্রজোপম সাহিত্যিক আজহার উদ্দীন খান, মেদিনীপুর কলেজিয়েট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত হরিপদ মণ্ডল. হুগলী, মুখপত্র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কামারপুকুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত গোপালমোহন চক্রবর্তী, আমার অনুজোপম সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীশৈলেশ দাশ, ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, ডক্টর গৌরপদ সেন, আমার ছাত্র ডক্টর রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মহিসাগোট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষ কুমার পাল চৌধুরী ও সেণ্টপলস কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরামেন্দু দত্তকে শ্রদ্ধা-শুভেচ্ছার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার ছাত্র ডক্টর মিহির চৌধুরী কামিল্যা এই গ্রন্থ প্রকাশে নিরন্তর উৎসাহিত করিয়াছে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দুলাল আচার্য এম. এ (ডবল) বি. এড. কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার শ্রম-ভার লাঘব করিয়া দিয়াছে। পূর্ব পূর্ব গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় আমার পত্নী শ্রীমতী অঞ্জু আচার্যের প্রচেষ্টা সর্বাধিক।—এই অবকাশে সকলের উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে পদাবলীর পথ প্রকাশক সুখ্যাত ভোলানাথ প্রকাশনীর শ্রীযুত সুরেশ দাশকে ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে জোনাকী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত শিবব্রত ভট্টাচার্যকে ও শ্রীমান্ দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মিবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে। সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

পদাবলীর পথ। সে পথ বহু দূর। এক পথ পৌঁছিয়াছে বৃন্দাবন হইয়া মথুরায়, অন্য পথ পৌঁছিয়াছে হিমগিরি হইয়া কৈলাসপুরে। সেখানে পথে পথে হর্ষবিষাদের সঙ্গে দুশ্চর তপস্যা ও অতন্দ্র সাধনার মুদ্রাঙ্কমণ্ডন। বৈষ্ণব-শাক্ত মহাজনগণের করধৃতলেখনীর লীলায়িত ভঙ্গিমায় বিবিধ পদপটে সেই দীর্ঘ-বিলম্বিত পথরেখা বিচিত্রচারু আলেখ্য লেখায় ধরা দিয়াছে। পদাবলীর তীর্থদেবতার চরণতলে আমার সর্ব কর্মফল সমর্পণ ও ভূমিষ্ঠ প্রণতি রহিল।

কালিন্দী : মেদিনীপুর

রামজীবন আচার্য

পদাবলীর পথ
বিষয়নিষ্ঠ পত্রাঙ্ক

পদাবলীর পথ

পদাবলীপ্রসঙ্গ

[পদাবলী—পদাবলীবিভাগ—পদাবলীর কাল ও পদকার—পদকারের মহাজন আখ্যা—পদাবলীর কীর্তনরূপ—পদাবলীর উৎসসন্ধান—পদাবলীর তত্ত্ব—পদাবলীর পাত্র-পাত্রী—পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলংকার—পদাবলীর রীতিগুণ—পদাবলীর রস—বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর তুলনা]

পদাবলী ঃ

পদাবলী কথাটি পদ ও আবলী দুই পৃথক শব্দের সন্ধিযুক্ত সমাহার। আবলী শব্দের অর্থ সমাহার বা সমষ্টি, পদ শব্দের অর্থ বাক্য এবং সঙ্গীত উভয়ই। মুনি ভরত তাঁহার বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রে বাক্য এবং সঙ্গীত অর্থে পদ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—'গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতানপদাত্মকম্। পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্॥ যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎ সর্বং পদসংজ্ঞিতম্। নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥' মহাকবি কালিদাস সঙ্গীতার্থে পদশব্দের ব্যবহার করিলেন তাঁহার মেঘদূত কাব্যে—'মদ্ গোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়মুদ্গাতুকামা।' বাক্য-অর্থেও এই মেঘদূতে পদশব্দের প্রয়োগ 'ত্বামুৎকণ্ঠাং বিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ।' পদাবলী কথাটির প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় অগ্নিপুরাণের কাব্য-সংজ্ঞা-কারিকায়—'সংক্ষেপাদ্বাক্যমিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী। কাব্যং স্ফুরদলঙ্কারং গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্॥' ইহারই সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার মতো দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শগ্রন্থের কাব্য-সংজ্ঞা কারিকা—'তৈঃ শরীরং চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ। শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।' গীতগোবিন্দরচয়িতা জয়দেব গোস্বামী যে শ্লোকে পদাবলী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এই ঃ

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

জয়দেব ব্যবহৃত পদাবলী কথাটির অর্থ সঙ্গীতাত্মক শ্লোকসমূহ। আমাদের বিশ্বাস সেই হইতে পদাবলী শব্দের বহুল প্রচার। এখানে উল্লেখ থাকে, কবির নাম-পদ তাঁহার রচনায় সন্নিবেশিত হইয়াছে পদাবলীসাহিত্যে।

পদাবলীবিভাগ, কাল ও পদকার ঃ

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে পদাবলী বৈষ্ণব ও শাক্ত ভেদে দুই প্রকার। সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিতে বাংলার ভাগ্যাকাশে সেদিনের শোভনচন্দ্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুচৈতন্যচন্দ্রকে মধ্যবর্তী করিয়া বৈষ্ণবপদকারগণকে চৈতন্যপূর্ববর্তী,

চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যপরবর্তী এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। মিথিলার বিদ্যাপতি ও বাংলার চণ্ডীদাস হইলেন চৈতন্যপূর্ববর্তী ; মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন চট্ট প্রমুখ হইলেন চৈতন্যসমসাময়িক ; জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায় শেখর, বলরাম দাস, লোচন দাস প্রভৃতি হইলেন চৈতন্যপরবর্তী। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীর কাল-প্রসার। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ছদ্মনামে যে বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা ভানুসিংহের পদাবলী-নামে খ্যাত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত পদাবলীর আরম্ভ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাস দত্ত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র প্রমুখ শাক্ত পদসাহিত্যের পদকার। ইহার বিস্তারও বিংশশতাব্দী পর্যন্ত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ শাক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিবৃন্দের মধ্যে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রমুখের রচনায় বৈষ্ণব-শাক্ত ভাবধারার সঙ্গীত পরিদৃষ্ট হয়।

মহাজনআখ্যা ঃ

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদকারগণ মহাজন-আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শক্তিদেবতা ইত্যাদি বিষয়াবলম্বনে ইঁহাদের রচনা। ইঁহারা সেই সেই দিব্য-কাব্য-সর্জনার ভাবুক-রসিক-শিল্পী। যুগ-যুগ ধরিয়া ইঁহাদের রচনা অনুসৃত ও আস্বাদিত হইয়া আসিতেছে। পদকারজনের মহাজন আখ্যা সার্থক।

পদাবলীর কীর্তনরূপ ঃ

বৈষ্ণব ভাবধারার ক্ষেত্রে যেমন শ্রীচৈতন্য শাক্তভাবধারায় তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মতো শাক্তপদাবলীর রামপ্রসাদ কমলা-কান্ত। বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর কাব্যধর্মের মতো সঙ্গীতধর্মও স্বীকৃত। উভয় পদাবলীর পদকারগণের অনেকে সঙ্গীতশক্তির অধিকারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ছিলেন দলবদ্ধভাবে নগরসঙ্কীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা। পরের জন ছিলেন শ্রীমৎ নিত্যানন্দ। 'কর্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে। শিঙ্গাবেত্র গুঞ্জাহার নূপুর আভরণে॥'—তাঁহার ছিল কীর্তন। শ্রী নিত্যানন্দ পাণিহাটিতে জাতিভেদহীন-পঙ্ক্তি ভোজনে যে চিড়া মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে তাহা শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর নেতৃত্বে পুত্র বীরচন্দ্র ও শিষ্য নরোত্তমদাসের

খেতরী মহোৎসবে মহাবৈষ্ণব সম্মেলন-আয়োজনকে উদবুদ্ধ করিয়াছিল। পালা-বন্দী পালাকীর্তনের প্রথম সূত্রপাত এই খেতরী মহোৎসবে। এই খেতরীতে যে কীর্তন-পদ্ধতি স্থির হয় স্থানীয় গড়াণহাটী পরগণার নামানুযায়ী তাহার নাম হয় গড়াণহাটীকীর্তন। রাণীহাটী, মান্দারণ, ঝাড়খণ্ডী, মনোহরসাহী পরগণার নামানুসারে কীর্তনপদ্ধতি রাণীহাটী, মান্দারণী, ঝাড়খণ্ডী, মনোহরসাহী ইত্যাদি নামে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অনিন্দ্য-সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী। রামপ্রসাদ রচিত শাক্তপদগুলি প্রসাদীগীতরূপে খ্যাতিলাভ করে। শক্তি দেবতার প্রসাদরূপে সেই পদগুলি বঙ্গীয় ভক্তজনের হৃৎ-কর্ণ রসায়ন। কালী কীর্তন বাঙ্গালীর অপূর্ব সম্পদ।

পদাবলীর উৎস ঃ

বৈষ্ণবপদাবলীসাহিত্যের উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা। রাধাকৃষ্ণলীলার উৎসরূপে অথর্ববেদান্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষৎ, ঋক্‌পরিশিষ্ট, বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, সম্মোহনতন্ত্র এবং বিবিধ পুরাণ সাহিত্যকে প্রথমে চিহ্নিত করা যায়। পুরাণ-শিরোমণি ভাগবতে রাধার স্পষ্টোল্লেখ না থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মনীষিবৃন্দ এই ভাগবতেই রাধা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ভাগবতের দশমস্কন্ধে রাসলীলা প্রসঙ্গের অবতারণা। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে এক প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হন ও অপরাপর গোপীজনের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীসহ বিবিধ ক্রীড়ায় রত হন। এদিকে কৃষ্ণানুসন্ধানে বিরহাতুর গোপীগণ বৃন্দাবনের এক বনদেশে কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিযুক্ত চরণচিহ্নের সঙ্গে অন্য এক ব্রজরমণীর চরণ-চিহ্ন দেখিতে পান। তাঁহারা পরমভাগ্যশালিনী সেই কৃষ্ণ-প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইঁহা কর্তৃক নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরি আরাধিত হইয়াছেন, যে জন্য গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিবশতঃ ইঁহাকে নিভৃতে আনিয়া লইয়াছেন'—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥' শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ পরম বৈষ্ণবগণ শ্লোকনিবদ্ধ 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির মধ্যে রাধা-কথার সন্ধান লাভ করিয়াছেন। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজও তদীয় চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিলেন—'কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে ॥' বিষ্ণুপুরাণে রাধাভিধা কোনো গোপীর উল্লেখ না থাকিলেও 'কৃতপুণ্যা মদালসা' এক কৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপী উল্লিখিতা হইয়াছেন। হরিবংশে কৃষ্ণের গোপীসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা। পদ্ম, মৎস্য, বায়ু, বরাহ, নারদীয়, প্রভৃতি পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবমশতক পর্যন্ত কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আলবারগণের সঙ্গীতের 'দিব্যপ্রবন্ধে' গোপীগণ

সহ কৃষ্ণের বৃন্দারণ্য-লীলা উল্লিখিত। সেখানে রাধা নাম না থাকিলেও 'নাপ্পিনাই' আখ্যার এক কৃষ্ণপ্রিয়তমার কথা আছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত হালের 'গাহাসত্তসঈ'-তে কৃষ্ণের ব্রজলীলার পদ দৃষ্ট হয়। তাহার একটি, কবির নাম পোট্টিস ঃ

'মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতানং বলবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥'

—'হে কৃষ্ণ মুখমারুতে রাধিকার মুখলগ্ন ধূলিকণা অপনয়ন করিতে থাকিয়া এই বল্লবী ও অন্যান্য নারীর গৌরব হরণ করিতেছ।'

অন্য একটি, কবির নাম বিধিবিগ্রহ ঃ

অজ্জবি বালো দামো অরোত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কহ্নমুহপেসিঅচ্ছং ণিহুঅং হসিঅং বঅবহূহিং॥

—'আজও বালক দামোদর-যশোদা যখন এইরূপ বলিতেছিলেন তখন কৃষ্ণ-মুখ নিরীক্ষণকারিণী ব্রজবধূ নিভৃতে হাসিতেছিল।'

অপর একটি, কবির নাম গুবর ঃ

'ণচ্চণ-সলাহণ ণিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণগোবী।
সরিসগোবীআণং চুম্বই কবোল পডিমাগঅং কহ্নং॥'

—'নর্তনপ্রশংসার ছলে পার্শ্বসংস্থিতা কোনো নিপুণা গোপী সদৃশগোপী-গণের কপোলপ্রতিমাগত কৃষ্ণকে চুম্বন করিতেছে!'

আর একটি, কবি অজ্ঞাত ঃ

'জই ভমসি ভমসু এমেঅ কহ্ন সোহগ্গ গব্বিরো গোট্ঠে।
মহিলাণং দোসগুণে বিচার ইউং জই খমোসি॥'

—'হে কৃষ্ণ যদি ভ্রমণ কর তো সৌভাগ্যগর্বিত হইয়া এই গোষ্ঠে ভ্রমণ কর,—মহিলাগণের দোষগুণ বিচারে যদি সক্ষম হও।'

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে চিত্রিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার দৃশ্যাবলীর সহিত দণ্ডায়মান যুগল মূর্তির দৃশ্য রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী কি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত বেণীসংহার রচয়িতা ভট্টনারায়ণ তাঁহার নাটকের নান্দী লিখিলেন 'কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসম্ গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্। তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে রক্ষুন্নোইনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতা-দৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥'

কালিন্দীসোপানে রাসোৎসবে কেলি-কুপিতা রাধা রাস-রস পরিহার করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে চলিয়াছেন। কৃষ্ণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলে রাধার চরণচিহ্নে নিজচরণ পতিত হইল, তাহাতে তাঁহার দেহ হইল রোমাঞ্চিত। কৃষ্ণ রাধিকাকে অনুনয়ের সাহায্যে প্রসন্না করিলে রাধা

প্রত্যাবৃত্তা হইলেন। কৃষ্ণের এই সার্থক অনুনয় তোমাদের রক্ষা করুক।

খ্রীষ্টীয় নবমশতাব্দীর স্মরণীয় আলংকারিক আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বন্যালোকে উৎকলিত রাধা-নাম-সংযুক্ত একটি শ্লোক ঃ

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্রকলিন্দরাজতনয়াতীরে লতা বেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনাবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥

কৃষ্ণ তখন প্রবাসী, বুঝি মথুরায়। বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন কোনো সখা, নয়তো পরিচিত কোনো বৃন্দাবনবাসী। কৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে ভদ্র! সেই গোপবধূবৃন্দের বিলাসসুহৃৎ রাধার গোপন সাক্ষী কলিন্দরাজকন্যা কালিন্দীর সোপানবর্তী লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? স্মরশয্যা কল্পনাবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় তাঁহার মনে হয় এখন সেই পল্লবনিচয় শুকাইয়া জীর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

সেই ধ্বন্যালোকেই উদ্ধৃত অজ্ঞাত কোনো রচয়িতার রাধাবিরহাত্মক শ্লোক ঃ

যাতে দ্বারাবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া যেনান্তর্জলচারিভি
র্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্ ॥

'মধুদৈত্যরিপু কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলে তাঁহার গাত্রবস্ত্র নিজদেহে জড়াইয়া কালিন্দীতটলীন কুঞ্জকাননের মোহনলতাগুলিকে বেষ্টন করিয়া উৎকণ্ঠাবতী রাধিকা গুরুবাষ্পগদগদকণ্ঠে বিগলিত তার স্বরে এমন উচ্চে গান ধরিয়াছিলেন যে কালিন্দীজলতলবাসিগণও উৎকণ্ঠাবশে কূজন আরম্ভ করিয়াছিল।'

খ্রীষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিখ্যাত আলংকারিক আচার্য কুন্তক তাঁহার বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থে উপরের শ্লোকটিকে উৎকলিত করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত রাষ্ট্রকূট নরপতি তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরী লিপিরচয়িতা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কবি ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তী কথায়' একটি শ্লোকে পাওয়া যায় কলাকৌশলকোবিদা রাধা পরমপুরুষ কেশিনিসূদনে অনুরাগিনী। 'শিক্ষিত বৈদগ্ধ্যকলাপরাধাত্মিকা পরপুরুষে মায়াবিনি কৃতকেশিবধে রাগং বধ্নাতি।' খ্রীষ্টীয় দশমের জৈন সোমদেব রচিত যশস্তিলক চম্পূ-তেও রাধা-নাম পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় একাদশশতাব্দীর অজ্ঞাত কোনো কবির সংকলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ দৃষ্ট হয়; বিষয় ব্রজলীলা, কোনোটিতে রাধা-নামের উল্লেখ, কোনোটিতে অনুল্লিখিতা রাধাই অভিব্যঞ্জিত। এই শতাব্দীর অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আচার্য হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসনে' রাধাকৃষ্ণ প্রেমোপজীব্য শ্লোক দেখা যায়। হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র গুণচন্দ্রকৃত দ্বাদশ-

শতাব্দীর 'নাট্যদর্পণে' ভেজ্জল নামা কবির 'রাধাবিপ্রলম্ভ' নামক নাটকের উল্লেখ আছে। এই দ্বাদশেই আলংকারিক শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশনে' 'রামারাধা' নামে রাধা-বিষয়ক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের 'অলংকার-কৌস্তুভে' 'কন্দর্পমঞ্জরী' নামে রাধাবিষয়ক নাটিকার কথা আছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশের সাগরনন্দীকৃত 'নাটক লক্ষণরত্নকোষে' 'রাধা' নাটকের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাকৃতপৈঙ্গল-ধৃত প্রাকৃতশ্লোকে কৃষ্ণের 'রাহামুহমহুপাণ' অর্থাৎ রাধার মুখ-মধু পানের কথা আছে। রামশর্মা বিরচিত প্রাকৃতকল্পতরুতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অপভ্রংশ কবিতা পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলাশুক বিল্বমঙ্গলঠাকুর রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' শ্রীধরসঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে', জয়দেববিরচিত 'গীতগোবিন্দে', জয়দেব-সমসাময়িক উমাপতিধর, শরণ প্রভৃতির কবিতায়, ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিত প্রভৃতিতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কথা উপজীব্য হইয়া আছে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' পদাবলীর উৎসবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

ভারতীয় শক্তিসাধনা তথা শাক্তবাদের উৎসরূপে বেদ-দর্শন-পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট স্থান আছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ১০।১০।১২৫ রাত্রিসূক্ত ১০।১০।১২৭, সামবেদের রাত্রিসূক্ত ৩।৮।২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অথর্ববেদে শক্তি উপাসনার মূলতত্ত্ব বর্তমান। অভিচারাদিক্রিয়া, শাক্তাচারমতে বিবাহ দীক্ষাদি কার্য্যকলাপ সহ মন্ত্রের সমুল্লেখ আছে সেখানে। আসুরিক শক্তির প্রতি স্তুতি সম্বোধন যেমন আছে তেমনি সেখানে আছে পিশাচ রাক্ষস বিতাড়ন মন্ত্র। শক্তি-সাধনার সকল প্রকার ক্রিয়ার আধার এই অথর্ববেদ। অন্যবেদ হইতে অথর্ববেদের স্বাতন্ত্র্য এইজন্যই।

উপনিষদগুলিতে কোথাও কোথাও মাতৃকাশক্তির কথা পাওয়া যায়। কালী, ভদ্রকালী, করালী, উমা, হৈমবতী নামও সেখানে বর্তমান।

ভারতীয় ষড়্দর্শনের আলোচ্য ব্রহ্ম এক না বহু, পুরুষ ও প্রকৃতি কি, ঈশ্বর সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, সর্বার্থসিদ্ধির উপায় কি প্রভৃতি। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে বেদান্তদর্শনে জানা যায় পুরুষ সার। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্তমান। সকল সৃষ্টি একই ব্রহ্মের প্রকাশ—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সৃষ্টি মায়ার রচনা, মায়া মিথ্যা, জ্ঞানোদয়ে মায়া যায় ঘুচিয়া। আচার্য শংকর বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রচার করিলেন ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্। মহর্ষি কপিলের নামে খ্যাত সাংখ্যদর্শনে দুই পারমার্থিক সত্তার স্বীকার—পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্য মতে প্রকৃতিই সৃষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া ইহা মূলা প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ও প্রধানা। পুরুষ অকর্তা দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। পরবর্তী তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতিতে সাংখ্যের প্রভাব অনেক। পুরাণগুলিতে মাতৃকাশক্তির অখণ্ড প্রভাব।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শক্তিরূপে তিনি যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে গোপীগণ কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর উক্তি 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' দেবী ভাগবতে 'কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্‌বিযুক্তং কিমস্তি হি' ইত্যাদি শক্তিপ্রভাব ঘোষক। তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজোপাসনার নির্দ্দেশপদ্ধতি বর্ণিত হইলেও সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্ত্রকে শক্তিপ্রধান জানিতে হইবে। সিদ্ধযামলে দেখি 'শতলক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে।' চামুণ্ডা-তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার উল্লেখ ঃ

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত জ্ঞাননিধিগুরুর ছাত্র শ্রীকণ্ঠভবভূতি ভারতীয় নাট্যাকার সমাজে এক মূর্ত বিস্ময়। তাঁহার 'মালতী মাধব' নাট্যের পঞ্চমাঙ্কে করালারূপা চামুণ্ডার বর্ণনা আছে। সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বাণভট্টের চণ্ডীশতকে শতশ্লোকে চণ্ডীস্তব বিধৃত হইয়া আছে। নবম শতাব্দীর ধ্বন্যালোক-বিখ্যাত আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের দেবীশতকে শতশ্লোকে পার্বতী-স্তুতি বর্তমান। একাদশ শতাব্দীর চান্দেলবংশীয় রাজা কীর্তিবর্মার সময়ে আবির্ভূত কৃষ্ণমিশ্ররচিত বিরচিত রূপক নাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে মানবচিত্তের বিবিধ বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বর্তমান। শাক্তপদাবলী সাহিত্যে এই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আচার্য গোবর্ধনের আর্য্যা সপ্তশতী, অজ্ঞাত কবির কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়[১], প্রাকৃতপৈঙ্গল[২], সংপদ্যরত্নাবলী[৩] ইত্যাদিতে গ্রথিত শ্লোক শাক্তপদসাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

তত্ত্ব ঃ

শ্রীকৃষ্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ তিনি 'ভগবান্ স্বয়ম্'। কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তির মানবীরূপ ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা প্রভৃতি। হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণপ্রকাশ শ্রীরাধায়। রাধা কৃষ্ণের আহ্লাদিনীশক্তি বলিয়া তত্ত্বতঃ রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া, রাধা ও কৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের আনন্দিনী শক্তির আস্বাদন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। লৌকিক বিচারে রাধা পরকীয়া—তিনি বৃষভানুতনয়া ও আয়ানবধূ হইয়া কৃষ্ণানুরাগিনী। রাধা জীবের প্রতীক। জীব, তত্ত্বের দিক দিয়া কৃষ্ণের বলিয়া স্বকীয়, কিন্তু রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শযুক্ত জগতের সঙ্গে জীব এমনভাবে আবদ্ধ হয় যে, সে যে কৃষ্ণের

স্বকীয় তাহা যায় ভুলিয়া। এই ভুল ভাঙ্গিলে জীব যখন ভগবানের আহ্বানে সাড়া দেয় তখন তাহার হয় পরকীয়-অভিসার। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর তত্ত্ব-সংক্ষেপ ইহাই।

নগাধিপতি হিমালয় এবং তদীয়পত্নী মেনকা তপস্যাবলে জগজ্জননীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। জগজ্জননীও তাঁহাদের ভক্তিবলে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেবীভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেখা যায়—'—হিমালয়ো হি মনসা মামুপাস্তে ইতি ভক্তিতঃ। ততস্তস্য গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্।' ভগবতী গীতার প্রথম অধ্যায়েও এই একই কথা পাওয়া যায়। লীলাপর্বে ইঁহারই বাল্যলীলা আগমনী বিজয়া পদ শাক্তপদ সাহিত্যে বিধৃত হইয়া আছে। এই জগজ্জননী শক্তি হইলেন শাক্তসাধকের উপাস্যা দেবী। যখন যখনই দানবোত্থ-বাধা উপস্থিত হয় তখন তখনই তিনি অরিসংক্ষয়ার্থে আবির্ভূত হন ভিন্ন ভিন্ন রূপে। জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ইচ্ছাময়ী মা, লীলাময়ী মা ইত্যাদি অংশে শক্তি দেবতার রূপ গুণ ও উপাস্যতত্ত্ব গীত হইয়াছে। শক্তি আরাধনার ক্রমউপায় ইত্যাদির সাধনতত্ত্ব বিষয়ের গান ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, নামমহিমা ইত্যাদি পর্য্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে।

সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান শক্তি যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তেমনি ইন্দ্রিয়াগম্য এবং বোধাতীত। তন্ত্র-মতে শক্তিতত্ত্বের অভিনবত্ব এইখানে যে এই শক্তি যুগপৎ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ। শক্তি এখানে পরম শান্ত, বিকার রহিত—'অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিঃ, ইহাকে শিবতত্ত্বও বলা যায়। এখানে শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। শাক্তগণের নিকট ইহা অদ্বৈততত্ত্ব। শিব ও শক্তি অন্তর্লীন অবস্থায় বিরাজ করেন বলিয়া ইহা শক্তি-বিশিষ্ট অদ্বৈত। এই দুরূহ তত্ত্বকে

---

১. মা মুঞ্চাগ্নিমুচঃ করান্ হিমকরং প্রাণাঃ ক্ষণংস্থীয়তাং।
নিদ্রে মুদ্রয় লোচনে রজনি হে দীর্ঘাতিদীর্ঘা ভব॥ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

২. বালোকুমারোছয়মুণ্ডধারী।
উবাঅহী না মুই এক্ক নারী॥
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী।
গঈ ভবিত্তী কিল বা হমারী॥ প্রাকৃতপৈঙ্গল

৩. কা তে কৃপা, ময়ি কৃপা যদি নাস্তি মাত-দীনবন্ধু রিতিনাম বৃথা বিধৎসে।
মাতা সমস্তজগতামিতি কিং বৃথাখ্যা কুত্রাস্তি পুত্রবিমুখা জননীজগৎসু॥
—সৎপদ্যরত্নাবলী

ত্বং নিগ্রহং যদ্যপি পামরেঽস্মিন্ তথাপিত্বন্নাম সদা ব্রবীমি।
মাত্রাপরাধেন নিরাকৃতোঽপি মামেতি শব্দং স শিশু করোতি॥—ঐ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলে আর একেকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি; অগ্নি মানলেই তার দাহিকা শক্তিকে মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যরশ্মি ভাবা যায় না; সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না'।

পাত্র-পাত্রী ঃ

বৈষ্ণবপদাবলীতে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণের মধ্যে নন্দ, যশোদা, রোহিণী, রাধা, কৃষ্ণ, ললিতা-বিশাখাদি রাধা সঙ্গিনী, কৃষ্ণের সুদাম-দাম সুবলাদি সখা, বলরাম, জটিলা-কুটিলা, রাধাপ্রতিবেশিনী প্রভৃতি অন্যতম। শাক্তপদাবলীতে হিমালয়, মেনকা, উমা, শিব, জয়া-বিজয়া, নন্দী-ভৃঙ্গী, নগ-পুরবাসিবৃন্দ অন্যতম।

ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার ঃ

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা প্রসঙ্গে ইহার দুই বিখ্যাত মহাজন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস স্মরণীয়। বিদ্যাপতি যেমন ব্রজবুলিতে চণ্ডীদাস তেমনি স্বাভাবিক বাংলায় রাধা-কৃষ্ণ গীত গাহিলেন। বিদ্যাপতি প্রবর্তিত ব্রজবুলি যেমন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাসে সুষ্ঠু রক্ষিত, চণ্ডীদাসবাহিত বাংলা তেমনি জ্ঞানদাস বলরামদাস প্রমুখে সহজ বাহিত। পরবর্তিকালে ব্রজবুলি ও বাংলা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ব্রজবুলি কথাটিকে ব্রজের বুলি এইরূপ বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্রজ বিষয়ের বুলি বিশ্লেষণই সম্যক্ অর্থবহ হইবে। পঞ্চদশ শতকের মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি পূর্ব হিন্দীর প্রভাবযুক্ত মৈথিলী ও অপভ্রংশভাষার মিশ্রণে জাত এক সুললিত কৃত্রিমভাষায় রাধাকৃষ্ণের ব্রজবিষয়ক উত্তম পদ রচনা করেন। সেই ললিতমধুর কৃত্রিম কবিভাষা ব্রজবুলি নামে খ্যাত। তদানীন্তন ভারতের অন্যতম বিদ্যাতীর্থ মিথিলাভূমিতে বহুবঙ্গবাসি ছাত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যাইতেন। বঙ্গ-মানসের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ কথার কি এক নিবিড় যোগ আছে। তাই বিদ্যাপতি ব্যবহৃত ব্রজবুলির লালিত্যে ও পদবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর গুণে সেই ছাত্রগণের মুখে মুখে বাহিত হইয়া কিছু পদ বঙ্গদেশে চলিয়া আসে এবং বঙ্গজনের মনকে কাড়িয়া লয়। স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যাপতি উদ্ভাবিত ব্রজবুলি ও বাংলাভাষার মিশ্রণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীতে ব্রজবুলির প্রসার। ঊনবিংশতাব্দীতে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকৃত ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলীর ভাষাও তাহাই। ব্রজবুলির শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত ও তদ্ভবশব্দে পূর্ণ। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-ঝঙ্কার, সুর-ছন্দোমাধুর্য্য ব্রজবুলিকে এক সময় সার্বভৌম-আবেদনে মণ্ডিত করে। খেতুরী মহোৎসবের সময় এই ব্রজবুলিতে লীলাকীর্তন সম্যক প্রচারিত হইতে থাকে। কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই বলিয়াছেন

'কীর্তন সঙ্গীতের রস-মূর্চ্ছনা ও সুরের অলংকরণে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী বলিয়াও বোধহয় কবিরা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন।' সাধারণের ব্যবহৃত বাংলায় না হইয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ মনে করিতেন ব্রজবুলিতেই অলৌকিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-রস রক্ষিত হইবার যোগ্য। বৈষ্ণব কবিগণের মধুররসাত্মক কোমলকান্তপদাবলী ব্রজবুলির মোহনমাধুরীতে বিলসিত হইয়া তুল্যগুণ মর্য্যাদা পাইয়াছে। ব্রজবুলির কয়েকটি লক্ষণ এইরূপ।

(১) স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ
আ 7 অ, কান্ত 7 কন্ত
অ 7 আ সুজন 7 সুজান
য 7 ই অভাগ্য 7 অভাগি

(২) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি
কর্ম 7 করম
লুব্ধ 7 লুবধ
স্নেহ 7 সনেহ
প্রীতি 7 পিরিতি
লক্ষ্মী 7 লখিমি, লছিমি,

(৩) স্বরসঙ্গতি
সূর্য 7 সুরজ 7 সুরুজ
লুব্ধ 7 লুবধ 7 লুবুধ
গুপ্ত 7 গুপত 7 গুপুত

(৪) যুক্তব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত, অথচ পূর্ববর্তী স্বর প্রায় দীর্ঘ নয়
প্রসন্ন 7 প্রসন,
উচ্চ 7 উচ
অকথ্য 7 অকথ

(৫) শ, ষ, স, কেবল 'স' তে প্রযুক্ত, 'য' 'জ'-তে প্রযুক্ত
দসমী দসা
সৈশব জোবন
সাজনি অকথ কহি ন জা এ

(৬) মহাপ্রাণবর্ণে রূপান্তর যথা
পুষ্পমালা > পুহপমালা
মেঘদারুণ 7 মেহদারুণ
মাস ভাদর 7 মাহভাদর

(৭) ণিজন্তক্রিয়া—কহায়সি, বাঢ়ায়সি, গোঙায়লুঁ

নামধাতু—বেআপল (ব্যাপ্ত হইল), কবলিল (কবলিত হইল),

যৌগিকক্রিয়া—জুড়ন না গেল, চলসি যাস, ভএগেলি

ক্রিয়ার বর্তমান রূপ—পুছসি (প্রশ্ন করিতেছ), গাবএ (গায়), চলল (চলে)

অতীতরূপ—কহলনি (কহিয়াছিলে), গোঙায়লুঁ (ব্যয় করিলাম), বৈসলাহু (বসিয়াছিলাম)

ভবিষ্যৎ রূপ—সহবহি (সহ্য করিবে) ও দেবা (দিও), বরিসব (বর্ষণ করিবে)

(৮) বিভক্তি—এ, হি, হু, ল, ত, দেই, সঞো, লাগি, ক, ম, র প্রভৃতি বিভিন্ন বিভক্তির চিহ্ন।

(৯) সর্বনাম—উত্তমপুরুষে মোঞে, হম, হমে, মহ মধ্যমপুরুষে তো, তোহি, তুঅ প্রথমপুরুষে তে, সে, তসু ইত্যাদির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১০) অব্যয়—হু, জনু, জতি, তাঁতি, জৈসনি, তৈসনি, তথুহু, তহিআ প্রভৃতি অব্যয়।

(১১) ব্রজবুলিতে ব্যঞ্জনধ্বনি বর্জন করিয়া স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষিত হয়। উচ্চারণের কোমলতা ও শ্রুতি-সুখ-বিধানের জন্যই বোধ হয় এই প্রয়াস, বহু বহু উদাহরণের একটি এখানে উপস্থাপিত করি

ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধ-এল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥— বিদ্যাপতি

শাক্ত পদাবলীর ভাষা-আরম্ভে অষ্টাদশ শতকের মুদ্রাঙ্কমণ্ডিত। কেবল মাতৃসাধক ভক্তকবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী প্রমুখ কিংবা রাজা বা দেওয়ানবংশীয় শাক্ত কবি কৃষ্ণচন্দ্র, নন্দকুমার, ব্রজকিশোর, রঘুনাথ রায় প্রভৃতি নয়, কবিওয়ালা হরঠাকুর, রামবসু, এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গির দল; টপ্পাগায়ক নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালীমির্জার শ্রেণী; পাঁচালীকার দাশরথি রায়, রসিক রায় ইত্যাদি; যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ, মদন মাষ্টার প্রভৃতি; নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বসু প্রমুখ এবং অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল শাক্ত সাহিত্যের বাণীমূর্তি গড়িয়া দিয়াছেন। পারিবারিক সামাজিক জীবনের মৌখিক ভাষার সঙ্গে কমনীয় কল্পনার কাব্যসুলভ ভাষা চিত্ত চমৎকার-কারী বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে তৎসম তদ্ভব শব্দের সঙ্গে আরবি পারসি প্রভৃতি বিদেশী শব্দও আছে। ভাষা শৈলীতে কোথাও সরল কোথাও কঠিন শব্দের সন্নিবেশ।

বৈষ্ণব পদাবলীর কবিবৃন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি ছন্দোবিজ্ঞানে ও অলংকার শাস্ত্রে পরম নিষ্ণাত ছিলেন। তাঁহাদের সেই পাণ্ডিত্য ছন্দোনিরূপণে ও অলঙ্কার নিবেশনে নিযুক্ত হইয়াছে। উভয় পদাবলীতে সাধারণ ছন্দোরূপে পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদিকে এবং অনুপ্রাস যমক, শ্লেষ, উপমা, রূপক, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারকে মুখ্য গণ্য করা যাইতে পারে।

রীতি-গুণ

বৈষ্ণব-শাক্ত পদাবলীতে যে অপূর্ব সাহিত্য সর্জনা গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রের রীতি-প্রস্থান অনুযায়ী সেখানে বৈদভী রীতি ও গুণপ্রস্থান অনুযায়ী মাধুর্য্য ও প্রসাদ গুণের অধিক অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য্য বামন তাঁহার কাব্যালংকার সূত্রে বলিলেন 'রীতি রাত্মা কাব্যস্য ; বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ'। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে শ্লেষ প্রসাদ সমতা মাধুর্য্য প্রভৃতি দশবিধ গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য বামনের মতে কাব্য যদি গুণরহিত হয় অথচ সালংকার হয় তবে কাব্য হয় না। গুণ কাব্যত্ব সম্পাদক. তাই কাব্যে গুণের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। যে ললিতাত্মিকা বিশিষ্ট পদ-রচনার মধ্যে সমাসের অল্পতা লক্ষিত হয় তাহার নাম বৈদভী রীতি। বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্য দর্পণের নবম পরিচ্ছেদে বৈদভী লক্ষণ লিখিলেন ঃ

মাধুর্য্য ব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈঃ রচনা ললিতাত্মিকা।
অবৃত্তি রল্পবৃত্তির্বা বৈদভীরীতিরিষ্যতে ॥

দণ্ডীর মাধুর্য্যলক্ষণ এইরূপ ঃ মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ ॥

বিশ্বনাথ ইহাকেই রূপ দিলেন ঃ চিত্তদ্রবী ভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।
সম্ভোগে করুণে বিপ্রলম্ভে শান্তেই ধিকংক্রমাৎ ॥

প্রসাদ গুণ সম্পর্কে তাঁহার সূত্র ঃ চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ ॥

মাধুর্য্য গুণ সম্ভোগ, করুণ, বিপ্রলম্ভ, শান্তরসে ও প্রসাদ গুণ সমস্তরসে ক্রিয়াশীল। উভয় পদাবলীতে সমাসের অল্পতা ও ভক্তিরসের প্রাধান্য সুলক্ষিত হওয়ায় আমরা ইহার রীতি বৈদভী এবং গুণ মাধুর্য্য ও প্রসাদ বলিয়া মনে করি।

রস ঃ

মুনি ভরতের রসসূত্র হইল 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগাদ্রস নিষ্পত্তি ঃ।' এই একই বিষয়ের ভাষান্তরে উপস্থাপনা করিলেন সাহিত্যদর্পণগ্রন্থে কবিরাজ বিশ্বনাথ—'বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। রসতামেতি রত্যাদিঃ

স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্ ॥' আলংকারিকগণের মতে সাধারণত স্থায়ী ভাব নয়টি, 'রতি র্হাসশ্চশোকশ্চ ক্রোধোৎসাহো ভয়ংতথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোহপি চ ॥' রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম হইল স্থায়ী ভাব। কারণ এইগুলি ভাবরূপ বহুচিত্তবৃত্তির মধ্যে মনে বহুলভাবে প্রতীয়মান হইতে থাকে। অভিনবগুপ্ত লিখিলেন 'বহূনাং চিত্তবৃত্তি রূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলংরূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ীভাবঃ।' এই ভাবগুলি বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব যোগে নয়টি রসে পরিণতি লাভ করে—'শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসোইদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্ত স্তথা মতঃ ॥' শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত —নয়টি রস।

রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্ব বিষয়ক মূলগ্রন্থ। বৈষ্ণব আলংকারিকবৃন্দ উপরোক্ত নয়টি ভাবের মধ্যে রতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত-মনের স্থায়ী ভাব কৃষ্ণরতি। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুমতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইত্যাদির দ্বারা সঞ্জাত স্থায়ী ভাব কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব সঞ্চারী ভাবের দ্বারা ভক্তহৃদয়ে ভক্তিরসে রূপান্তরিত হয়। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে রতিভাব ও ভক্তিরসের পাঁচ প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেনঃ

> ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চপরকার। শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥
> বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ ॥
> শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥

শান্তরস ঃ

শমরতি শান্তরসে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যময়, পুরুষোত্তম। ভক্তজন বিষয়বাসনা বিসর্জনে সেই শ্রেষ্ঠপুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রার্থনা শীর্ষক পদগুলিতে শান্তরসের উদাহৃতি। যথা, বিদ্যাপতির—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতিরহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

কিংবা,

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥

দাস্যরস ঃ

সেবা নামে রতির পরিণাম দাস্যরস। ঐশ্বর্যময় ভগবান কৃষ্ণ হইলেন প্রভু। দীন ভক্তজন তাঁহার দাস। সেবার সাহায্যে ভক্ত কৃতার্থ ও ধন্য হইতে চান। সেবার দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মমত্ববোধের জাগরণ ঘটে। এখানে শান্ত রসের কৃষ্ণনিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেবাধর্ম। চৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যে যেমন শান্ত তেমনি দাস্যরসের পদ রচিত হয় নাই। চৈতন্যমতে জীব ও ভগবান সম্পর্কীয় যে কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি ও রূপ দিয়াছে সেখানে শান্ত কি দাস্যের স্থান নাই।

সখ্য রস ঃ

বিশ্রম্ভ বা পারস্পরিক বিশ্বাসরূপরতি সখ্য রসে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভগবান ও ভক্তের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমপ্রাণতার সাহায্যে এই সম্পর্কের সৃষ্টি। এই সম্পর্কে ভক্ত যেমন ভগবানের সেবা করেন, ভগবানও তেমনি ভক্তের সেবা-বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েন। এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতার সংযোজন। পদাবলী সাহিত্যে বলরামদাস, উদ্ধবদাস, বাসুঘোষ, যাদবেন্দ্র প্রমুখ পদকারগণ সখ্যরসের পদরচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ গোষ্ঠবিষয়ক পদে সখ্যরস দেখা যায়। পদকার বলরাম দাস লিখিলেন ঃ

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়।
সুবল বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে॥

বাৎসল্য রস ঃ বৎসলতারতি বাৎসল্য রসে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়। এখানে ভগবান পুত্র ও পাল্য; ভক্ত—মাতাপিতা ও পালক। এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা দাস্যের সেবা ও সখ্যের বিশ্বাসের সঙ্গে লালন ও পালনের মমতার যোগ। বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে বাৎসল্য রসের বহু পদ দৃষ্ট হয়।

যাদবেন্দ্র দাসের পদে ঃ

আমার শপতিলাগে　　　　না ধাইও ধেনুর আগে
　　পরাণের পরাণ নীলমণি ।
নিকটে রাখিহ ধেনু　　　　পূরিহ মোহন বেনু
　　ঘরে বসে আমি যেন শুনি ॥

অনুরূপ উদাহৃতি বলরাম দাসের পদে ঃ

নিকটে গোধন রেখো　　　　মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
　　ঘরে থেকে শুনি যেন রব ।
বিহি কৈলা গোপজাতি　　　　গোধন পালন বৃত্তি
　　তোঞে বনে পাঠাইয়া দিব ॥

মধুর রস ঃ মধুর আখ্যার রতি মধুর রস-রূপ লাভ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কান্ত, ভক্ত হন কান্তা। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের স্নেহ-লালনের সঙ্গে মধুরের কান্তা-কান্তভাব এখানে মিশিয়াছে। এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃতের পঙ্‌ক্তি উল্লেখ্য—

'পূর্ব পূর্বরসের গুণ পরে পরে হয় ।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে ।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥'

মধুররসের অপর নাম শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। শান্তরসে ভয়-বিস্ময়-মিশ্র ভক্তি, ভালোবাসা নাই। দাস্যে ভালোবাসার সূচনা। সখ্য ও বাৎসল্যের মধ্য দিয়া মধুরে তাহার পরিণতি প্রাপ্তি।

মধুরা-রতির তিন ভেদ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা।

শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে ইন্দ্রিয়চরিতার্থের ইচ্ছা সাধারণী রতি। মথুরা-বাসিনী কুব্জার রতি সাধারণী রতির অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদিশ্রবণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয়ের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গ-সুখ-লাভের বাসনাসম্ভূত রতি সমঞ্জসা রতি। রুক্মিনী-সত্যভামার রতি সমঞ্জসা রতি। শ্রীভগবানের তৃপ্তি বিধানই যে রতির লক্ষ্য তাহা সমর্থা রতি; শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতির রতি সমর্থা রতি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যে রাধা-চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা, রাধার স্থান চন্দ্রাবলীরও উপরে। সমর্থা রতির রাধা ও চন্দ্রাবলী পরকীয়া শ্রেণীর, কারণ রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবর্ধনের পরিণীতা।

পরকীয়া-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিলেন ঃ

পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥

পরকীয়া-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক ভাবিলে চলিবে না। শ্রীরূপ গোস্বামী

লিখিতেছেন—'লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিনি ॥'

রাধা ও কৃষ্ণের কোনো ভেদ নাই। রাধা কৃষ্ণের আপন শক্তির অংশ বলিয়া তিনি স্বকীয়া। আবার বৃষভানুজা রাধা আয়ানপত্নীরূপে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া। একই প্রকারে জীব মাত্রই কৃষ্ণের অংশ বলিয়া স্বকীয়, কিন্তু তাহা বিস্মৃত হইয়া জীব যখন রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের জগতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, তখন সে হয় পরকীয়। ভক্তজীব যখন ভগবানের আকর্ষণে সংসারের সকল আকর্ষণ, যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট-ধাবিত হন তখনই ঘটে পরকীয় অভিসার। ব্রজবধূবৃন্দ সহ শ্রীরাধা হইলেন সেই ভক্ত। স্বামী সংসার, কুলমর্য্যাদা, ইহলোক, পরলোক সব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণভজনা। সকল বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণা-নুরক্তি হইল পরকীয়া-তত্ত্বের মূল কথা।

ভক্তজীবের প্রতীক হইতেছেন বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে মধুর লীলায় রত। এই লীলাবিস্তারের সহায়কারিণীরূপে ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির আবির্ভাব। 'লীলাবিস্তারিকা' সখীগণের মধ্য দিয়া রাধাচিত্তের বিভিন্ন বৃত্তির প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত স্মরণীয় :

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পলতা ॥

এখানে উল্লেখ করিতে হয়, শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাঁহার কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ। তাই তাঁহার ভক্তি সাধ্য ভক্তি। ললিতা-বিশাখাবৃন্দের ভক্তিও সাধ্য ভক্তি। জীবের মধ্যে গোপীস্বভাবতা বর্তমান কারণ জীব হইল কৃষ্ণের অংশ। কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। সাধনার দ্বারা এই চেতনার জাগরণ সম্ভব। জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধন সাপেক্ষ। সাধ্য সাধনতত্ত্বের ইহাই মূল কথা। সাধন ভক্তি প্রথমে শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী অগ্রসর হয়। শ্রীকৃষ্ণমহিমা স্মরণ, কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের দাস্য-সখ্যভাব গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বিধিসম্মত উপায়ে অগ্রসর হওয়াকে বৈধী ভক্তি বলে। বৈধী ভক্তিতে মন যখন বিমুগ্ধ ও বিশদ হয় তখন কান্তাভাবের সাধনার সূত্রপাত ঘটে। কান্তা অর্থাৎ গোপী কৃষ্ণকে কান্ত মনে করিয়া যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা কান্তা প্রেম। 'সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেমনাম কয় ॥ প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান ও প্রণয়। রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ গোপী-আত্মায় নিহিত কৃষ্ণপ্রেম বা রাগ সাধনালব্ধ নহে, জন্মগত। এই প্রেম বা রাগবশে গোপীগণের কৃষ্ণভক্তি রাগাত্মিকাভক্তি। জীবের রাগ সাধনা দ্বারা জাগ্রত হয় ; গোপীরাগের বা প্রেম-ভক্তির অনুসরণ করিয়া জীবের সাধনা বলিয়া জীবভক্তি রাগানুগাভক্তি নামে কথিত। বৃন্দাবনের রাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি

গোপীগণ জন্মসিদ্ধ কৃষ্ণরতির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহাদের রতি রাগাত্মিকা। জীবের কৃষ্ণরতি রাগানুগা।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-ধৃত দুইটি শ্লোক রাগাত্মিকা ও রাগানুগা সম্পর্কে এখানে উৎকলিত হইল—

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পারমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥'
'বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥'

বৈষ্ণবগণ কামকে দেহসম্পর্কহীন নির্মলভাবরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলায় নিজ নিজ কামের সমর্পণের দ্বারা স্বর্গীয়প্রেমের অলৌকিক রসে বৈষ্ণবগণ স্নাত-পরিস্নাত হন। সাধন ভক্তির দ্বারা নিজেদের মনের সমুন্নতির সাহায্যে ইহা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কামকে প্রেমে রূপান্তরিত না করিলে কাম হয় মহারিপু।

কাম-প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ভোগ ও মোক্ষ সমান ঘৃণার্হ। কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র কাম্য। 'ভক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাগাত্মিকা ভক্তিযুক্ত মধুররসে কৃষ্ণ-ভজনকে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর রসপ্রসঙ্গ সমাপনের পূর্বে রাজমাহেন্দ্রীতে মহাপ্রভু চৈতন্যের রায় রামানন্দ আলোচন অংশটি চৈতন্য চরিতামৃত হইতে উৎকলিত করি।

দণ্ডবৎ কৈলারায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে। দুইজন কথা কন বসি রহঃ স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার॥

প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর। রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥

যেমন বৈষ্ণবপদাবলীতে তেমনি শাক্তপদাবলীতে মূলরস ভক্তি। শাক্ত-পদাবলীর ভক্তিরস বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইলেও বাৎসল্য ও শান্তের প্রাধান্য। বাৎসল্য তিনভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ বাৎসল্য, আগমনী বাৎসল্য ও বিজয়া বাৎসল্য। শাক্ত পদাবলীতে শক্তি দেবতাই উমা রূপে মেনকাগর্ভজাতা কন্যা বলিয়া বিভাবিতা। বাল্যলীলায় সেই শুদ্ধ বাৎসল্য।

যথা—

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয়শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে ॥—রামপ্রসাদ

আলম্বনবিভাব মেনকা ও উমা, উদ্দীপন বিভাব গগনের উদয়শশী। অনুভাব উমার ক্রন্দন, স্তন্যপানবিরতি ইত্যাদি।

আগমনী বাৎসল্য যথা ঃ

যাও গিরিবরহে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে ॥—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বিজয়া বাৎসল্য যথা ঃ

যেওনা, যেওনা, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।—নবীন সেন

বীররসের উদাহরণ ঃ

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছো বসে
কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত।

ফণী হ'য়ে ভেকের ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি জালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥
—রামপ্রসাদ সেন

অদ্ভুতরসের উদাহরণ :
ঢলিয়ে ঢলিযে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে ধরি করতলে গজগরাসে॥
—রামপ্রসাদ সেন

কিংবা
ধিয়া তাধিয়া নরমালী
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী॥
অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ
দম্ভবিনাশ, অসুর হ্রাস
কোটি অরুণছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীরূপিণী—গিরিশ ঘোষ

দিব্যরসের উদাহরণ :
মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ;
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না॥—রামপ্রসাদ সেন

শান্তরসের উদাহরণ :
এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তখন তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধআঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥—রামপ্রসাদ সেন

বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর তুলনা।

(১) উভয় পদাবলীর নাম হইতেই বিষয়গত পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারা যায়। বৈষ্ণবপদাবলীর উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলামাধুরী, শাক্তপদাবলীর বর্ণনীয় বিষয় মহামায়া জগন্মাতার অপার্থিব লীলা-মহিমা। প্রথমটিতে আরাধ্য শ্যাম, দ্বিতীয়টিতে আরাধ্যা শ্যামা।

(২) বৈষ্ণবপদাবলীর উৎস-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ, শাক্ত-পদাবলীর উৎসশাস্ত্র তন্ত্র এবং পুরাণ।

(৩) কালবিচারে বৈষ্ণবপদাবলীকে অগ্রজসাহিত্য এবং শাক্তপদাবলীকে অনুজসাহিত্য বলা যায়। যেখানে বৈষ্ণবপদাবলীর আরম্ভ পঞ্চদশ শতক, সেখানে শাক্তপদাবলীর আরম্ভ অষ্টাদশে। বৈষ্ণবপদাবলীর দুই শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাল পঞ্চদশ শতক, শাক্তপদাবলীর দুই শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের কাল অষ্টাদশ শতক। উভয় পদাবলীতে যুগ-চিহ্নের মুদ্রা পরিলক্ষিত হয়।

(৪) সাহিত্যমাত্রে কোন না কোন প্রকারে সমাজের ছবি ফুটিয়া উঠে। বাংলার দুই পদাবলী সাহিত্যে সমাজচিত্রণ থাকিলেও বৈষ্ণবপদাবলী অপেক্ষা শাক্তপদাবলীতে আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে তদানীন্তন সমাজের লোকবিশ্বাস, সংস্কার, ভোজনবিলাস বসনাভরণ, প্রতিবেশি-সম্পর্ক, লৌকিক উদাহরণ প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কপালীর কপাল-গণনা, গণকজ্যোতিষের ভাগ্যবিচারণা, বিবিধ-অঙ্গ কম্পনে ফলপার্থক্য-ঘটনা, কাকশব্দে ও আচরণে শুভাশুভ চিন্তা, অভিসার প্রভৃতির পদে বিচিত্র বেশভূষা, রায় শেখর ইত্যাদির পদে অন্ন-ব্যঞ্জন, মন্ডা মিঠাই প্রভৃতির কথা সেই কালের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আমাদিগকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে। তাহার দু-একটি উদাহরণ যথা :

(ক) সই, জানি কুদিন সু-দিন ভেল।
মাধব-মন্দিরে তুরিতে আওব
কপালী কহিয়া গেল॥

(খ) চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥

(গ) প্রভাতসময়ে কাককোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥

(ঘ) মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল॥
(ঙ) কান্ত কাকমুখে নহি সম্ভাসই
কি এ করু মদন দুরন্ত॥
(চ) ঘরে গুরুজ্বালা জলের সিহালা
পড়সী জিয়ল মাছ।
(ছ) ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
(ছ) কপোত পাখিরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
(ঝ) অমৃতকলিকা বিবিধ লড্ডুকা
চাকিখণ্ড পদ্মচিনি।
গজা খাজা পেড়া চানা চন্দ্রচূড়া
মিছরি মারিয়া ফেনি॥
লুচি পুরি করি রসপাকে ভরি
সরভাজা সরপুরি।
বঁদি রসকরা রসপুর ঝুরা
যতন করিয়া করি॥

শাক্তপদকারগণ কঠিন তত্ত্বকথাকে লৌকিক উদাহরণের মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকীয় যুগ-যন্ত্রণার চিহ্ন পদকারবৃন্দের রচনায় মালি-মামলা, কোর্ট-কাচারী, উকিল-মোক্তার, পেয়াদা, কয়েদদণ্ড, কলুর ঘানি টানা, দিন মজুরী, জমিদারী-তবিলদারী ইত্যাদিতে প্রকাশিত। কৃষিকর্ম, ঘুড়ি উড়ানো, পাশা-গ্রাবুখেলা, ভানুমতীর ভোজ-বাজি প্রভৃতিও সামাজিক রীতির পরিচিতি বহন করে। তাহার কিছু উদাহরণ যথা—

(ক) কোন্ অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রীজারি
(খ) এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল মা কিসে সামাই করি
(গ) হুজুরে উকীল যে জনা ডিসমিসে তার আশয় ভারি
(ঘ) মলেম ভূতের বেগার খেটে, আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে
(ঙ) আমি দিনমজুরী নিত্যকরি, পঞ্চভূতে খায়গো বেঁটে
(চ) আমায় দেওমা তবিলদারী, আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী
(ছ) মা আমায় ঘুরাবে কত কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত
(জ) ভবের আসা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল
(ঝ) মনে করি খেলবো না আর ভানুমতীরে ছাড়তে বলি

(ঞ) মন রে কৃষি-কাজ জান না
(ট) ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি !
(ঠ) যত সব জুয়াচোরে আমলা করে উসুল তহশীল দিলি ছাড়ি
(ড) সাধন রূপে গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।

কাব্য-লক্ষণ বিচারে উভয়পদাবলীকে গীতিকাব্যচিহ্নে চিহ্নিত করা হইলেও গীতিকাব্য ধর্মের অন্যতমগুণ 'রোম্যান্টিসিজম্' বৈষ্ণবপদাবলীতে অধিক। শাক্তপদাবলী সে তুলনায় অধিক বাস্তবনিষ্ঠ। শাক্তপদসাহিত্যে বাস্তবজগতের অধিকচিত্রণের পক্ষে ইহাও একটা কারণ।

(৫) বাহ্য ও অন্তর সাধনা লইয়াই সাধনার পরিপূর্ণতা। উপাস্য-নামের শ্রবণ-কীর্তনাদি বহিরঙ্গ-সাধনার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবপদাবলীতে যেমন হরি তথা কৃষ্ণনাম, শাক্তপদাবলীতে তেমনি দুর্গা তথা কালী নাম। কিন্তু বৈষ্ণবের আন্তরসাধনায় ভাব ও ভাবনার প্রাধান্য, শাক্তের আন্তর সাধনায় ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ ইত্যাদির মধ্য দিয়া যোগ-সাধনরূপে ক্রিয়ার প্রাধান্য। বৈষ্ণব মহাজনপদে যখন প্রেম-ভাবনার বিচিত্র প্রকাশন শাক্তমহাজনপদে, তখন সাধনক্রিয়ার ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনী যোগ প্রভৃতির বাঙ্ময় রূপায়ন।

(৬) আমাদের মতে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় পদাবলী গীতিকাব্য Lyric-এর লক্ষণাক্রান্ত। গীতিকাব্যের অন্যতম মূলধর্ম যে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবনা (Subjectivity) তাহা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রার্থনা শীর্ষকপদে তেমনি শাক্তপদাবলীর 'ভক্তের আকূতি 'বা' মনোদীক্ষা' প্রভৃতির পদে স-প্রমাণ। উদাহরণ রূপে বিদ্যাপতিবিহিত একটি প্রার্থনা-পর্যায়ের পদের একাংশ ঃ

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ দীনদয়াময়
অত এ তোহারি বিশোয়াসা ॥

যেমন বৈষ্ণবপদাবলীতে তেমনি শাক্তপদাবলীতে রামপ্রসাদভণিত ঃ

এমন দিন কি হবে তারা !
যেদিন তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা

ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবনায় উভয়পদাবলী এক হইলেও গীতিকাব্যের অন্যধর্ম রোম্যান্টিকতা ও শিল্পশৈলী বিশ্লেষণে শাক্তপদাবলী অপেক্ষা বৈষ্ণবপদাবলীর অগ্রগতি ধরা পড়ে। রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা তথা রূপতৃষার অতিরেক, আবেগের গভীরতা, কল্পনার দূরযাত্রা, স্বপ্নসন্দর্শন, বিষাদ প্রবণতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবপদাবলীতে বৃন্দা বিপিনের অনুপম লাবণ্য, কালিন্দীযমুনার কলকলিত নীলজল-প্রবাহ, যমুনাতটশোভী চিরশ্যামল কদম্ব, মালতরু, কোকিল-কোকিলা, ময়ূর-ময়ূরী, শুক-সারী, মেঘ-মেদুর দিনমান, সুচন্দ্রা যামিনী, বিবিধ ঋতুপর্যায় বারংবার আসিয়াছে। সেখানে

আছে অখিলরসামৃত সিন্ধু নন্দ-নন্দনকৃষ্ণের অধর নিনাদিত মোহন মুরলীরব মহাভাবস্বরূপা রাধা-কিশোরীর চরণ-শোভন মণি মঞ্জীরের মঞ্জু শিঞ্জাধ্বনি।

রূপতৃষার পরিচয় পাই, কবি যখন বলেন ঃ

(১) জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়নে না তিরপিত ভেল।

(২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হয় কবি যখন বলেন ঃ

(১) শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥

(২) পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না যায় কেনে
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।

কল্পনার দূরযান কবি-বচনে যুগাতিক্রমী হইয়া উঠে, যখন শুনি

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

স্বপ্ন-সন্দর্শনের চিত্র, বিষাদ-প্রবণতা, অতৃপ্তিবোধ যথাক্রমে

(১) মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥

(২) দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া

(৩) জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়নে না তিরপিত ভেল।

রোম্যাণ্টিক পরিবেশসম্বলিত বৈষ্ণবপদাবলীতে শিল্পসুষমা অনুপমা হইয়া বিরাজ করিতেছে। সে ছন্দোময়ী সালংকারা মোহন বচনভঙ্গীতে মনোহারিণী। বৈষ্ণব মহাজনগণ শব্দচয়নে, অলঙ্কার পরিবেশনে, ছন্দোনিবেশনে শাক্ত মহাজনগণ অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শাক্তমহাজনগণের দৃষ্টি ছিল ধূলি-ক্লিন্ন ধরিত্রীর বাস্তবজীবনযাত্রার প্রতি সমধিক। তাই শৈল্পিক মণ্ডনকলায় তাঁহাদের যত্ন ও প্রয়াস তেমন নিয়োজিত হইতে পারে নাই।

(৭) বৈষ্ণবপদ সাহিত্যে রস হইল ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই এই ভক্তিরসের প্রসার। এই ভক্তিরস দুইপ্রকার—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ভক্তিরস হইতেছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণভক্তিরস হইতেছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয় এই সাত প্রকার। এখানে উল্লেখ থাকে 'বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিহীন, কেবল মাধুর্যস্বরূপ।'

বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় শাক্তপদসাহিত্যের মূলরস হইল ভক্তি। জগন্মাতাকে অবলম্বন করিয়াই এই ভক্তিরসের প্রসূতি। 'এই ভক্তিরস নানা অবস্থায় নানা ভাবের অধিবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত এই পঞ্চ মুখ্যরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।'

বৈষ্ণবপদে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তানবুদ্ধিতে যেমন বাৎসল্য শাক্তপদে জগন্মাতাকে কন্যা বুদ্ধিতে তেমনি বাৎসল্য। শাক্তপদাবলীতে এই বাৎসল্য—বাৎসল্য, মিলন বাৎসল্য ও বিরহ বাৎসল্য ত্রিবিধ। বৈষ্ণববাৎসল্যে ভগবানের ঈশ্বরীয় ভাবের মিশ্রণ নাই, সেখানে কেবল মাধুর্য্য। শাক্তবাৎসল্যে ভগবতীর কন্যারূপের মাধুর্য্যের সঙ্গে দেবী রূপের ঈশ্বরীয় ভাবের মিশ্রণ আছে।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে মধুরের প্রাধান্য, শাক্তপদসাহিত্যে শান্তের।

প্রথম পর্য্যায় ঃ বৈষ্ণবপদাবলী

গৌরাবির্ভাব, গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্য গৌরাঙ্গ বাংলাসাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতির ভাগ্যে এক দিব্য আবির্ভাব। কেবল বৈষ্ণবধর্মে নয়, কাব্যসাহিত্যেও তাঁহার অভিনব প্রেরণা যুগঞ্জীব ইতিহাস হইয়া থাকিবে। তাঁহার আবির্ভাবপূর্বে কবি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কাব্যে ও আবির্ভাবোত্তর গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচনায় তাঁহার লীলা-কথা উপজীব্য হইয়া আছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যা বঙ্গভূমিকে বিপ্লাবিত করিয়া দিকে দিকে বহিয়া গিয়াছে। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ভাষায় ঃ

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্
রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

'রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপা আহ্লাদিনী শক্তি। একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও পুরাকালে এই দুইজন দেহভেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা সেই দুইজন চৈতন্যনামে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাবকান্তিযুক্ত সেই কৃষ্ণস্বরূপকে নমস্কার জানাই।'

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পয়ারনিবন্ধ কবিতামুখে ইহার বাংলারূপ দিলেন ঃ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস-আস্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাঁই॥

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কারণ উল্লেখ্য ঃ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈর্বা
স্বাদ্যোযেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শচীগর্ভে শ্রীহরির চৈতন্যরূপে আবির্ভাবের কারণ তিনটি আকাঙ্ক্ষার পূরণ—(১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন (২) শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদিত আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য কেমন (৩) এবং আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার সুখ কেমন। শ্রীল গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একস্থলে ইহারই কাব্যরূপ দিলেন ঃ

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিতে বিবিধ প্রকার॥

রাধাভাব অঙ্গীকারি ধরি তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ছিলেন অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। মহাভাবস্বরূপিনী গৌরাঙ্গী রাধার ভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ হইলেন চৈতন্য।

বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতপ্রেমধর্মের প্রকাশে চৈতন্যচন্দ্রের দানের উল্লেখ করিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঃ

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য ? নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা ? কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ?
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমাম্ ?
একশ্চৈতন্যশ্চন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥

অদ্ভুতার্থ প্রেমনাম কে শুনিয়াছে ? নামমহিমা বা কে জানে ? বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুর্যলোকে কাহার বা প্রবেশ ঘটিয়াছে ? পরমরসচমৎকার মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধাকে বা কে জানে ? একমাত্র চৈতন্যচন্দ্র পরমকরুণায় সবই আবিষ্কার করিয়াছেন।

চৈতন্যসমকালীন কবি বাসু ঘোষ রচিত পদ প্রবোধানন্দসরস্বতীবিহিত শ্লোক প্রসঙ্গে মনে পড়িবে।

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাইত কে॥
মধুরবৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

চৈতন্যোত্তর পদকারগণের মনে হইয়াছে বৃন্দাবনলীলামাধুরীর প্রবেশপথ-প্রদর্শক শ্রীচৈতন্যকে বাদ দিয়া বৃন্দাবনকথার পদাবলীর গুরুত্ব কিছুই নাই। তাই গৌরবিষয়ের পদরচনা নগর-নাম-বৃন্দাবনলীলাকীর্তনের পুরোভাগে গৌর বিষয়ক পদনিচয়ের অধিষ্ঠান একান্ত স্বাভাবিক। ভূমিকাস্বরূপে গৌরবিষয়ক পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে লীলাগানের রসদ্যোতক গৌরপদই প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা।

যাহা হউক বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গবিষয়কপদ সংখ্যায় অনেক। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচয়িতৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রাধামোহনঠাকুর প্রভৃতি প্রখ্যাত হইয়া আছেন। গোবিন্দদাসরচিত 'নীরদনয়নে নীরঘনসিঞ্চনে' পদে চৈতন্যের রূপ ও ভাবপ্রকৃতি কাবতামূর্তি লাভ করিয়াছে।

গোবিন্দদাস কল্পনায় দেখিতেছেন চৈতন্যের মেঘ-সান্দ্র নেত্রদ্বয় হইতে অবিরত জলধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। অবিরল ধারাপাতে কদম্বাদিতরু যেমন মুকুলিত হইয়া উঠে গৌরদেহেও তেমনি পুলক রোমাঞ্চের মুকুল দেখা

গিয়াছে। অশ্রু-পুলক-স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ গৌরাঙ্গ-শরীরে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে ঃ

নীরদনয়নে নীরঘনসিঞ্চনে
পুলকমুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

শ্রীচৈতন্য সুরধুনী ভাগীরথীতীরের সঞ্চরমান অভিনব এক কনক কল্পবৃক্ষ। তিনি উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য কলিকালের প্রেম কল্পতরু—অপার্থিব প্রেমরত্ন প্রদানে তিনি কল্পপাদপের সার্থক উপমা। নৃত্যহেতু তাঁহার চঞ্চলচরণরূপ কমলতলে ভক্তরূপভ্রমরবৃন্দ নানা গুণকীর্তনে রত। গৌরাঙ্গের পদপদ্মের সৌরভে লুব্ধ হইয়া সুরাসুর অজ্ঞান হইয়া থাকে।

চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশ রহত অগোর॥

প্রেমকল্পবৃক্ষ চৈতন্য অবিরল প্রেমের অপার্থিবরত্ন বিতরণ করিয়া অখিল-জনের মনোরথ পূরণ করিয়াছেন। সেই চৈতন্যের দর্শন পান নাই গোবিন্দ দাস। তাই পদান্তে করুণ হতাশার বাণী ঃ

অবিরত প্রেম রতন-ফল-বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর॥

'নীরদ নয়নে' পদে গোবিন্দ দাস গৌরাঙ্গকে সুরধুনীতীরের সঞ্চরমান সুবর্ণ কল্পতরু বলিয়া বর্ণনা করিলেন, অন্যপদে গৌরাঙ্গকে তনুলাবণ্যে চম্পক-শোণ-সুবর্ণপর্বত প্রভৃতির পরাভবকারী বলিয়া লিখিয়াছেন। সেই সমুন্নতগ্রীব গৌরাঙ্গের জগজ্জনমনোমোহন সৌন্দর্যের পরিমাণ করা সম্ভব নয় ঃ

চম্পক শোণ কুসুমকনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙণি রে॥

প্রেমের সাত্ত্বিকভাবের সমাগমে গৌর কলেবর পুলকরোমাঞ্চে আকুল, অন্তর উচ্ছ্বাসময়, অধরে মৃদু-মধুর হাস, বদনে গদগদভাষ, নয়নে শত শত করুণার স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর প্রবহন। গোবিন্দ দাসের অনুপ্রাস-উৎপ্রেক্ষা মণ্ডিত ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি ঃ

বিপুল পুলকাকুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদভাষণি
কত মন্দাকিণী নয়নে ঝরে॥

পদকার গোবিন্দ দাস কলির করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শ লাভ করিতে পারেন নাই, এখানেও সেই হতাশার প্রকাশ ঃ

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেল॥

শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধাবিরহের মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীমতী রাধার ছবি জ্ঞানদাসের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য সহচরদেহে নিজদেহ এলাইয়া চলিতেছেন, সামান্য গিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ-বিপ্রলম্ভ-বিবশা বার্ষভানবী রাধা যেমন সঙ্গিনী-শরীরে নিজ শরীর স্থাপন করিয়া চলিতে না চলিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন শ্রীচৈতন্য তেমনই। বিরহ মনের মতো শরীরকে পীড়িত করিয়াছে, করিয়াছে দুর্বল। ভূমিতল-শয়ানা রাধার মতোই শ্রীগৌরাঙ্গের কোথা প্রাণনাথ বলিয়া দৈন্যোক্তি ও ক্রন্দন। জ্ঞানদাস শ্রীগৌরাঙ্গের এই ভাব যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না ঃ

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেণে কাঁদে।
পুরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেন হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

জ্ঞানদাসের প্রকাশভঙ্গীতে অলংকারবিরল সরলপ্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পদকর্তা রাধামোহনের 'আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ' পদে গৌরচন্দ্রে পূর্বরাগের নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার রূপ পরিলক্ষিত হয়। রাধামোহন বলিতেছেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যকে কি অপূর্ব না দেখিলেন। তিনি করতলে মুখ ন্যস্ত করিয়া আছেন, বারংবার ঘরে যাইতেছেন ও পথে আসিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে একাকিনী চলিতেছেন পুষ্পকুঞ্জে। তাঁহার অশ্রু-ছলছল নেত্রশতদলের বিলাসে নব নব ভাবের কতই না প্রকাশনা। পুলকরোমাঞ্চে তাঁহার সকল অঙ্গ গিয়াছে ভরিয়া। রাধামোহন বলিতেছেন নদীয়াসুন্দর শ্রীচৈতন্যের এই প্রকার রূপ ও ভাবের কোনো তল খুঁজিয়া পাইতেছেন না। গৌরাঙ্গপ্রেম অতলস্পর্শ। রাধামোহনের প্রকাশশৈলীতে জ্ঞানদাস-সুলভ ভাষা ও রচনারীতি—সরল অনাড়ম্বর ও সহজ, ছন্দ পয়ার ঃ

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছলছল নয়নকমল—সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলকমুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

রাধামোহন ঠাকুরের এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসকৃত রাধাপূর্বরাগের

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায় ॥

এবং

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥

—প্রভৃতি পদ মিলাইয়া পড়িবার মতো।

বাল্যলীলা ও কালীয়দমন

বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাপ্রসঙ্গ এক বিশেষ অংশ। সেখানে তিনি নন্দ যশোদার তনয়রূপে বিভাবিত। পদাবলীর ভাষায় তিনি নন্দদুলাল, তিনি গোপাল, তিনি নীলমণি। বাল্যলীলায় বালক কৃষ্ণের নৃত্য, নবনী-ভক্ষণে আগ্রহাতিরেক, গোচারণ ইত্যাদি বর্ণিত। এই বাল্যলীলায় কৃষ্ণের সঙ্গীরূপে রোহিণীনন্দন বলরাম, সখা শ্রীদাম সুদাম দাম প্রভৃতির সমুল্লেখ। বাল্যলীলায় বাৎসল্যরস। বালকপুত্র কৃষ্ণের জন্য নন্দরানী যশোমতীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, স্নেহসমাদরের উপচিতি ও স্নেহজনিত নানা আশঙ্কার প্রকাশ বৈষ্ণব কবিগণের ভাষায় মূর্ত হইয়া আছে।

কবি শ্যামচাঁদ দাসের পদ, সেখানে বুঝি কোনো প্রতিবেশিনী যশোদাকে কৃষ্ণ নর্তন দর্শনে বলিতেছেন। চরণে চরণে মণিময় মঞ্জীর, কটিতে ঘাঘরবাস, বক্ষস্থলে মনোলোভা বনমালা। নৃত্যপর বালক কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ব্রজপুরীর শত শত গোপিনী এবং অনেক অনেক বালক ঃ

দেখ মায়ি নাচত নন্দ দুলাল
মণিময় নুপুর কটিপর ঘাঘর
মোহন উরে বনমাল ॥

যাদবেন্দ্র দাসের বালক কৃষ্ণের নৃত্যবর্ণনায় সেই একই রীতি। যশোদা বলরাম-জননী রোহিণীকে নৃত্য দেখিতে বলিতেছেন। নন্দ এ নৃত্য দেখিতে পারিলে ভালোই হইত। তিনি অন্যত্র গিয়াছেন, এদিকে আনন্দ বহিয়া যাইতেছে। রোহিণী যেন নয়ন ভরিয়া এদৃশ্য দেখিয়া লয়। যশোদা-মুখে লৌকিক ভাষারীতি ঃ

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া

বিচিত্র নৃত্যভঙ্গী, চঞ্চলচরণে চন্দ্রবিকাশসৌন্দর্য। সেই নৃত্য চাপল্য খঞ্জন পাখীকে স্মরণ করাইয়া দেয় 'চিত্রবিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।'

নবনী-লোলুপ বালককৃষ্ণ যশোমতী-করে দধিমন্থধ্বনি শুনিয়াই বলরামের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্নেহাতুরা জননী কৃষ্ণের চন্দ্রবদনে চুম্বন আঁকিয়া দিয়াছেন। নবনী প্রদানের লোভ দেখাইয়া কৃষ্ণনৃত্যসুষমা উপভোগ করিয়াছেন। কবি ঘনরামদাস লিখিতেছেন কৃষ্ণ 'যাইতে যাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে হেরি হরষিত ভেল মায়।'

পদকর্তা বলরামদাসের বালক কৃষ্ণ নন্দের নিকট নিজের মিথ্যা ননীচোরা অপবাদের অভিযোগ জানাইয়াছে গলদশ্রুনেত্রে। শুধু অপবাদ হইলে না হয় সহ্য করা যাইত, 'ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছাঁদন ডোরে বাঁধে রানী নবনী লাগিয়া।' সে বন্ধনও না হয় সহ্য করা যাইত, যদি না আভীররমণীর দল চারিপাশে দাঁড়াইয়া হাসিত। সেই কৃষ্ণের অভিযোগ 'অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।' কৃষ্ণ ননী খান নাই। বলরাম খাইয়াছেন। প্রকাশশৈলীতে লৌকিক বালকস্বভাব কৃষ্ণে সমর্পিত হইয়া সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে ঃ

বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রানী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥

বলরাম দাসের কৃষ্ণ যেমন চতুর তেমনি অভিমানী। তাঁহার অঙ্গদবলয়াদি অলঙ্কার, মণিমুক্তামণ্ডিত হার খসাইয়া লইতে বলিয়াছেন, বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে চাহিয়াছেন যমুনার পর পারে। পদটির শেষাংশে কবিপ্রাণের বাৎসল্যের স্পর্শ। এ যশোদা কবিপ্রাণের যশোদা।

বল াম দাস কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥

শেখরের পদে কৃষ্ণের গোচারণসজ্জা, গমনভঙ্গী ইত্যাদি নিম্নরূপ ঃ

কটি কাছনি বঙিকম ধটি বেনুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে ॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা ॥

বেশভূষায় মালকোঁচা, বঙ্কিম ধটি, বাম কক্ষে বেণু। গতিরীতি মাতঙ্গাপেক্ষা মন্থর। মুখে 'ভায়্যা ভায়্যা রব'। স্কন্ধে গোবন্ধন ডোর, কর্ণে চপল কুন্ডলের দোলন। গলে গুঞ্জাহার, বাহুতে অঙ্গদ বলয়।

বিপ্রদাস ঘোষের পদে দেখি কৃষ্ণ নিজেই গোচারণ সজ্জায় সজ্জিত করিতে মাতা যশোমতীকে বলিয়াছেন। তিনি ধড়া পরিবেন, মস্তপূত চূড়া পরিবেন, ভালে পরিবেন অলকাতিলক, গলে বনমালা। হাতে লইবেন শিঙ্গা বেত্র বেণু। যশোমতী প্রাণগোপালের কথায় আকুল হন 'চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়। পদকর্তা বলরামদাসের পদে যশোদাকণ্ঠে নানা সাবধানবাণী; তিনি শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বলরাম সকলকেই মিনতি করিয়া জানাইয়াছেন তাহারা যেন নবতৃণকুশাঙ্কুরের দূরগোচারণ ক্ষেত্রে না যায়। নবতৃণাঙ্কুরে তাঁহার গোপালের কোমল রক্তিম চরণ বিদ্ধ হইবে। গোপাল যেন তাহাদের মধ্যবর্তী হইয়া ধীর গতিতে যায়। কৃষ্ণকে জননী বলেন—

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।

যাদবেন্দ্র দাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ সন্তানের জন্য বাঙালী মায়ের আকুলতা স্মরণ করাইয়া দেয়। যশোদা শপথ দিয়া কৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন সে যেন ধেনুর অগ্রবর্তী হইয়া না ছুটে; গোপালকে কাছে রাখিয়া বাঁশী বাজাইলেই ঘরে থাকিয়া তিনি শুনিবেন। আরো সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন তিনি। কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম হইবেন অগ্রগামী, অন্যান্য শিশু থাকিবে বামে, শ্রীদাম, সুদাম ইত্যাদি পশ্চাতে, মধ্যবর্তী হইবে কৃষ্ণ। জননী যশোদা গোচারণ ভূমিতে রিপুভয়ে আশঙ্কিতা

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেনু
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি ॥

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥

যশোদার 'পরাণের পরাণ নীলমণি' চাহিয়া খাইতে জানে না। যশোদাই তাহাকে খাওয়ান। গোচারণভূমিতে যশোদা যখন কৃষ্ণের নিকট থাকিবেন না তখন যেন ক্ষুধার খাদ্য চাহিয়া লয়। পথের তৃণাংকুররাজি আপন বালক পুত্রের কোমল পদতলকে বিদ্ধ করিবে এই আশঙ্কায় বিচলিত-চিত্ত যশোদা পথ দেখিয়া চলিতে বলেন। ব্রজের বড় বড় ধেনুকে কৃষ্ণ যেন ফিরাইতে না যায়, মাথায় হাত দিয়া শপথ করাইয়া লইতেছেন তিনি।

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাংকুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥

উপর আকাশের প্রখর সৌরকরে পুত্রের কোমল তনু উত্তপ্ত হইবে ইহাও ভাবিতে পারেন না যশোদা। 'থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় রবি যেন না লাগয়ে গায়।'

সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহ গভীরতা ও স্নেহজনিত আশঙ্কা না থাকিলে এত সাবধানতা অবলম্বনের প্রশ্ন উঠিত না। এ যশোদা নিখিল বঙ্গের স্নেহময়ী জননী-সঙ্ঘের নবনীত-হৃদয়-সম্ভূতা। কৃষ্ণের জন্য জননী যশোদার এ বাৎসল্য অতলস্পর্শ ও অনবদ্য। শাক্ত পদাবলীতে কন্যা উমার জন্য জননী মেনকার বাৎসল্য এ প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকের স্মরণে আসিবে।

নন্দন শাস্ত্রে পরমাবিবুধ মনীষী শ্যামাপদ চক্রবর্তী পদকার বলরাম সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উল্লেখ্য—

"বলরাম মধুর রসে যেমন, বাৎসল্য রসেও তেমনি সিদ্ধ। দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে পদখানিতে অভিমানী শিশু কৃষ্ণের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবশিশু তাঁহাকে অনুভব করা যায়, ধরা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবের শিশু কৃষ্ণ অসীমের রক্তে-মাংসে গড়া সীমায়িত রূপ। এ শিশু অমানবীয় হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব বাৎসল্য খণ্ডিত হয়। তাই মানব শিশুর স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় ইঁহাতে বর্তমান। ঠোঁট ফুলাইয়া কান্নার সহিত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা, মাতা যশোমতীর নামে অনুযোগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের সমধুর কৌশল কবির লেখনী মুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যেকোনও যুগের শিশুকাব্য রচয়িতার পক্ষে তাহা গৌরবের।"

কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাইতে যশোদা নির্ভর করেন হলধর বলরামকে। পদকার

বাসুদেব দাসের যশোদা বলেন 'শুন বাপ হলধর এক নিবেদন মোর এই গোপাল মায়ের পরাণ।' যশোদা ভয়ের কারণ বলিয়া সাবধান হইতে বলেন ঃ

দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর আপনি হইও সাবধান। যমুনা-তীরের গোচারণক্ষেত্রের ছবি মাধবদাসের ভাষায় ঃ

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনাতীরে নানা রঙে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ ॥

গোচারণভূমিতে কৃষ্ণ রাজা সাজিয়া বসিয়াছেন ; বলরাম ও অন্যান্য রাখালগণ রাজার প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য করিয়াছেন। উদ্ধবদাসের পদের আরম্ভ ঃ

বিবিধ কুসুমে দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদগদ নেহারে বদনে ॥

কৃষ্ণবেণু-মুখে সকল ধেনুর নাম ধরিয়া ডাকেন। বেণুরবে উর্ধ্বমুখে ধেনুগণ ধাইয়া আসে। বলরাম দাস লিখিতেছেন গোচারণ হইতে গৃহ প্রত্যাবর্তনের কথা ঃ

অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে !
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥

বলরাম দাস পদপটে ছবি আঁকিয়াছেন। সে ছবিতে বঙ্গের গোচারণ ক্ষেত্র হইতে দিনান্তে গোধন প্রত্যাবর্তনের রূপ।

কৃষ্ণের কালীয়দমন পৌরাণিক বৃত্তান্ত। প্রখ্যাত নাট্যকার মহাকবি ভাস তাঁহার কৃষ্ণকথা বিষয়ক 'বালচরিত' নাট্যে কালীয়দমনের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ 'কালীয় বিষধরগঞ্জন'। বৈষ্ণব পদাবলী চয়নে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদসমূহের সঙ্গে কালীয়দমনের পদগুলিও একত্র সংকলিত হইয়াছে। কালীয়দমন বালকশ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চরিতকথার অন্যতম কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী।

কালিন্দী যমুনার এক হ্রদনীরে বাস করে কালীয়নাগ। কালীয় বিষধরের বিষে হ্রদবারি এমনই দূষিত যে আকাশে কালীয় হ্রদের উপরে যদি কোনো পাখী উড়িয়া যায়, তবে সেই হ্রদপবনের স্পর্শে সে মরণ বরণ করে, কোনো প্রাণী যদি হ্রদতীরে যায় তবে সেও জলের বাতাসে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বিষজ্বালা

সহনে অক্ষম বহু বহু জীব কূলে মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া গোচারণরত যদুনন্দন কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে কালীদহ জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। তিনি যে দুষ্ট-সর্প বিনাশন। পদকার মাধব দাস :

কালিন্দীর একদহে কালীনাগ তাহা রহে
বিষজল দহন সমান।
তাহার উপর বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরান ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষজ্বালা সহিতে না পারে ॥
দেখি যদু নন্দন দুষ্ট সর্প বিনাশন
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মাল সাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালীদহ জলে।

এই দৃশ্যে সঙ্গী রাখালগণ, ধেনু ও তাহাদের বৎসবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে। সকলেরই কেবল একটি চিন্তা 'কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে।'

কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া ধেনু-বৎস, কোকিল-ময়ূর, মৃগ-পশু, যশোদা-রোহিণী, নন্দ-উপানন্দ, শ্রীদাম-সুদাম সকলেই শোকে অধীর হইয়া কালীদহের বিষজল পানে প্রাণ পরিত্যাগে চেষ্টা করিলেন ; কবি মাধব বলিতেছেন একমাত্র বলরাম সকলকে প্রবোধ দিতেছেন :

বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী দমন করিয়া ॥

ব্রজবাসিবৃন্দের জীবন-শেষ ভাবিয়া কালীয়ফনায় নৃত্যশীল কৃষ্ণ উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

ব্রজবাসিগণ—জীবন শেষ।
দেখিয়া উঠিল নটন বেশ ॥
কালীয় ফণায় নটনরঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবনসঙ্গ ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান ॥

কৃষ্ণ সর্প-রাজের দর্প চূর্ণ করিলেন, ফণশোভী মণি-রাশি খসিয়া খুলিয়া পড়িল। নাগ-রমণীগণের স্তবে সন্তুষ্ট কৃষ্ণ কালীয়কে অভয় দিয়া তীরে আসিতেই মাতা যশোমতী তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন :

ফণিপতি বরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি।

মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-সাগরে।।

ব্রজবাসিগণ আনন্দচন্দ্র কৃষ্ণকে দেখিয়া চকোরের মতো সুধাপান করিলেন। আনন্দ পুলকে কেহ কথা বলিতে পারিলেন না। নিজেদের কল্যাণহস্তের স্পর্শ কৃষ্ণ অঙ্গে বুলাইয়া দিলেন।

বিষ জলে জনু দাহন ভেল।
ব্রজ প্রেমামৃতে শীতল কৈল।।

রাধাসহ সহচরীগণও আসিয়াছিলেন কৃষ্ণদর্শনলালসে। কবি মাধব দাস লিখিলেন ঃ

সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকন করু অভিষেক।।
পুরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে।।
দ্বিজ কুল আকুল আনন্দে ভাস।
নিরখি নিরাপদ মাধব দাস।।

বলাবাহুল্য মাধব দাসের পদের 'সুবদনী' শ্রীমতীরাধা ভিন্ন অন্যকেহ নহে!

বয়ঃ সন্ধি

বাল্য ও প্রথমযৌবনের সন্ধি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রমতে বয়ঃসন্ধি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীতে শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকে উপজীব্য করিয়া রচিত পদের সংখ্যা একান্ত অল্প নয়। বয়ঃসন্ধি অর্থাৎ শ্রীরাধার কৈশোর-চেতনার কবিরূপে বিদ্যাপতিকে সহৃদয় পাঠকজনের প্রথমেই স্মরণে আসার কথা। বিদ্যাপতি শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধি-লগ্নে দেহ-মনের পরিবর্তন ও ভাবনাকে যে অনবদ্য কৌশলে কাব্যরূপ দিয়াছেন তাহার সমুল্লেখ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রোক্তি উদ্ধারযোগ্য।

"বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ। যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি

সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে ; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি ॥

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল ও অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপন নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।"

বিদ্যাপতি-ভণিত রাধা-বয়ঃসন্ধিপদে শৈশব-যৌবনের দেখাদেখি। উভয়ের প্রভাবে শ্রীরাধা সমস্যায় পড়িয়াছেন, কোন্ দলে যোগ দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। কখনো কেশ-পাশকে বেণী-বন্ধে বাঁধেন, কখনো দেন এলাইয়া ; কখনো অঙ্গ করেন আবৃত কখনো নিরাবরণ। স্থির নেত্রে অস্থিরতা জাগিল। স্তনোদ্গম স্থলে দেখা দিল রক্তিমা। পূর্বে চঞ্চল ছিল চরণ ; এখন চিত্ত হইল চঞ্চল। পুষ্প-ধনু মদন জাগিল চিত্তে, মুদ্রিত নেত্রপাতে রাধা অনুভব করিতে থাকেন। বিদ্যাপতি বরকানুকে ধৈর্য্য ধরিতে বলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গে রাধা মিলাইবেন ঃ

সৈসব যৌবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল ॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি ॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল
উরজ উদয় থল লালিম দেল ॥
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে সুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥

বিদ্যাপতির অন্য এক পদে বয়ঃসন্ধিগতা রাধার ব্যবহার স্ফুটতা লাভ করে। তখন তাঁহার নেত্রে ক্ষণে ক্ষণে রচিত হয় কটাক্ষ। ক্ষণে ক্ষণে বিস্রস্ত বেশ-বসনে ধূলিজাল দেহকে ভরিয়া দেয়। কখনো প্রকাশ্য হাস্যে দশন-পঙ্ক্তি হয় প্রকাশিত, কখনো বা অধরে-অধরে স্মিতহাস্য রেখা। কখনো গমন চমকিত, কখনো মন্দ-মন্থর ঃ

খনে খনে নয়ন কোন অনু সরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ ॥
খনে খনে দসন ছটা-ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥
চউঁকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথপাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥

রাধার প্রতি মদনের প্রথম-পাঠ-শিক্ষাদানের পরিচয় এইগুলি,—জানিতে হইবে।

বয়ঃসন্ধিতে রাধা-অঙ্গের পরিবর্তন বিদ্যাপতির রচনায় ঃ

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহ্নিকে খীন উনকে অবলম্ব ॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নকে নেল ॥

কটি গুরু ছিল, নিতম্ব ছিল ক্ষীণ; এখন কটি ক্ষীণ হইল পীন হইল নিতম্ব; প্রকট হাস্য গোপন হইল বটে তনুকান্তি হইয়া উঠিল প্রকট।

পঞ্চশরের আঘাতে মাধবপ্রসঙ্গে রাধাদেহে সাত্ত্বিক বিকার স্বেদতরঙ্গ জাগিয়াছে, সেই স্বেদ-প্রবাহে সকল প্রসাধন-কলা গিয়াছে ভাসিয়া, এমনই পুলক-সঞ্চার যে বক্ষোবাস কাঁচুলি চুন চুন করিয়া ফাটিয়া গিয়াছে; বাহু-বন্ধ-বলয় গিয়াছে ভাঁগিয়া ঃ

তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি,
পুলক হু তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুক বলআ ভাঁগু ॥

বিদ্যাপতির এই পদগুলিপ্রসঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বয়ঃসন্ধিগতা উমার কথা মনে পড়ে ঃ

অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং, বাল্যাৎপরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥ ১/৩১ ॥
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন ॥ ১/৩২ ॥

নব যৌবন রমণীর অঙ্গ-লতিকার অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার, মদ্যবিবর্জ্জিত মত্ততা-কারক, পুষ্পবাণের পুষ্পব্যতীত সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সূর্যকর সন্নিপাতে পদ্মিনী বিকাশের মতো নবযৌবনসম্পাতে নায়িকার অঙ্গ-স্ফুটতা। পীবরোন্নত বক্ষ, পীন-বিপুল নিতম্ব, কৃশ-রম্য মধ্যভাগ এবং অন্যান্য অঙ্গের মোহন সৌন্দর্য্য।

কবি-বিদ্যাপতি ছিলেন সংস্কৃতকাব্য ও বাৎসায়নাদি কামশাস্ত্রে বিদগ্ধ, তাহার উপর রাজসভার কবি। তাঁহার রূপ সচেতন মন বয়ঃসন্ধির পদরচনায় সমুল্লেখ্য পারদর্শিতা দেখাইতে পারিয়াছে।

জ্ঞানদাসকৃত বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় রাধা-অঙ্গের পরিবর্তন ঘোষিত হইয়াছে। সেখানে দেখি বক্ষঃস্থল উল্লসিত হইয়াছে, নয়ন হইয়াছে আয়ত। গতি-ভঙ্গী মন্দ হইয়াছে, কারণ শৈশব পলায়ন করিল ঃ

উলসল উরথল অব ভেল রে আয়ত হোয়ত নয়ান রে।
গতি অতি তুরিত সমাপল রে শৈশবে কয়ল পয়ান রে ॥

আচার-আচরণের পরিবর্তন জানাইয়া অন্য এক পদে জ্ঞানদাস লিখিলেন :

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত না হসত মুখ মুচকাই ॥

জ্ঞানদাসরচিত রাধা-বয়ঃসন্ধির পদ :

কি কহব মাধব, বুঝই ন পারি।
কিয়ে ধনী বালা, কিয়ে বরনারী ॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতি সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥
আধ আধ চাহি যাই পথ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥

—মাধব, বুঝিতে পারি না রাধা বালিকা কিংবা শ্রেষ্ঠা নারী। তিনি রসপ্রসঙ্গ শুনিয়া সুখ পান, রসবতী রমণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যান না। অর্ধেক পথে ও অর্ধেক অন্যত্র দৃষ্টি দিতে দিতে তিনি অর্ধপথ আসিলেন, তাঁহার চিত্তে বহুসাধ, রস-প্রসঙ্গ শুনিবেন।

বৈষ্ণবকবিগণ রূপ সচেতনতার সঙ্গে গভীর মনোবীক্ষণক্ষমতারও যে অধিকারী ছিলেন তাহা অন্যান্য পর্যায়ের কবিতার মতো বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের কবিতায়ও সপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণবমহাজন গণের কল্পলোকচারী ও বাস্তবাভিমুখী চিত্ত পদ-পটে ধরা পড়িয়াছে।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের এক বিশেষ স্থান আছে। মূলতঃ পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারেরই একটি অংশ। বৈষ্ণবরসশাস্ত্র মতে বিপ্রলম্ভব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি সাধন হয় না—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' (উজ্জ্বল-নীলমণি শৃঙ্গারভেদ ৪॥) এই উজ্জ্বলনীলমণি-মতে বিপ্রলম্ভ বা বিরহের চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, ও প্রবাস।

'পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভ শ্চতুর্বিধ ঃ॥'

মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকাচিত্তে দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি সঞ্জাত অনুরাগ প্রাজ্ঞ-জনের দ্বারা পূর্বরাগ বলিয়া কথিত হয়। উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গার ভেদে পূর্বরাগের এই সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

পূর্বরাগ বিভাগে রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা-ভেদে তিন প্রকার। সাধারণী পূর্বরাগের নায়িকা কুব্জা মথুরানগরীর সাধারণ-রমণী, কংসের

মাল্যোপজীবিনী। রাজপথে কৃষ্ণদর্শনে জাতানুরাগা কুব্জা। কংসভয় উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সমঞ্জসা পূর্বরাগের নায়িকা রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি। কৃষ্ণের ভুবনসুন্দররূপগুণ শ্রবণে ইঁহাদের পূর্বরাগ ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সমর্থা বা প্রৌঢ়া পূর্বরাগের নায়িকা শ্রীরাধা। তিনি সাধনস্বরূপিনী লীলাশক্তির নায়িকা। কুলধর্ম, গৃহধর্ম, দেহধর্ম, নারীধর্ম—সর্বধর্মবিসর্জনে শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরক্তি। এই অনুরক্তি রাগাত্মিকা রতির উদাহৃতি। শ্রীরাধার অংশরূপে অন্যান্য গোপীজনেরও কৃষ্ণানুরাগ। বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীতে সমর্থা রতির নায়িকা শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনামুখে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্য, তানব (দেহ-ক্ষীণজ)জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—প্রভৃতি দশপ্রকার দশা রূপায়িত হইয়াছে।

পূর্বরাগের পদগুলিতে কৃষ্ণ ও রাধা— উভয়ের পূর্বরাগ বর্ণিত হইলেও রাধার পূর্বরাগই সমধিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের নায়িকা শ্রীরাধিকাকে প্রথমানুরাগের নায়িকা বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার গভীর তন্ময়তা পদে পদে অনুভূত হয়। কৃষ্ণ-লাভার্থে পূর্বরাগবতী শ্রীরাধার আর্তি অতলস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' একটি বিখ্যাত পদ। সেখানে দেখি শ্যাম-নাম শ্রীমতীর শ্রুতি পথ দিয়া একেবারে মর্মলোকে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। শ্যাম-নামের এমনি মধুরিমা যে তিনি শ্যাম-নাম পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। নাম-জপ তাঁহাকে অবশ করিয়া দিয়াছে। ভাবিতেছেন কি করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবেন ঃ

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

রাধা ভাবিতেছেন অনেক। কেবল নাম-জপে যদি তাঁহার অঙ্গ এইরূপ অবশ হয়, তবে সেই শ্যামের অঙ্গ-স্পর্শে কি না ঘটিবে। শ্যামরূপ দর্শনে যুবতীধর্ম সতীত্বই বা কি করিয়া থাকিবে। ভুলিতে গিয়াও ভুলা যাইতেছেনা। অনন্যোপায় কুলকামিনীর আত্ম-সমর্পণভিন্ন অন্য উপায় কোথায়।

উল্লেখ থাকে রূপগোস্বামিকৃত 'বিদগ্ধ মাধব'ধৃত

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥

শ্লোকটির সঙ্গে চণ্ডীদাসকৃত উপরের পদটির অপূর্ব সাদৃশ্য আছে।

শ্লোকটির অনুবাদ সংক্ষেপে এই প্রকার ঃ কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণে কত যে অমৃত বর্তমান জানি না। এই নাম যখন আমার রসনায় নাচিতে থাকে, তখন মনে হয় যদি আরো অধিক রসনা পাইতাম। কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবুর্দ সংখ্যক কর্ণপ্রাপ্তি স্পৃহা সৃষ্টি করে, চিত্ত-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া জয় করিয়া লয় সকলেন্দ্রিয়।

আমরা মনে করি শ্রীরাধিকার গভীরতন্ময়তা প্রকাশক কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের এই পদটির অনুরাগে পরম ভাগবত গোস্বামীপাদ রূপ তাঁহার বিদগ্ধমাধবগ্রন্থে তাঁহার সংস্কৃতবাঙময়ী অনুবাদ-ভণিতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের আর একটি অনুপম পদ, রচয়িতা চণ্ডীদাস 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।'

রাধার অন্তরবেদনার কারণ অজ্ঞাত। তিনি এখন নির্জ্জনবাসিনী হইয়াছেন। অন্যের কথা তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করে না। ধ্যান-তন্ময়তায় মেঘ-শ্যামলিমায় দৃষ্টি তাঁহার অপলক। আহার বর্জ্জন করিয়াছেন তিনি; পরিধানে যোগিনীর গেরুয়া বসন।

বেণীবন্ধকে আলুলায়িত করিয়া ফুলের গাঁথুনি খুলিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণকেশ পাশে নিবিষ্ট দর্শনা হইয়া থাকেন। স্মিতবদনে মেঘপানে চাহিয়া কি যেন বলিতে থাকেন রাধা—বাহু দুইটি প্রসারিত। ময়ূর-ময়ূরীর নীলবর্ণ কণ্ঠদেশে তাঁহার একদৃষ্টি নিরীক্ষণ। কৃষ্ণ-বেণীবন্ধে, মেঘ-রঙে, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ-নীলিমায় কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গ-নীলাভার সাদৃশ্য যে বর্তমান।

'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি।
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

পদটিতে শ্যাম-কৃষ্ণের রূপমুগ্ধা শ্রীরাধার চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। এই চিত্রের সঙ্গে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ-বর্ণিত ভগবৎ প্রেমাবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতে পাই 'মাধবেন্দ্রপুরী-কথা অকথ্য কথন। মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন॥' "এই সকল পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর 'আগমনী' গান করিয়াছেন"—এই বিদগ্ধ-মন্তব্য যথার্থ মনে হয়।

চণ্ডীদাস অনুপম কৌশলে প্রথমানুরাগিনী রাধার আনন্দ-বেদনাবিষ্ট চিত্তকে সহৃদয়-পাঠকবর্গের নিকট উন্মোচিত করিতে পারিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের আর একটি পদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে—'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।' এই পদে রাধার পূর্বরাগ প্রকাশিত হইলেও সুগভীর তন্ময়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচাটন মনে শ্রীমতী কদম্বকাননে তাকাইয়া থাকেন, নিঃশ্বাস বহিতে থাকে সঘনে। কদম্বকানন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বসতি! গুরুজন, দুর্জ্জন কাহাকেও রাধার ভয় নাই। আরো আছে।

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥

কৃষ্ণপ্রেমাকুলা রাধা চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে অনবদ্যরূপ লাভ করিয়াছেন। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবাবিষ্টা। প্রেমের সাত্ত্বিকবিকার তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে। শ্যাম কৃষ্ণ তাঁহার সর্বত্র ঃ

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

যমুনার কালো জলের কালিমা শ্রীমতীর প্রাণকে কাড়িয়া লয়; সখী-সঙ্গে কালিন্দীতে জল আনিবার পুলক ভাষার অতীত তাঁহার ঃ

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥

চণ্ডীদাসের মতো জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের রাধাকে প্রথমানুরাগিনী নায়িকা বলিয়া মনে হয় না। সেখানেও সীমাহীন আর্তি। রাধার নয়নে কৃষ্ণের রূপ নয়, রূপ-সমুদ্র, যৌবন নয় যৌবন-বন। সে সমুদ্রে তাঁহার আঁখি ডুবিয়া গিয়াছে মন গিয়াছে যৌবনের বনে হারাইয়া। শুধু কি তাহাই। ঘরে ফিরিবার সীমিত পথরেখা অফুরন্ত মনে হয়, অন্তরস্থ হৃদয় হয় বিদীর্ণ, প্রাণ কেমন যেন করিতে থাকে।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ॥

কৃষ্ণরূপানুরাগিনী রাই কিশোরীকে কি অপূর্ব প্রকাশের মধ্যেই না ধরিয়া দিয়াছেন জ্ঞানদাস। ভাষা সরল ও সহজ। তাহাতে ভাবগাম্ভীর্য্যের অভিব্যক্তি। রাধা শুধু রূপানুরক্তা নহেন নহেন গুণ-মুগ্ধাও। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-আশা রাধাকে

একেবারে বিবশ করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণের প্রতিঅঙ্গের জন্য রাধার প্রতি অঙ্গের আকুলতা। কৃষ্ণের জন্য রাধার এ ঐকান্তিকী কামনা বিরল দৃষ্টান্তের উদাহৃতি। প্রকাশ শৈলীর গুণে জ্ঞানদাসকে মধ্যযুগের কবি বলিয়া ভাবিতে অবাক লাগে। জ্ঞানদাসের রোম্যান্টিক-মন অভিব্যক্তি লাভ করে।

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর!
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশলাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

প্রেমাবেশের সাত্ত্বিক বিকার যেমন চণ্ডীদাসের রাধাতে, তেমনি জ্ঞানদাসের রাধাতে হয় পরিদৃষ্ট। এখানেও পুলক-রোমাঞ্চ-অশ্রু।

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

মিথিলার কবি বিদ্যাপতিরচিত পূর্বরাগের পদ 'নহাই উঠল তীরে রাইকমল-মুখী' এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কবি বলিতেছেন, স্নানান্তে কমলমুখী রাধা তীরে উঠিয়াই সম্মুখে দেখিলেন বরকানু দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গে ছিলেন গুরুজন। তাই লজ্জায় অবনতমুখী শ্রীমতী কৃষ্ণ বদনে চাহিতে পারিলেন না। গৌরাঙ্গী রাধার অপূর্বচাতুর্যের পরিচয় দিয়া এক সখী অন্যসখীকে বলিতেছে, রাধা সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আড় বদনে কৃষ্ণকে ফিরিয়া দেখিয়াছে—

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরুব চাতুরী গোরী
সবজন ত্যজি অগুসরি সঞ্চরি
আড়বদন তঁহি ফেরি।

রাধা চাতুরীর আরো আছে। কণ্ঠ-শোভী মুক্তাহারকে ছিঁড়িয়া রাধা বলিলেন, হার-লতা ছিঁড়িয়া গেল, সকলে যখন মুক্তা কুড়াইতে ব্যস্ত, সেই অবসরে কৃষ্ণদর্শন-সুযোগ গ্রহণ করিলেন রাধিকা

তঁহি পুন মোতিহার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি লেল

সংস্কৃত-সাহিত্যে পূর্বরাগের নায়িকা এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রিয় দর্শনের সুযোগ পাইয়াছেন। সেখানে দর্ভ-তৃণ কোমল পদতলে বিন্ধ হয়, বল্কল লগ্ন হয় লতাগুল্মে। রাজসভার বিদগ্ধ কবি বিদ্যাপতি তাহার নিপুণ-প্রয়োগ এখানে করিয়াছেন।

তুলনীয়ঃ শকুন্তলা—অনসূয়ে অভিনব-কুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণং কুরুবকশাখা-পরিলগ্নংচ বল্কলম্, তাবৎ প্রতিপালয় যাবদেনম্ মোচয়ামি। (অভিজ্ঞান-শকুন্তল)

উর্বশী—অহো লতাবিটপে একাবলী বৈজয়ন্তিকা মে লগ্না। চিত্রলেখে, মোচয় তাবদেনম্। (বিক্রমোর্বশী)

বিদ্যাপতির আর একটি পদ এখানে উল্লেখ করি। আমাদের মতে ইহা অনুরাগ পর্য্যায়ের। কোথাও ইহাকে আত্মনিবেদন-অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

হাথক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।

রাধার নিকট কৃষ্ণ হস্তস্থিত দর্পণ, মস্তকের ফুল, নয়নের কাজল, মুখের পান, বক্ষের মৃগমদচর্চা, গ্রীবার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মীনের জল, জীবের জীবন। রাধার নিকট কৃষ্ণই সব—ইহা বুঝাইতে অলংকরণচাতুর্য্য মালারূপকের ব্যবহার। তবে রাধার কৃষ্ণ-সর্বস্বতা সুন্দর ফুটিয়াছে।

পূর্বরাগপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' এক সুমধুর পদ। রাধা দেখিয়াছেন কৃষ্ণের তরল অঙ্গকান্তির লাবণ্য পৃথিবী ভাসাইয়া দিতেছে, স্মিতহাস্যের তরঙ্গে স্বয়ং মদনও মূর্চ্ছিত হইতে পারেন। কিক্ষণে যে তিনি সেই নাগর কৃষ্ণকে দেখিলেন কে জানে, তাঁহার ধৈর্য্য দূরে হইয়া গেল, চিত্ত সর্বদাই ব্যাকুল হইতেছে। কৃষ্ণরূপের পরিচয় দিয়া রাধা আরো বলিতেছেন ঃ

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়।

মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে।

কৃষ্ণের ললাট-ফলকে চন্দনচর্চা রাধা-হৃদয় বিন্ধ করে। কি ব্যাধি যে তাঁহার মর্মে সৃষ্টি হয়, তাহা লোক-লজ্জায় বলিতে পারেন না। এক সময় রাধা যখন বলেন

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।

তখন রাধা-চিত্ত-ব্যথার গভীরতা সহৃদয়-হৃদয়কে স্পর্শ করে।

বৈষ্ণবমহাজনগণ পূর্বরাগের মতো অনুরাগের পদও রচনা করিয়াছেন। পূর্বরাগ ও অনুরাগ সূক্ষ্মভেদে ভিন্ন। পারস্পরিক প্রেমে পূর্বরাগে মিলনের অন্তরায় আছে। আর উভয়ের মিলনজনিত প্রেমে সমধিক আকর্ষণ অনুরাগ। 'উজ্জ্বল নীলমণি'মতে যে প্রিয়তম হৃদয়-পুরে সতত জাগ্রত তাঁহাকে নবনবায়মান রাগের দ্বারা অনুভবই অনুরাগ। রাগ অর্থাৎ প্রেমের পূর্বাবস্থা পূর্বরাগ, প্রেমের পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ আকর্ষণবোধের আধিক্য হইতেছে অনুরাগ।

গোবিন্দদাসের অনুরাগ পর্য্যায়ের এক পদে দেখি কৃষ্ণ-রূপ রাধা-দৃষ্টি ভরিয়া দিয়াছে, স্মরণেই মধুরস্পর্শের অনুভব, অঙ্গ রোমাঞ্চ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণাধরনিনাদিতবেণুরবে রাধাশ্রুতি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অন্যপ্রসঙ্গ আসিতেই পারে না। কানু-অনুরাগিণীর তনু-মন মাতিয়া উঠিয়াছে। কুলধর্ম নারীধর্ম ইত্যাদির বিন্দুশ্রবণের ক্ষমতা তাঁহার নাই। এই অবস্থায় রাধার উক্তি :

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পর সঙ্গ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনি ধরম লব-লেশ॥

কৃষ্ণের পূর্বরাগ রাধা-রূপ-মুগ্ধতা, রচয়িতা গোবিন্দদাস। কৃষ্ণ বলিতেছেন শ্রীমতী রাধার যেখানে যেখানে ক্ষীণ তনুকান্তি, সেখানে সেখানে বৈদ্যুতী দীপ্তি; যেখানে যেখানে রাধার অরুণ-চরণ ক্ষেপণ সেখানে সেখানে স্থল কমল বিকাশন। সখি দেখ কোন্ এ রমণীসঙ্গীনীসঙ্গে এই রূপভঙ্গে তাঁহার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে :

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন-সঞে করতহি খেলি॥

তুলনীয় ঃ

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভাভি নির্ক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্‌গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্‌॥

—কুমারসম্ভব ১৷৩৩

'আমার জীবন-সঞে করতহি খেলি' বেদনার এ অভিব্যক্তি সত্যই অতুলন।

কৃষ্ণ আরো বলিতেছেন রাধা-ভ্রূ-ভঙ্গিমায় কালিন্দীর বীচিবিভঙ্গের বিলসন। তরল দৃষ্টিপাতে রাধা যেখানে দেখিতেছেন সেখানেই নীলোৎপলবন ভরিয়া যাইতেছে। রাধার মধুর হাস্যে কুন্দ-কুমুদ-কুসুমের প্রকাশ। গোবিন্দ দাস বলিলেন মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণ রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না ঃ

গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

প্রেমানুভব কি প্রকার? ইহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন প্রেম কখনোই পুরাতন হয় না, তিলে তিলে মুহূর্তে মুহূর্তে হয় নূতন। পদকার বল্লভদাস মতান্তরে বিদ্যাপতি ঃ

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেল॥

এইখানেই পূর্বরাগের ব্যাপ্তিময়ী গভীরতা।

অভিসার

অভিসারপ্রসঙ্গে রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লিখিলেন ঃ

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া সাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

যিনি প্রিয়কে অভিসার করান বা নিজে অভিসারে যান তিনি অভিসারিকা নায়িকা। অভিসরণের বেশানুসারে তিনি জ্যোৎস্নী ও তামসী ভেদে দুই প্রকারের। লজ্জায় নিজ অঙ্গে লীনার মতো সকল আভরণকে নিঃশব্দ করিয়া

অবগুণ্ঠনশালিনী সেই নায়িকা একমাত্র স্নিগ্ধা সখীর সঙ্গে তাঁহার প্রিয়-সমীপে গমন করিয়া থাকেন।

জ্যোৎস্নাভিসার ও তামসাভিসার ব্যতীত দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, বর্ষাভিসার, অসমঞ্জসাভিসার প্রভৃতি ছয় প্রকার অভিসারের কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত সাহিতে অভিসার চিত্র অনেক। সদুক্তিকর্ণামৃত, গাথাসপ্তশতী, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, মেঘদূত, অমরুশতক, গীতগোবিন্দ প্রভৃতিতে অভিসার বিচিত্র হইয়া আছে। শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিক নাট্যের পঞ্চমাঙ্কে চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার বর্ষাভিসার রূপায়িত হইয়াছে। সেখানে শাশ্বতকালের অভিসারিণী কামিনীর মনের অবস্থাকে শ্লোক-শরীর দান করিলেন শূদ্রকঃ মেঘা বর্ষন্তু গর্জন্তু মুঞ্চন্ত্বশনিমেব বা। গণয়ন্তি ন শীতোষ্ণংরমণাভিমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ —মেঘ বর্ষণ করুক, গর্জ্জন করুক, কিংবা বজ্রপাতিই করুক। রমণাভিসারিণী রমণী কী শীত কী উষ্ণ কিছুই গ্রাহ্য করে না।

লৌকিক কাব্যের অভিসার এবং বৈষ্ণব মহাজনবর্ণিত অভিসারের পার্থক্য লক্ষ্য করতে হইবে। বৈষ্ণবমহাজনগণের অভিসারে ভক্তজনের ভগবদন্বেষণ। এই ভগবদন্বেষণে অনেক বিপদ, অনেক বাধা, অনেক দুঃখবরণ। অবশেষে বিপদ-বাধা-দুঃখবরণান্তে ভক্তের ভগবৎ-সঙ্গ-প্রাপ্তি। জীবাত্মার পরমাত্মা-লাভ। বৈষ্ণবপদাবলীতে কৃষ্ণ হইলেন পরমাত্মা, রাধা হইলেন পরকীয়া নায়িকা জীবাত্মা। অখিলরসামৃতসিন্ধু ধৃত নিশিদিন ভক্তজনকর্ণে তাঁহার আহ্বান গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন। সংসার-ভোগ বাসনায় লিপ্ত চিত্ত সেই আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হয় না। সেই আহ্বান-গীতে মতি-সন্নিবেশ পরমাত্মার প্রতি মানবাত্মা তথা জীবাত্মার অভিসার।

বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীতে রাধাভিসারের প্রাধান্য। কৃষ্ণাভিসারের চিত্র আঁকিয়াছেন চণ্ডীদাস। মেঘাবৃত বর্ষণমুখর ঘোর রাত্রিকালে কৃষ্ণ আসিয়াছেন রাধাঙ্গনে। তখন রাধা-প্রাণের আর্তিকে প্রকাশ করিয়া চণ্ডীদাস মধুরাত্রিপদীতে লিখিলেন, ভণিতি রাধার :

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুন্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥

বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণাভিসার অপেক্ষা রাধাভিসারের বিলাসবৈচিত্র্য। রাধার এক বর্ষাভিসার। রাত্রি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, যেন কাজলে সাজিয়াছে।

আকাশে জলদ-দল ঘন হইয়া আসিয়াছে। বর্ষণ করিতেছে জলভার। পথ দূর, অভিসার-গমন দুষ্কর। কালিন্দী যমুনা জলে জলে ভয়ংকরী। অনুরাগাতিশয্যে যমুনায় নামিলে রাধা তীরে পৌঁছাইতে পারিবে না। মেঘ-বক্ষে বিদ্যুৎ তরঙ্গ দেখিয়া রাধা যদি ঘরে ফিরে তাহা হইলে ভালো করিবে। এই প্রকারে গোপী-আগমনচিন্তায় আতুর কৃষ্ণকে বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কানাই, নাগরী রাধা অতি চতুরা ঃ

কাজরে সাজাঁল রাতি।
ঘনভএ বরিসএ জলধর পাঁতি ॥
বরিস পয়োধরধার।
দূরপথ গমন কঠিন অভিসার ॥
জমুন ভয়াউনি নীর।
আরতি ধসাতি পাউতি নহি তীর ॥
বিজুরীতরঙ্গ ডরাই।
তোঁ ভল করজোঁ পলটি ঘর জাই ॥
ঝাঁখথি দেববনমালী।
এহি নিসি কোনে আউতি গোয়ালী।
ভনই বিদ্যাপতি বাণী।
তোহহু তহ কাহ্ন নারী সয়ানী ॥

জ্ঞানদাসের রাধা 'কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর রহই ন পারই গেহ।' গুরুজন ও দুর্জ্জনের ভয় তিনি মানিলেন না। আবেগাতিশয্যে 'চীর নহি সম্বরু দেহ'। প্রেমের রীতি বড় বিচিত্র। ঘনান্ধকারে শত শত সর্পভয় তুচ্ছ করিয়া তিনি অভিসারে চলিয়াছেন :

দেখ দেখ অনুরাগরীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজঙ্গভয় শত শত
তবু নাহি মানয়ে ভীত ॥

অন্য এক বর্ষাভিসারের পদ। মেঘাবৃত রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ঐ সময় কৃষ্ণকুঞ্জে শ্রীমতীর অভিসার। দশ দিকে বিদ্যুতের বিলসন। পরিবেশ বুঝিয়া অনুরাগিনী নীলাম্বরে সর্বতনু ঢাকিয়াছেন। দুই-চারিমাত্র সঙ্গিনী সঙ্গে তিনি চলিয়াছেন। খরতর মেঘে বর্ষা ঝরঝর ঝরিয়াছে। সুমুখী শ্রীমতী সঙ্কেত গৃহে পৌঁছাইলেন :

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার। ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি। নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥
দুই চারি সহচরি সঙ্গহি নেল। নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝরঝর খরতর মেহ। পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥

জ্ঞানদাস-রচিত রাধাভিসারের পদে—দুইচারি সহচরি সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥

কিংবা,

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। পদআধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া ॥
রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥

—প্রভৃতি 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলাকীর্তনে বিভোর চিত্ত সহৃদয় পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিবে।

কবি রায়শেখরের পদেও বর্ষাভিসার। ঘন মেঘ, দামিনী দমক, কুলিশপতন, ঝন ঝন শব্দ, পবনবেগ :

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥

গোবিন্দদাসের রাধিকা অভিসার-পূর্বে অভিসারের দীর্ঘ প্রস্তুতি সাধিয়াছেন। অঙ্গনতলে পুঁতিয়াছেন কণ্টক, কমলসম কোমল পদতলে চলিবেন তাহার উপর। মঞ্জীরকে সূক্ষ্মবসনে চাপিয়াছেন, যাহাতে অভিসার পথে তাহারা মুখর হইয়া জনপদবাসীকে চকিত করিতে না পারে। গাগরীবারিতে ভূমি পিচ্ছল করিয়া অঙ্গুলিভরে চলিতে শিখিতেছেন, যাহাতে না পড়িয়া যান। মন্দিরে যামিনী জাগিয়া নিদ্রাত্যাগে দূর পথ গমনের শিক্ষাভ্যাস করিতেছেন। অন্ধকারে যাইতে হইবে তাই হস্তদ্বয়ে নয়নদ্বন্দ্ব করিয়াছেন বন্ধ। করকমনীয় কংকণকে বাঁধা রাখিয়া সাপুড়িয়ার নিকট সাপ ধরিবার কৌশল শিখিতেছেন। বর্ষার পথে পথে সাপ থাকিবে যে। গুরুজনবচনে তিনি বধির, শোনেন এক, বলেন আর। পরিজনবাক্যে তাঁহার অধরে অধরে মুগ্ধ হাস্য। সাক্ষী পদকার গোবিন্দ দাস।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীর হি ঝাঁপি।
গাগরিবারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফনি-মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজনবচন বধিরসম মানই
আন শুনই কহ আন।

পরিজন বচনে মুগধীসম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

ইহার সহিত তুলনীয় ঃ মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সংচারকং
গন্তব্য দয়িতস্য মেইদ্য বসতি মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানুদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশম্
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতি ঃ স্বভবনে পন্থানভ্যস্যাতি ॥
—কবীন্দ্রবচনমুচ্চয়

পঙ্কময় পথে ঘনমেঘান্ধকারে নিঃশব্দে আমাকে আমার দয়িত-বসতি যাইতে হইবে ভাবিয়া এক মুগ্ধা নূপুরকে জানু পর্যন্ত তুলিয়া হস্তদ্বয়ে নেত্র ঢাকিয়া কষ্টে নিজ ভবনে পথ চলার অভ্যাস করিতেছে।

আরো তুলনীয় ঃ অজ্জমত্র গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্ম সুহঅস্স।
অজ্জা নিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাড়িং ঘরে কুনই ॥—গাহাসত্তসঈ

আজ আমাকে ঘনান্ধকারে প্রিয়তমাভিসারে যাইতে ভাবিয়া এই সুন্দরী নায়িকা চোখ বন্ধ করিয়া নিজালয়ে পদচালনার অভ্যাস করিতেছে।

গোবিন্দদাসকৃত জোৎস্নাভিসারের এক পদ। সেখানে শ্রীমতীর বেণীবন্ধ শ্বেতকুন্দকুসুমে আবৃত। বক্ষের শিরে শিরে মুক্তার হারলতা। তনুতে কর্পূর-রুচির চন্দনপঙ্কের চর্চা। অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিপুল সমাবেশ। চন্দ্রিকাগৌর রাত্রিভাগকে আরো উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন গৌরাঙ্গী রাধা। হরি অভিসারের পুলকে আকুল তিনি। পরণে ধবল বাস, ভূষণে ধবল অলঙ্কার; কৌমুদী ধবলিমায় তনু-আভা মিলাইয়া ধনী চলিয়াছেন। পরিজনগণের লোচনরাজিও বুঝি ভুল দেখিল—রাঙের পুতুল কি কেহ পারদে ডুবাইয়াছে ঃ

কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার ॥
চন্দনচরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসারে রভসরসে ভোরি ॥
ধবলবিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিমা কৌমুদি মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই ॥

ইহাকে বর্ণনা বলিলে ভুল করা হইবে। শব্দে শব্দে গোবিন্দদাসের কবিতাপটে চিত্রাঙ্কন। অন্য এক চিত্র। সেখানে তিমিরাভিসারিণী রাধিকা। তনুতে নীলমৃগমদের অনুলিপ্তি, কণ্ঠে নীলহারের ঔজ্জ্বল্য। বাহুযুগলে নীলবলয়ের মণ্ডন, পরিধানে নীলাম্বর। অভিসারের উদ্দেশ্যে নবানুরাগিনী

গৌরী তিমিররাত্রির ভয় ভাঙাইতে বুঝি শ্যামাঙ্গী সাজিয়াছেন। অলি-হিল্লোলিত নীলালকা নীলতিমিরে চলিয়াছেন গোপনে। শ্যাম-সায়রে নীলকমলিনী হইয়া ফুটিতে যাইতেছেন সকলের অলক্ষ্যে ; পরিমল-লুব্ধ নীলমধুপের দল ঝঙ্কারে চলিয়াছে। অতএব গোবিন্দদাসের অনুমান রাধা চলিয়াছেন অভিসারে ঃ

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীলবলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীলনিচোল ॥
সুন্দরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গৌরি ভেল শ্যামরি
কহু যামিনীভয় ভাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিকোহিলোলিত
নীলতিমিরে চলু গোই।
নীলনলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই ন পারই কোই ॥
নীলভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥

গোবিন্দদাসের এক অনুপম বর্ষাভিসারের পদ ঃ

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরতর বাদরদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনীপার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥
দশ দিশ দামিনী দহনবিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার ॥

—শ্রীমতী আজ অভিসারকুঞ্জের বর্ষাভিসারিকা। মন্দিরবাহিরের কঠিনকপাটে

অন্দিরদ্বার রুদ্ধ, পঙ্কিলপথে চলিতে কতো না শঙ্কা, কত আশঙ্কা! তাহাতে বর্ষার বেগ অতি দুঃসহনীলিম নিচোলে বারি নিবারণ হইতেছেনা। সুন্দরি কিরূপে অভিসার করিবে?—মানস সুরধুনী গঙ্গার অপর পারে তোমার প্রাণের হরি। ঘন ঘন ঝন ঝন শব্দের অশনিপাতে শ্রবণের সঙ্গে মর্ম্মস্থল জর্জ্জরিত। আর, বিদ্যুতের বহ্নি-জ্বালা দশদিক ঘিরিয়া। দেখিতেই চক্ষু ঝলসাইতেছে। সুন্দরি শ্রীমতি, এসময়ে যদি গৃহত্যাগ করিয়া অভিসারে চল তবে দেহের মায়া ছাড়িতে হইবে। গোবিন্দদাস বলেন—যে বাণ ছুটিয়াছে শতযত্নেও তাহা ফিরে না। দয়িতের প্রতি অনুরাগিনী যাইবেনই। দেহ—সে তো তুচ্ছ।

সখীবচনের উত্তরে গোবিন্দদাসের রাধা-ভণিতি: কুলব্রতের কঠিন কপাটকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, কাঠের কপাট কি করিবে? নিজমর্যাদার বিশাল সাগর তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তটিনী করিবে কি—হউক না সে অগাধ। সহচরি, আর আমাকে পরীক্ষা করিবেনা, হরি কি করিয়া যে পথ-পানে চাহিয়া আছেন স্মরণ করিয়া মন আকুল হইয়া ঝুরিতেছে:

কুলবতী কঠিন কবাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু যব পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

গোবিন্দ দাস অভিসার পদরচনায় অনন্য। গ্রীষ্মাভিসার, হিমাভিসার, উন্মত্তাভিসার প্রভৃতি অবলম্বনে তাঁহার পদসর্জনা।

এক গ্রীষ্মাভিসারের পদের আরম্ভ। উপর আকাশে মস্তকোপরি নিদাঘ মধ্যাহ্নে ললাটন্তপ মার্ত্তণ্ড। সৌর করে বালুকাবিস্তীর্ণ পথে উত্তাপ-বিস্তার। রাধাতনু নবণীত কোমল, চরণ কমলোপম। হেন দিবাভাগে রাধা হইয়াছেন অভিসারিণী:

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলিতনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥

হিমাভিসার রচনা করিলেন গোবিন্দ দাস। তখন পৌষের রাত্রি, পবন মন্দ বহিতেছে। তাহার উপর চতুর্দ্দিকে হিমানী-সম্প্রপাত। গৃহাভ্যন্তরে কম্পিতকলেবরে সকলে শয্যাশ্রয়ে নয়নবন্ধ করিয়া আছে। ভাবিতে চমক লাগে এই সময় শ্রীরাধা চলিলেন অভিসারে:

পোখলি রজনি পবন বহু মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহু তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে নাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥

উন্মত্তাভিসারে রাধাশরীরে ভূষণ-মণ্ডনের কলাবিধিতে বিবিধ বিপর্যয়। চরণ-শোভন মণি-নূপুর আসিয়াছে করযুগে। শ্রোণী-শোভিনী মেখলাকিঙ্কিণী উঠিয়াছে গ্রীবাদেশে। কণ্ঠ-বিলম্বী হার আসন লইয়াছে মস্তকে। হরী-অভিসারের আবেগাতিশয় শ্রীমতীকে সব ভুলাইয়াছে।

মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ধনি
সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিনি গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরি অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি-অভিসার-ভরম ভরে সুন্দরি
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥

অভিসারে যাইবার রাধাবলম্বিত চাতুরীও মাধুরীতে পূর্ণ। ব্রজবধূবৃন্দ বৃন্দাবনে গৌরী-আরাধনে যাইতেছে। রাধাও যাইবেন। এই প্রকার মুগ্ধ-বচনাবলী রচনা করিয়া গুরুজনানুমতি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি ঃ

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরি আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি ॥

গোবিন্দদাসের অভিসার পদের আরো বৈচিত্র্য এই যে সেখানে শ্রীমতী রাধা কখনো সকলভূষণ—সহিতা, কখনো ভূষণরহিতা। দেহসৌন্দর্য্যও বৈবিধ্যে বিভাসিত।

অভিসার-সজ্জা গোবিন্দদাসের পদে সজ্জিত। কমলচরণে অলক্তকরঞ্জন। চরণমঞ্জীরে খঞ্জন-গঞ্জী মধুর-রব। পরিধানে নীলাম্বরী। ক্ষীন-কটীতে মণিময়ী মেখলায় রণ-রণি শব্দ। গমনভঙ্গী কুঞ্জরাপেক্ষা মন্থর। তিনি একলিকা নহেন, সঙ্গে রঙ্গ-তরঙ্গিনী সঙ্গিনীর দল। ছন্দ মদনমোহনেরও মনোহরণ। উচ্চ কুচকোরক কনককোটরকে হার মানায়। সেই স্তনশিরে মুক্তা-মালিকা উজ্জ্বল হইয়া আছে। ভুজদ্বন্দ্ব স্থিরসৌদামিনীর তুলনা। সেই করে মণি-কংকন কন্ কন্ করিয়া বাজিয়াছে। কঙ্কন-ঝঙ্কারে কামেরও চমক লাগে।

কঞ্জু চরণযুগ যাবকরঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জির বাজে।

নীল বসনমণি কিঙ্কিণি রণরণি
কুঞ্জরগমন-দমনখিন মাঝে ॥
সাজলি শ্যামবিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গতরঙ্গিনি রঙ্গিনি
মদনমোহন মনোমোহন ছাঁদে ॥
কনককটোরচোর উচকুচ কোরক.
জোরে উজোরল মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কণ-ঝণাকিতে চমকিত কাম ॥

পদ-বিন্যাস, অনুকারাত্মক শব্দ সন্নিবেশ, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার প্রয়োগে গোবিন্দদাস অভিসারিণীকে পাঠকজনের নয়নবর্তিনী করিয়া তুলিয়াছেন।

আভরণ-হীনা বৃষভানুকন্যা ঃ

পরিহরি মৌক্তিক মালতীমাল।
তেজল মণিময় গীমকহার ॥
কিংবা—পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥

জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণসংকেত-কুঞ্জে দ্রুত-সঞ্চারিণী ; সখীগণ তাঁহাকে ধরিতে অক্ষম ঃ

সখীগণতেজি চললি একেশ্বরী
হেরি সহচরীগণ ধায়।
অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত
তোঞি সঙ্গ নহি পায় ॥

প্রেমাবেশ গোবিন্দদাসেও পর্য্যাপ্ত। কিন্তু দ্রুত গমনের বাধা রাধার যৌবন-মদালস-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। একটি পীনস্তনদ্বন্দ্ব, অন্যটি গুরুনিতম্ববিম্ব। উদাহরণ ঃ

(১) চললি নিতম্বিনি হরি অভিসার। গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥
(২) নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোরি। নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি ॥
(৩) গুরুয়া কুচভরে চলউলটপদপীন জঘনক ভাররে।

নিতম্বিনী হরি-অভিসারে চলিয়াছেন, হৃদয়ে আর্ত্তির বিস্তার, তবু মন্দমন্থর তাঁহার গতি। কারণ 'নিতম্বিনী' শব্দে নিহিত করিয়াছেন কবি। পীন প্রশস্ত নিতম্বযুগলের ভারে অতি মন্থরগামিনী শ্রীমতী। নবানুরাগের আবেশে অভিসারিণী-রাধার পীন-পয়োধর-নিন্দার কারণও তাহাই। পীন-কুচ-ভারে তাঁহার গমন-বিলম্বন। গমনে পিছাইয়া পড়িবার কারণ গুরু-কুচ ভর এবং নিবিড় নিতম্বভার।

যেমন কাব্যশৈলীতে তেমনি রাধা-তনু-বর্ণনে গোবিন্দদাসের রূপসচেতন মনের প্রকাশ পরিস্ফুট। সংস্কৃতকাব্য ও বাৎসায়নাদিকামশাস্ত্রে গোবিন্দদাসের

বহুবৈদগ্ধ্য এখানে সপ্রমাণ হইয়া আছে। সপ্রমাণ হইয়া আছে বিদ্যাপতি-প্রভাব।

কিন্তু এই গোবিন্দদাস যখন অভিসারান্তের কৃষ্ণসঙ্গতা রাধিকার মুখে বচন ধরিয়াছেন ঃ

মাধব কি কহব দৈববিপাক।
পথ আগমন-কথা কতনা কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥

তোহারি মুরল যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক-দুখ তৃণ হু করিনা গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস॥

—তখন রূপসচেতনতা অরূপ-অপরূপের গভীরতায় লীন হইয়া যায়, রাধা-হৃদয়ের আর্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রশান্তিতে লাভ করে অনির্বচনীয় এক উপরতি।

অভিসারের পদে কবি নির্বিশেষে প্রকৃতি বিচিত্র-রুচিরা। সেখানে ঋতুরঙ্গে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শিশির প্রভৃতির সমন্বয়। সেখানে কখনো দিবস, কখনো শর্বরী। সেখানে কখনো খরসৌরকর প্রকাশ, কখনো বর্ষা নিবিড়। সেখানে যামিনী কখনো শশি-শোভনা গতঘনা, কখনো শশি-তারাহীনা অন্ধ-তামসী। কখনো শীত-কাতরা কুহেলি মলিনা। যাহাই হউক আকাংক্ষিত-সঙ্গ-লাভের সৌন্দর্য-স্বপ্ন-মেদুরতা সুপ্রকাশ। সৌন্দর্যাতুরতা বৈষ্ণবপদাবলীর গীতিকাব্যধর্মের অন্যতম লক্ষণ।

মান ও কলহান্তরিতা

বৈষ্ণব রসগ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি মানের যে সংজ্ঞা দিয়াছে তাহা এইরূপ দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টা শ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥' পরস্পরানুরক্ত এবং একত্রাবস্থিত হইয়াও নায়ক-নায়িকার অভীষ্ট আলিঙ্গন-দর্শন ইত্যাদির নিরোধককে মান বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে অন্যত্রও মান সম্পর্কে এইরূপ বলা আছে 'স্নেহস্তুৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ন্ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥'—'স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন। তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ॥ মান অকারণ ও সকারণ হইতে পারে। নির্বেদ, শঙ্কা, গর্ব, অসূয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি মান বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অনুভাব। শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মান বিষয়ে কৃষ্ণ-কণ্ঠে এক বিখ্যাত উক্তি ঃ প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

প্রতিনায়িকার সঙ্গে শর্বরী অতিবাহিত করিয়া নায়ক যখন সূর্যোদয়ে নায়িকা সমীপে আগত হন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া রোষাবিষ্টা হন নায়িকা। তিনি মান করিয়া বসেন। মান-বশে নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চাৎ তাপে অনুবিদ্ধা হন তিনি। তখন তিনি কলহান্তরিতা নায়িকা। উজ্জ্বলনীলমণি কলহান্তরিতা নায়িকার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই 'যা সখীনাংপুরঃ পাদপাতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপাতি কলহান্তরিতা হি সা॥' বৈষ্ণবমহাজন পদাবলীতে মান ও কলহান্তরিতার পদ কম নাই।

মানবতী শ্রীমতী রাধিকার মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণানুনয়ের বাণী জ্ঞানদাস-ভণিতিতে ঃ

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥

কৃষ্ণ মানিনী রাধাকে তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া·চাহিতে অনুরোধ করিতেছেন। রাধার নেত্র-নৃত্যে কৃষ্ণ হৃদয়ের আনন্দনৃত্য। রাধা-দেহ-রাগ-সাদৃশ্য হেতু কৃষ্ণের পীতবাস-পিন্ধন। শ্রীমতীর একটি দীর্ঘশ্বাসে কোনো না কোন কষ্টা-শঙ্কায় কৃষ্ণপ্রাণ আকুলতায় চমকিয়া উঠে। রাধা আর কৃষ্ণকে কত পরীক্ষা করিবেন। কৃষ্ণের রাধা-আরাধনা যে সংসারে বিদিত হইয়া আছে।

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ আরো বলেন ঃ

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।

পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর ।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর চিত চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি ।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

বংশীধারী বংশীবিহনে থাকিতে পারেন না। সে হেন বংশীকে রাধা-করে সমর্পণ করিতেছেন কৃষ্ণ। ভাবটা যেন এই, অত্যাজ্য বংশীকে ত্যাগ করিলেন কৃষ্ণ আর রাধা-বিরাগ-ভাজন হওয়ার কাজ করিবেন না। নাকি, হাতে মহামূল্য বংশী ছিল বলিয়া রাধা-পদ স্পর্শ করিতে পারিতেছিলেন না সেই হাতে। তাই রাধা করে মুরলী অর্পণ। কৃষ্ণ বলিতেছেন রাধা-মুখ-নিরীক্ষণে তাঁহার হৃদয় বিভোর হইয়া গিয়াছে। রাধা-নয়নের সুরঞ্জনী অঞ্জনরেখা অপরের হৃদয় হরণে সমর্থা। বিশ্বভুবনে রূপ গুণ যৌবনে শ্রীমতী হইলেন শ্রেষ্ঠা। বিধাতা-শিল্পী শ্রীমতীকে প্রীতি-মূর্তি করিয়াই যেন সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিতেছেন না যাঁহার রূপ-লাবণ্য যৌবন-বিভব, গুণ-সম্পদের এত প্রাচুর্য তিনি তাঁহার প্রতি কৃপণা কেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন ইহার মর্ম দুর্জ্ঞেয়।

'এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ' পঙ্ক্তিটির সহিত মিলাইয়া পড়িবার মতো এই জ্ঞান দাসেরই কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা-মান-ভঞ্জনের অনুনয়োক্তি ঃ

যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও ।
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥

কৃষ্ণোক্তির প্রত্যুত্তর যেন পদকার রাধামোহন দাস রচনা করিলেন রাধাকণ্ঠে ঃ

মাধব, কাহে কান্দাওসি হামে ।
চল চল সো ধনি-ধামে ॥
তুহাঁরি হৃদয়-অধিদেবী ।
তাক চরণ যাউ সেবি ॥
যো যাবক তুয় অঙ্গ ।
ততহি করহ পুন রঙ্গ ॥
সোই পূরব তয় কাম ।
কি ফল মুগধিনী ঠাম ॥
এত কহু গদ গদ ভাষ ।
ভণ রাধামোহন দাস ॥

মাধব, আমাকে কেন কাঁদাইতেছ। যাও, সেই নারীর নিকট চলিয়া যাও। তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী সেই দেবীর চরণ সেবা করিতে যাও। যাহার চরণ-রঞ্জন অলক্তক তোমার অঙ্গে তুমি পুনরায় তাহার সঙ্গে রঙ্গ কর। সেই তোমার কামনা পূর্ণ করিবে। মুগ্ধা আমার নিকট আসিয়া কি ফল লাভ করিবে?

মানবতী রাধিকার গদ গদ বাণী রাধামোহন দাস রূপ দিলেন।

বলরামদাসের কৃষ্ণ স্বকৃতাপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীমতীকে প্রসন্ন করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়াছেন, হইয়াছেন গলদশ্রু ও আবেগাকুলভাষী। চরণ যুগল হাতে স্পর্শ করিয়া মিনতি নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন, ক্রন্দন ভাষা রুদ্ধ করিয়াছে। মানিনী তথাপি নাগরবদনে দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগরকৃষ্ণ রাধা পদতলে লুণ্ঠিত :

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর যোড়ে মাধব মাগে পর সাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণ যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কইই ন পার ॥
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান ॥

প্রিয়া-প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণ চলিয়া গেলে রাধাসখী রাধাকে গঞ্জনা দিয়াছে : কৃষ্ণ যে করপল্লবে তোমার চরণ ধরিয়া সাধিতেছিলেন সেই করপল্লব আপন চরণ-দ্বন্দ্বে সরাইয়া দিয়াছ, মান-ভুজঙ্গের সঙ্গে মিলিয়াছ, এখন সেই মানভুজঙ্গ দংশনে দংশনে তোমাকে শেষ করিয়া দিবে। আমরা তখন রঙ্গ দেখিব :

কৈছে চরণ কর পল্লব ঠেললি
মিললি মানভুজঙ্গে
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে ॥

শ্রীমতী রাধার কণ্ঠে পশ্চাত্তাপের ভাষা বসাইয়াছেন গোবিন্দ দাস। রাধা সখীকে বলিতেছেন, যে— আমি কানু মিনতি উপেক্ষা করিয়া মানকে বড় করিয়াছিলাম সে-আমি এখন তাঁহার অদর্শনে মদনশরে জর্জরিত হইতেছি :

যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি ॥

পদান্তরে গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা পশ্চাত্তাপে বলিতেছেন কুলবতী হইয়া কেহ যেন (পরপুরুষের পানে) না চায়; আর যদিই বা চায় তো শ্রীকৃষ্ণের পানে যেন না তাকায়; আর শ্রীকৃষ্ণের পানে যদিই বা চায় তো (ভুলিয়াও) তাহার সহিত যেন প্রেম করিতে অগ্রসর না হয়। আর যদিই বা প্রেম করে, তবে সে প্রেমের মধ্যে যেন মানের স্পর্শ না থাকে।

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই
প্রেমে করয়ে জনি মান॥

রাধা-সখী কৃষ্ণ মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সখী সঙ্গে কানুকে আসিতে দেখিয়াও রাধা বিমুখ হইয়া রহিলেন। 'আসল কথা, নারী হইয়া পুরুষের নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিতে শ্রীরাধার সম্ভ্রমে বাধিল।' সখী-ইঙ্গিতে কৃষ্ণ শ্রীমতীর পায়ে পড়িলেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। পদকর্তা প্রেমদাস ঃ

হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল॥
চরণকমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনী-মুখ-শশী হরি-চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥

শ্রীমতী রাধা তখন সুবাসিত বারি দিয়া ঝারি ভরিয়া আনিলেন, কৃষ্ণের পা ধোওয়াইয়া আপন কেশে মুছাইয়া দিলেন, আপন বসনে কৃষ্ণঅঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দিলেন। অপলক নেত্রে কৃষ্ণ-মুখ দেখিতে থাকিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ আমি অতি সংকীর্ণ চিত্ত বলিয়া মান করিয়া ছিলাম। লোকে রমণী-সমাজে আমাকে যখন শ্যামসোহাগিনী বলে তখন আমার বুক গর্বে ভরিয়া উঠে। তুমিই সেই গর্ব পূর্বে বাড়াইয়াছ, সেই গর্বে মত্ত হইয়া তোমার উপর মান করিয়াছিলাম। পদকার গোবিন্দ দাস ঃ

রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুঁহু আগে বাঢ়াওলি
অবহুঁ টুটয়ব কেহ॥

মানের অবসানে রাধা-কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা করিলেন নরোত্তম দাস ঃ

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়ানে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মানবিরামে ভেল এক সঙ্গ॥

বংশীশিক্ষা ও নৃত্য

বৈষ্ণবপদাবলীতে বংশীশিক্ষা ও নৃত্য-বিষয়ক পদ একান্ত কৌতুকঘন। বংশীধারিকৃষ্ণের বংশীবাদনচাতুরী দেখিয়া কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীমতী রাধিকা বংশী শিক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। বংশীর কোন্ রন্ধ্রে কোন্ তান বাজে, কোন রন্ধ্রের গানে যমুনা কল্লোলিনী হইয়া উজানে বাহিয়া যায়, কোন্ রন্ধ্রের গানে কুলাবলা শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় আকুল হইয়া চুরি হইয়া যায়, কোন্ রন্ধ্রের গানে নীপতরু পুষ্পিত সৌন্দর্যে দর্শনীয় হয় তাহাদের সবই রাধা শিখিতে চাহেন কৃষ্ণের নিকট। কবি জ্ঞানদাস পদটির আরম্ভ মুখে লিখিলেন ঃ

ঘর হইতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥

শ্রীমতী রাধা বেণু-শিক্ষার জন্য দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন না কি দাসী বলিয়া বেণু-শিক্ষা পাইবার আবেদন জানাইতেছেন—কে জানে। যাহা হউক রাধাকে কুতুকিনী করিয়াছে বংশীধারীর বংশীবাদননৈপুণ্যে ঃ

কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত ॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্বফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥

কৃষ্ণ শ্রীমতীর এই শিক্ষানুরাগে শিক্ষাদান বিষয়ে স্বীকৃত হইয়া বলিয়া উঠেন —'ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব।' একই পদে জ্ঞানদাস রাধা-কৃষ্ণ-সংলাপ সন্নিবেশিত করিয়া পদটির নাট্যগুণ বিধান করিয়াছেন। 'ভাল হৈল আইল রাই মুরলী শিখাব'—কৃষ্ণোক্তিতে রাধাকে বংশীশিক্ষাদানের স্বীকৃতি না কি রাধা-মিলনে কৃষ্ণচিত্তের পুলকোল্লাসে স্বাগতধ্বনি—সহৃদয় পাঠকের উপভোগ্য ও উপলব্ধিবেদ্য।

জ্ঞানদাসকৃত বংশীশিক্ষার অন্যপদও পাঠককে কৌতুকী করিয়া তুলে। সেখানে বংশীশিক্ষাদানের পরিবেশ রচনা ও উদ্যোগ। গৌরাঙ্গিণী রাধাকে কৃষ্ণ সাজিতে হইবে। পরণে নীলাম্বরী হইলে চলিবে না, পীতবাস পরিতে হইবে। সে পীতবাস কৃষ্ণপরিধানের। কস্তুরিকাচর্চায় তনুলীন গৌরকান্তির আবরণ প্রয়োজন রাধিকার। শ্রুতিবন্দে থাকিবে কুণ্ডলের দোলন, গলদেশে বনমালিকা। মস্তকে মোহনকবরীবন্ধ থাকিলে চলিবে না, তাহাকে খুলিয়া করিতে হইবে চূড়া-বিরচণ ঃ

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধ আলাঞা কবরী ॥

রাধিকার গৌরাঙ্গুলি কৃষ্ণের সোনায় বাঁধানো বাঁশীর সঙ্গে মিলবে ভালো। চরণে চরণ দিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে কদম্বহিলনে দাঁড়াইতে হইবে রাধিকাকে। বিনোদ বংশী বাজাইতে শ্রীমতীর প্রয়োজন সর্বৈব কৃষ্ণানুকার—কৃষ্ণের সর্বপ্রকার অনুকরণ। জ্ঞানদাসে প্রকাশ শৈলীর সারল্য ঃ

গৌর অঙ্গুলি তোর সোনাবান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্বহিলনে থাক
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥

তারপর রাধাধরে তুলিয়া লইতে হইবে মুরলী। কৃষ্ণ পাঠ দিতেছেন রাইকে 'মুরলী অধরে লেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ'। বংশী-রন্ধ্রে অঙ্গুলি-সন্নিবেশ সহজে হইতে চাহে না। কৃষ্ণ বলিতেছেন রাধাঙ্গুলিকে নোয়াইয়া দিবেন তিনি। 'অঙ্গুলি লোলায়্যা দিব আমি'।

পদান্তে জ্ঞানদাস লিখিতেছেন ঃ

জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ॥[১]

শ্রীমতী রাধা অনুক্ষণ মাধবভাবে ভাবিত, তাই প্রিয়তম চেষ্টাও তাঁহার প্রিয় ; সেই প্রিয় চেষ্টার অনুকরণে তিনি সমর্থ হইবেন।

বংশী সঙ্গীতের ললিতকলাবিধি-বিষয়ে সকলকলাকোবিদ গুরু কৃষ্ণ যাহা যাহা বলিলেন শিষ্যা রাধা তাহা তাহা করিলেন। মুরলী বাজিল। মুরলীশ্রবণে সখীগণের কেমন যেন সন্দেহ জাগিল। আসিয়া দেখিল সন্দেহ ঠিকই। চণ্ডীদাস বচনে তাহাদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা ঃ

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যাম রায় ॥

মুরলীধারীকে তাহারা চিনে, তাঁহার অঙ্গবর্ণে ইন্দ্র নীলদ্যুতি। কিন্তু বর্তমান বংশীবাদকজনের গৌরদেহকান্তি বনদেশে আলো ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহার

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী চয়নে এই পদের পাদটীকাভাষ্য এখানে উল্লেখ্য—'শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণেরই পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ান অর্থাৎ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করা শ্রীরাধার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক'।

উপর চূড়াবন্ধন শোভা। নবীন আকৃতিতে নটবর বেশ। তাহারা ব্রজের নটবর কানুকে জানে। ইনি সেই নন্দনন্দন নহেন। তবু কণ্ঠশোভা বনমালা নয়ন-লোভা। আরো বিস্ময় তাহাদের, ইহাদের বামে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দরী কে হইবে। অনুমান বুঝি প্রেয়সী ঃ

ইহার গৌরবরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥

সখীগণ কুঞ্জভুবনে কৃষ্ণ ও রাধাকে দেখিয়াছিল, এখন সেই রাধা-কৃষ্ণ যে কোথায় গেলেন তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। আজ বিপরীত বেশভূষা ও চেষ্টা দেখিতেছে। শ্যাম কৃষ্ণের পরিধানে পীতবাস কণ্ঠে বনমালা, মস্তকে মোহনচূড়া ; গৌরাঙ্গী-রাধা পরিধানে নীলাম্বরী শাটী, বক্ষে হারলতা, মস্তকে কবরীবন্ধন, ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠামে নীপমূলে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ মুরলীমুখে সৃষ্টি করেন সুরসঙ্গীত মূর্চ্ছনা, বামে বৃষভানুনন্দিনী রাধার—এই দৃশ্যেই রাধাসখী-সঙ্ঘ অভ্যস্ত। আজ ইহাদের বৈপরীত্য তাহাদের বিপুল বিস্ময় জাগাইতেছে।

বংশী শিক্ষাবিষয়ক এই পদটির শেষভাগ ঃ

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোনো দেশে ॥

চণ্ডীদাসের সরল প্রাঞ্জলশৈলী পদটির সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে। ব্রজলীলার সখীবৃন্দ রাধার কৃষ্ণসমীপে বংশীশিক্ষাবৃত্তান্ত অবগত। তবু জানিয়াও না জানিবার প্রকাশনরীতি 'আজুকে গো মুরলী বাজায়', 'চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল', 'নটবরবেশ পাইল কথি', 'কে বনাইল হেন রূপখানি', 'কোথায় গেল কিছুই না জানি',-ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া কবি গীতটির রোম্যাণ্টিক পরিমণ্ডল রচনা করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বৈষ্ণব পদাবলী চয়নে 'বংশীশিক্ষা ও নৃত্য' অংশে যে দুইটি নৃত্য-পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার একটিতে রাধানৃত্য অন্যটিতে কৃষ্ণ-নৃত্যের বর্ণনা। চয়ন কৌশল চমৎকার। পদান্তে যে নামটি পাওয়া যায় তাহা কৌতুক জাগায় ও তাহা হইতে বিবেচিত হয় পদদ্বয় কোনো নারী কর্তৃক রচিত।

সে নামটি 'দুখিনী'। ইহা ছদ্মনামও হইতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীচয়িতা পাদটীকায় লিখিয়াছেন 'কেহ কেহ মনে করেন সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শ্যামানন্দই নিজেকে দুখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন।'

'চাঁদবদনী নাচত দেখি' পদে রাধার প্রতি কৃষ্ণোক্তি। নৃত্যকালে অঙ্গধৃত ভূষণাবলী যেন শব্দিত না হয়, পরিহিত সূক্ষ্মবাস থাকিবে অচঞ্চল, নৃত্যত্বরায় চরণচাপল্যে মঞ্জীর যেন রুনুঝুনু বাজিয়া না উঠে। কৃষ্ণ বিষমসংকট নামক তালে বাজাইবেন বাঁশী। তাহার তালে তালে ধনু-আকার নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে রাধাকে নাচিতে হইবে। কথা হইল রাধা যদি নর্তনে অসমর্থা হন তবে কৃষ্ণ নাসিকালঙ্কার বেশর এবং বক্ষোবাস কাঁচলি খুলিয়া লইবেন; সমর্থা হইলে পুরস্কার পাইবেন মোহনমুরলী। পদটির শেষ চারি পঙ্‌ক্তি :

যেমন বলেন শ্যামনাগর তেমনি নাচেন রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারি দিকে চাই ॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে!
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে ॥

'শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে' পদে কৃষ্ণের প্রতি রাধাসখীগণের ভণিতি। এখানেও কঠিন-বিধান :

না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল ॥

সর্ত হইল কৃষ্ণ পরাজিত হইলে তাহারা চূড়া বাঁশী কাড়িয়া লইবে, শুধু তাহাই নয় করতালি দিবে। জয়ী হইলে রাধাকে সমর্পণ করিয়া সকলেই কৃষ্ণের দাসী হইবে।

নৃত্য বিষয়ক পদদ্বয় আমাদের প্রাচীন সূক্ষ্ম নৃত্যকলাবিধিবিষয়ে সাধারণ ধারণা জ্ঞাপন করে, পাঠকহৃদয়ে বিছাইয়া দেয় অপার কৌতুক। একে রাধাকৃষ্ণ-কথা, তাহার উপর রাধাকৃষ্ণের নৃত্যপ্রতিযোগিতার পদ, তাই কৌতুকনিবিড়তা।

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

বৈষ্ণবরসগ্রন্থশিরোমণি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে শৃঙ্গাররসের দুইভেদ বলা হইয়াছে 'স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মত ঃ ॥'—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের দুইভেদ। সম্ভোগ শৃঙ্গারের সমুন্নতি সাধিত হয় বিপ্রলম্ভের দ্বারা। সেই উজ্জ্বলনীলমণিতেই আছে 'স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি কারকঃ' এবং 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিপ্রকার ভেদ বর্ণনা করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিতেছেন ঃ

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভ শ্চতুর্বিধঃ ॥

শ্রীলকৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের একস্থলে লিখিলেন

সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ॥

বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য।

উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা এইরূপ ঃ

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি স্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

প্রিয়ের ঘনসান্নিধানে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষহেতু প্রেমিকার চিত্তলোকে যখন প্রিয়-বিরহের সন্দেহ জাগে তখনকার সেই অনুভব প্রেমবৈচিত্ত্য নামে অভিহিত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিলেন ঃ

প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।
প্রেমবৈচিত্ত্যহেতু বিরহ করি ভাবে ॥

আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যের অংশবিশেষ। আক্ষেপময় অনুরাগ শ্রীমতী রাধার। শ্রীমতী তাঁহার সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। আক্ষেপ-প্রকাশক পদনিচয় পদাবলী সাহিত্যে প্রেমবৈচিত্ত্যের সঙ্গে একত্র সংগ্রথিত হইয়াছে। 'পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ-বিশ্লেষণ করিয়া লিখিলেন—

'কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, আপনার প্রতি, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, গুরুজনের প্রতি,—আক্ষেপ কাহার প্রতি নাই? কেহ যে আপনার হইল না। এমন কি আমিও যেন আমার নই, আমার ইন্দ্রিয়গণ পর্যন্ত আমার বশীভূত নয়।'

পদকর্তা গোবিন্দদাস প্রেমবৈচিত্ত্য বিষয়ে এক সার্থক পদ রচনা করিয়াছেন 'নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই।' সেখানে দেখি নাগর কানুর সঙ্গে বিলাসরঙ্গে শ্রীমতী রাধা নিভৃত নিকুঞ্জ নিকেতনে শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, বাহুবন্ধনে বাঁধিয়াছেন কৃষ্ণকে। অকস্মাৎ কঠিন-বিরহ-কাতরতায় সুন্দরী রাধা কানু কানু করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। এ আর্তির তুলনা কোথাও নাই। কনকখণ্ড আপন বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া এ যেন অন্যত্র তাহার অন্বেষণ। শ্রীমতীর নিকট কানু তো সোনাই—মহামূল্য রত্ন সুবর্ণ।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি, আরতি কহনে যাই।
হেম আঁচরে রহু ভরমিত যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞি॥

রাধা কাঁদিয়া বলিতেছেন তাঁহার রসিক সুনাগর সেই কৃষ্ণ কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে কেন যে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শুধু ক্রন্দন নয়, ধরণীতে লুণ্ঠিতা হইয়াছেন। বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহাকে অচৈতন্য হইতে দেয় নাই, নহিলে এতক্ষণে তিনি হইতেন হতচৈতন্যা। এ দিকে প্রিয়ার অভূতপূর্ব বিরহবোধে কৃষ্ণ চমকিত হইয়াছেন, বচন-স্ফুরণ হইয়াছে বন্ধ। তিনি তখন প্রিয়সহচরীর হাতে হাত দিয়া নিকটে লইয়াছেন। পদকার গোবিন্দদাস সম্ভ্রমভরে দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের এই লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
বিরহবেদনে রহু জাগি॥
রাইকবিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

চণ্ডীদাসকৃত আক্ষেপানুরাগে একটি বিখ্যাত পদ 'বঁধু কি আর বলিব তোরে।' এখানে শ্রীমতী রাধার আক্ষেপোক্তি তাঁহার প্রাণবঁধু কৃষ্ণের প্রতি। কৃষ্ণপ্রীতির জন্যই কিশোরী রাধিকা কুল পরিত্যাগ করিয়াছেন—হইয়াছেন ঘরের বাহির।

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥

যে কৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকার এতো ত্যাগ সেই কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রেমযন্ত্রণা বুঝেন না; এইবার তিনি তাঁহাকে বুঝিতে বাধ্য করিবেন। কামনা করিয়া এইবার তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন সাগরে ডুবিয়া, ফলে জন্মান্তরে তিনি হইবেন কানু, আর কানু হইবেন রাধা

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥

শুধু এইখানেই তিনি থামিবেন না। প্রেম করিয়া করিবেন পরিত্যাগ। বেশীদূরে যাইবেন না, যমুনাপুলিনলীন নীপতরুমূলে বঙ্কিম ত্রিভঙ্গঠামে মুরলীতে তুলিবেন সুরলহরীর মোহনমূর্চ্ছনা। তাহার আবার সময় আছে—শ্রীমতী যখন জল ভরিতে যাইবে কালিন্দীতে। কুলবালা শ্রীরাধা সহজ সারল্যে মুগ্ধা হইবে, তখনই বুঝিবে প্রেমের যন্ত্রণা-বেদনা ঃ

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

প্রেমসান্দ্রতা ভিন্ন এ উক্তি সম্ভব নয়। ইহা উক্তিমাত্র নয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমোৎকর্ষবতী শ্রীমতীর আন্তরার্তির বাঙ্‌মূর্তি। আক্ষেপোক্তির পদে রাধা-প্রেমের গভীরতা-প্রকাশে চণ্ডীদাস সত্যই সফল।

কৃষ্ণের প্রতি রাধার আক্ষেপানুরাগের অন্যপদ ঃ

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

কৃষ্ণের জন্য রাধা করেন নাই এমন কিছুই নাই। ঘর-বাহির মানেন নাই, পর-আপন মানেন নাই, মানেন নাই দিবস-রাত্রি। স্বভাব, সংস্কার, প্রকৃতি, আচরণ সবই বিসর্জন দিয়া, রীতি-নীতি বিপর্যস্ত করিয়া রাধা কানুকে চাহিয়াছেন অথচ কানুপ্রেমের স্বরূপ আজও তাঁহার রহিয়াছে বোধের বাহিরে। চণ্ডীদাস তাঁহার অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিচয়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইলেন ঃ

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈন ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি ॥

ইহার পরও যদি কৃষ্ণ রাধার প্রতি নিদারুণ হন, তখন রাধা কৃষ্ণসমীপেই মরণ বরণ করিবেন ঃ

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

বাঁশীর প্রতি রাধার আক্ষেপ-পদ লিখিয়াছেন চণ্ডীদাস। এই বাঁশী শুনিয়া শ্রীরাধা গৃহকাজে মন দিতে পারেন না, তবু লোকলজ্জার ভয়ে কান্না লুকাইয়া হাসেন। বাঁশীপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকে মনে পড়িয়াছে, তিনি যে বংশীধারী। তিনি তখন বংশীধারীসহ বংশীর উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী ।।

শেষ পর্যন্ত যে বেণু বনের বেণু দিয়া বাঁশীর নির্মাণ তাহাকে ডালে-মূলে উপড়াইয়া সাগর-সলিলে নিমজ্জনের কথা বলেন রাধা ঃ

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ।।

চণ্ডীদাসের এই আপেক্ষানুরাগের আরম্ভাংশ 'মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।'

পদকর্তা কানাই খুঁটিয়ার রচিত ঃ

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ।।

পদে শ্রীমতী রাধার আক্ষেপ সকল অনর্থের মূল বংশীর প্রতি।

বৈষ্ণবমহাজনপদসন্দোহ 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' এক অতি বিখ্যাত পদ। পদটি পাঠান্তরে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত হইলেও জ্ঞানদাসের নামেই সুবিদিত। এখানে রাধা-আক্ষেপ নিজের প্রতি, নিজকর্মের প্রতি, কানুপ্রেমের প্রতি।

রাধা চাহিয়াছিলেন সুখ তাহার জন্য বাঁধিয়াছিলেন ঘর, সেই ঘর আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে; অমৃতাম্বুনিধিতে স্নান করিতে চাহিয়াছিলেন, ভরিয়া গিয়াছে হলাহলে; চাহিয়াছিলেন কানুপ্রেম পাইয়াছেন যন্ত্রণা। ত্রিপদীছন্দে জ্ঞানদাসের সুবোধ্য প্রকাশ-ভঙ্গী ঃ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ।।

তখন আপন কর্মের নিন্দা করিতেছেন শ্রীমতী। আপন মন্দকর্মের নিন্দা ভারতীয় নারীর যুগবাহিত। কালিদাসের সীতাও নিজের দুষ্কর্মের নিন্দা করিয়াছেন রঘুবংশের চতুর্দশে ঃ পুনঃ পুনঃ দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ।

সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥

শ্রীমতী চাঁদ চাহিয়াছিলেন, শীতরশ্মি সুধাংশুর শৈত্যে প্রাণের উত্তাপ জুড়াইবেন ইহাই কামনা। কিন্তু দেখিলেন তাহা মার্ত্তণ্ড। উচ্চ জানিয়া তিনি পর্বতে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, পড়িলেন অতলজলের বিস্তারে। চাহিয়াছিলেন লক্ষ্মী, কিন্তু কোথায় ছিল দারিদ্র্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, অবহেলায় মাণিক্য গেল হারাইয়া। কি অভাগ্য তাঁহার। আরো আছে সাগর বাঁধিয়াছিলেন মাণিক্য পাইবেন বলিয়া, নগর বসাইয়াছিলেন চারিধারে, কিন্তু অপার জলনিধি গেল শুকাইয়া, অভাগী রাধার কর্মদোষে মাণিক্যও গেল কোথায় লুকাইয়া। তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য চাহিয়াছিলেন মেঘ, কিন্তু কোথায় প্রাণপ্রদজল, নামিয়া আসিল প্রাণহর বজ্র। চাহিয়াছিলেন প্রাণ-মন-সন্তর্পণ কানুর প্রেম, তাহা আজ মৃত্যু-অধিক যন্ত্রণাদায়ী হইয়া উঠিয়াছে ঃ

নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করমদোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদসেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
মরণ অধিক শেল ॥

মাথুর

মাথুর কথাটির অর্থ মথুরা সম্পর্কীয়। বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রয়াণ ও প্রবাসকে উপজীব্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ মাথুর-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। মাথুর প্রসঙ্গে প্রবাসের কথাই বলিতে হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাসের এই সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—পূর্ব সঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানস্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥ পূর্বে মিলনপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকার মধ্যে দেশ-গ্রাম-নদী-অরণ্য প্রভৃতি স্থানান্তরের ব্যবধান ঘটিলে প্রাজ্ঞজন তাহাকে প্রবাস অভিধায় অভিহিত করেন। প্রথমতঃ প্রবাস বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক —এই দুই ভাগে বিভক্ত। কার্য্যব্যপদেশে দূরযাত্রা বুদ্ধিপূর্বক। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের আবার দুইভাগ—অদূর ও সুদূর। কালিয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, রাস হইতে অন্তর্ধান ইত্যাদি অদূর প্রবাসের নিদর্শন। সুদূরপ্রবাস-মথুরা গমন। পদাবলীতে নায়কের প্রবাসই বর্ণিত হইয়াছে। অদূর প্রবাসকে করুণ বিপ্রলম্ভ বলা যায়। যুবকযুবতীর একজনের লোকান্তরিত হওয়ার পর যদি সেই দেহে মিলন ঘটে তখন করুণ-বিপ্রলম্ভ হয়। করুণের সংজ্ঞা 'যূনোরেক-তরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে।' কালিয়দমন, রাসান্তর্ধান ইত্যাদিতে দেখা যায় কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পুনরায় মিলন ঘটিয়াছে।

সুদূর প্রবাস তিন প্রকারের—ভাবী, ভবন্, ভূত। 'সুদূর প্রবাস হয় তিন প্রকার। ভাবী, ভবন্, ভূত এই ভেদ তার।' এখানে উল্লেখ থাকে প্রবাস—অদূর ও সুদূর যাহাই হউক তাহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। ভারতীয় প্রাচীন রসতত্ত্বজ্ঞগণের মতে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকারের—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ বিপ্রলম্ভের পরিচিতি বর্তমান।

ভাবী কথাটির অর্থ ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে। মথুরা হইতে অক্রুর আসিয়াছেন শ্রীবৃন্দাবনে। উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন মথুরায়। শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে ভবনে ভবনে তাহারই ঘোষণা পৌঁছাইয়াছে। আগামী প্রভাতেই কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। রাধার প্রিয়তম—বিরহসূচক বামেতর নেত্র থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়াছে। ক্ষণপরের বিরহজনিত দুঃখবোধ রাধাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে।

ভবন্ কথাটির অর্থ বর্তমানে যাহা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছেন বৃন্দাবন হইতে মথুরায়। অক্রুর তাঁহাকে রথে লইয়া তুলিতে যাইতেছেন। শ্রীমতীর নিকট কৃষ্ণ-বিরহ দুর্বিষহ বলিয়া ভাবিতেছেন কৃষ্ণের মথুরা-প্রয়াণোন্মুখ রথে আরূঢ় হইবার পূর্বেই যেন তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

ভূত কথাটির অর্থ যাহা হইয়াছে। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মথুরায়। এই ফিরিয়া আসিবেন, আগামী কালই ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া তিনি মধুপুরী গিয়াছেন। কতকাল গেল, তাঁহার প্রত্যাবর্তন হয় নাই। অথচ নগ-

নদী-বনদেশে, ব্রজভূমির সর্বত্র তাঁহার অজস্র স্মৃতি কীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া আছে। একে কৃষ্ণ-স্মৃতি সদা জাগরিত, তাহার উপর তাহারা সেই স্মৃতিকে করে উদ্দীপিত। নন্দ-যশোমতী, গোচারণসহচর রাখাল সম্প্রদায়, ব্রজযুবতীবৃন্দ সহ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-ব্রততী, কীটপতঙ্গ এক কথায় সকলেই মথুরা-গত কৃষ্ণবিরহে মৃত্যু-পথ-যাত্রী।

চণ্ডীদাস-প্রণীত এক মাথুর-পদে দেখি কৃষ্ণের ভাবী প্রবাসের কথা ললিতা-মুখে শুনিয়াও রাধার বিশ্বাস হয় নাই।

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
সে কথা ত কভু শুনি নাই॥

বিশ্বাস না হইবার কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাধা-হৃদয়ের গোপন পুরের রত্ন পালঙ্কে অনুরাগ তুলিকার শয্যায় শ্যাম কৃষ্ণ আছেন শয়ান। কৃষ্ণ কখনোই এ হেন প্রেমসম্বন্ধকে ছিন্ন করিতে পারেন না। রাধা বলেন কৃষ্ণের পলায়নের পথ নাই। শ্রীমতী আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিলেই কৃষ্ণ বাহির হইবার পথ পাইবেন ঃ

তোমারা যে বলশ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

ভাবটা এই যদি বা কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যান তাহা হইলেও অন্তরের বিচ্ছেদ হইতে পারেনা। কৃষ্ণের সঙ্গে যে তাঁহার নিত্য নিত্য মধুর লীলা অন্তরের অন্তরে চলিয়াছে।

এই পদে কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়ী শ্রীরাধার যে চিত্র ফুটিয়াছে তাহা চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা সেই পূর্বরাগ হইতেই সর্বাবস্থায় প্রেম-বিভোরা। চণ্ডীদাসের রাধার নিকট মিলন ও বিরহ উল্লেখ্য ব্যবধানে ব্যবহিত নয়। মিলনের মধ্যেও যাহার হারাই হারাই ভাব তাঁহার নিকট বিরহ নূতন কোন্ অঘটন সৃষ্টি করিবে? তাই বোধ হয়, মাথুরবিরহ চণ্ডীদাসে তেমন করিয়া ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।

পদকর্তা জ্ঞানদাসের এক ভূত বিরহের পদ। কৃষ্ণ মথুরায় রহিয়াছেন, এদিকে বর্ষা আসিয়া পড়িল। মেঘ-সময়ে সুখিজনের মনও কেমন করিতে থাকে। বিরহার্তের তো কথাই নাই। তাই প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীমতীর বিরহ অকূল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন দামিনী আকাশের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এ দিকে নিষ্করুন কৃষ্ণ আসিলেন না। গগনে গগনে মেঘরাশি ঘোর করিয়া আসিতেছে—গর্জন শুনিতে পাইতেছেন। রাত্রিতে বর্ষাবিন্দু অঙ্গে পড়িলেই

তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন তাঁহার দিনাতিপাত করিবার কোনো উপায় নাই, বাঁচিবার কোনো আশা নাই।

কানু রইল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ ॥
দামিনী দশদিশ ধাব।
নিষ্করুণ কান্ত না আব ॥
সজনি কাহে করব দিন বণ্ড।
জীবইতে ভেল অশণ্ড ॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর ॥
যব নিশি বাহিরে পয়ান।
শীকরে নিকলে পরাণ ॥

এমনই ঘনমেঘ সঞ্চার যে দিবসে সূর্য্য দেখা যায় না। সূর্য্যেরবিরহে সূর্য্য-প্রিয়া পদ্মিনীও বিকশিত হয় না। অবিকচ কমলে অলিগুঞ্জরণ শুনিতে পান না রাধা। মেঘ প্রিয় চাতক কেবল পিউ পিউ ডাকিয়া যাইতেছে। জ্ঞানদাস রাধার প্রমাদ গুনিতেছেন।

সহজ সরল ভাষায় জ্ঞানদাস শ্রীরাধার মাথুর বিরহকে রূপায়িত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন :

দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না পেখি ॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহ পরমাদ ॥

গোবিন্দদাসের পদে শ্রীকৃষ্ণের ভাবী মথুরাপ্রয়াণের ঘোষক অক্রূর। অক্রূরই মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন কৃষ্ণকে লইয়া যাইতে। তিনিই বৃন্দাবনের গৃহে গৃহে কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার পাপবার্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সে যাত্রার দিনক্ষণ আবার বিলম্বিত নয়, আগামী কালই। প্রথমেই নাম-চরিত্রের অসঙ্গতিকে কটাক্ষ করিয়া ভাবিবিরহিণী বলিলেন :

নাম হি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ ॥

ইহার পর রজনী যাহাতে প্রভাত না হয় তাহার উপায় ভাবিতে শ্রীরাধার সখী-পরামর্শ। যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর চরণাশ্রয়ে গিয়া আকাশে যাহাতে চন্দ্র নক্ষত্র প্রকাশিত থাকে, অর্থাৎ রাত্রির অবসান না হয়, কিংবা সূর্য্যসূতা কালিন্দীকে সেবা করিয়া সূর্য্যোদয় যাহাতে না ঘটে—তাহা করিতে শ্রীমতীর সখীর প্রতি নির্দেশ। নচেৎ মৃত্যু যেন ত্বরায় আসে,

কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দ দাস অনুমাতে ॥

গোবিন্দ দাস-রচিত ভূত প্রবাসের বিখ্যাত আর এক পদ। সেখানে দেখি কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীমতী রাধা বিরহ অপেক্ষা মৃত্যুকে কাম্য মনে করিয়াছেন। তবে সর্ত মনে মনে এই স্থির করিলেন মৃত্যুর পর ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম্—পঞ্চভূতে নির্মিতদেহ যেন পঞ্চভূতে মিশাইয়া কৃষ্ণস্পর্শ লাভ করে। দেহের যে অংশ পৃথিবীতে মিশিবে, সেই স্থানে যেন কৃষ্ণ তাঁহার অরুণবর্ণ চরণে গমনাগমন করেন, তাঁহার দেহের সলিলাংশ কৃষ্ণস্নানের সরোবরে যেন মিলিয়া যায়, তাঁহার দেহের বায়ু যেন কৃষ্ণ-ব্যবহৃত বীজনে মৃদুপবন হইয়া ধরা দেয়, তাঁহার দেহের জ্যোতি যেন কৃষ্ণ ব্যবহৃত দর্পণের জ্যোতি হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহার দেহের আকাশাংশ যেন শ্যামজলধরের বিচরণক্ষেত্র আকাশে মিশ্রিত হইয়া যায় :

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যদি গোকুল চন্দ ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদুবাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥

যদুনন্দন দাসের ভবন্ বিরহের পদ। সখীরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনোপচার চম্পকমাল্য রচনা করিতেছে, শ্রীমতী বলিতেছেন আর মালা গাঁথিয়া কাজ নাই, তাঁহার বরনাগর কৃষ্ণ ব্রজধাম অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছেন মথুরায় :

কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার।

বিদ্যাপতি-রচিত মাথুরের পদে রাধা-বেদনা শরীরিনী হইয়া দেখা দিয়াছে। ভূত-প্রবাস বিরহের এক পদে শ্রীমতীর উক্তি—প্রেমাঙ্কুর জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরহ রৌদ্র দেখা দিল। উদ্গত অংকুর দুইটিও পত্র মেলিবার অবকাশ পাইল না। যামিনী যোগে প্রতিপদের চন্দ্রলেখা যেমন অদৃশ্যই রহিয়া যায়, তাঁহার সুখকণাও তেমনি অপ্রাপ্যই রহিয়া গেল। নিষ্ঠুর মাধব মথুরায় গিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াই রহিলেন :

প্রেমক অঙ্কুর জাত আতভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয়যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই
অবধি রহল বিছুরাই॥

আর এক পদে ভূত-প্রবাস-বিরহের বিরহিনী রাধিকার দুঃখকে প্রকাশ করিলেন বিদ্যাপতি। রাধা বলিতেছেন প্রথমেই যদি অঙ্কুর খর সৌরকরে দগ্ধ হইয়া যায় তবে পরে জলপূর্ণ মেঘে কি ফল লাভ হইবে? নবীন যৌবন যদি কৃষ্ণ বিরহে অতিবাহিত হয়, তবে পরে তাঁহার প্রেমে কি লাভ হইবে? হরি, হরি! ইহার অপেক্ষা দৈবদুর্বিপাক আর কি হইতে পারে? জলধির নিকট জলাভাবে যদি কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তবে সে পিপাসা দূর করিবে কে?

বিদগ্ধ বিদ্যাপতির বিশিষ্টপদরচনার ভঙ্গী-যুক্ত মাথুর-কবিতা:

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়ালেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা
সিন্ধু-নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥

রাধার বিরহ-ব্যথা বিদ্যাপতির পদে একান্ত মর্মস্পর্শক্ষমা হইয়াছে:

চিরচন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যাছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহচিতে মিলব মুরারি॥

পাছে কৃষ্ণমিলনে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি হয় এই মনে করিয়া রাধা বক্ষে সূক্ষ্মবাস, চন্দনপঙ্ক বা হার রাখেন নাই। আর আজ তাঁহার কৃষ্ণ নদ-নদী-অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। যে প্রিয়কৃষ্ণলাভের সৌভাগ্যগর্বে তিনি কাহাকেও

গণনা করেন নাই সে প্রিয়-বিহনে আজ তাঁহাকে কেই না কি বলিতেছে। আজ গুরু দুঃখ মর্মপীড়া সৃষ্টি করিতেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেন তখন জীবিত থাকিয়া বা লাভ কি? পূর্ব জন্মে বিধাতা ভ্রম বশত যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইল। কৃষ্ণের কোন দোষ নাই। নিজ কর্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। অন্য-অনুরাগে কৃষ্ণ মথুরা গিয়াছেন, আর তাঁহার বক্ষপঞ্জর শত ছিদ্র হইয়াছে। বিদ্যাপতি বররমণী রাধাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছেন—কৃষ্ণ-মিলন ঘটিবে।

বিদ্যাপতির এ কবি-বচনে বৈদগ্ধ্য থাকিলেও সারল্য বিদ্যমান। বিদ্যাপতির রাধা পূর্বজন্ম এবং স্বকৃত-কর্মে বিশ্বাসবতী। ভারতীয় গ্রাম-জনপদের শাশ্বত-রমণীর চিত্ত, চিন্তা ও ভাষা তাঁহার এই পদ-বিগ্রহে ধরিয়া দিয়াছেন, বিরহ হইয়াছে প্রমূর্ত। প্রিয়-বিরহার্তার বক্ষ-পঞ্জর ছিদ্রে ছিদ্রে ভরিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতি-ভণিত আর এক বিখ্যাত মাথুর পদ ঃ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

কৃষ্ণ গিয়াছেন মধুপুরী। এদিকে পরিপূর্ণ বর্ষার ভাদ্রমাস। শ্রীমতী রাধা একাকিনী রহিয়াছেন গৃহে। বর্ষা নিবিড় হইয়া আসিয়াছে; দশদিকেই তাহার ব্যাপ্তি। মেঘ-গর্জনে সারা ভুবন ভরিয়া গিয়াছে, বৃষ্টি হইতেছে অবিরত। মিলনের মধুলগ্ন এই বর্ষায় রাধাকান্ত আজ দূরগত। নিঠুর পঞ্চশর বিরহিনীকে শরে শরে করিয়াছে জর্জরিত। বজ্রপাতের আনন্দে ময়ূরের সহর্ষ নৃত্য। দাদুরী মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; ডাহুকী ডাকিয়া চলিয়াছে। তিমিরাবৃত দিগন্তে ঘোর রজনীতে বিদ্যুৎ পঙ্‌ক্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে। আর প্রিয়-বিরহে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

বিদ্যাপতির এ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অনুপম। তাঁহার নিপুণ তুলিকা সম্পাতে ভাদ্রপদ মাসের নিবিড় বর্ষার সকল আঙ্গিকে রাধা বিরহ অনবদ্য প্রকাশনা লাভ করিয়াছে।

বিদ্যাপতি-রচিত আর এক অসামান্য পদ মাথুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় ঃ

অব মথুরাপুরে মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূনভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥

মাধব মথুরাপুরী গিয়াছেন। মনে হইতেছে গোকুলমাণিক্যকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে। কারুণ্য-প্রবাহে গোকুল প্লাবিত হইয়াছে। ব্রজবাসীর নেত্র-নীরে তরঙ্গ বহিতেছে। চারিদিকে কেবল শূন্যতা ও শূন্যতা—গৃহ শূন্য, শূন্য নগরী, দশদিক শূন্য, শূন্য হইয়াছে সকলই।

গোকুল-মহার্ঘ-মণি কৃষ্ণের বিরহে রাধার সর্ব শূন্যতা প্রকাশ করিতে বিদ্যাপতির এ কবিতা-নির্মিতি-প্রযত্ন যে একান্ত অতুলন তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করিবেন; বিশেষ এই যুগল-পঙ্‌ক্তি:

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি॥

ভাবোল্লাস ও মিলন

অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরা লইয়া গিয়াছিলেন। মথুরা প্রয়াণকালে শ্রীমতীরাধার নিকট কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি ত্বরিতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু কৃষ্ণের সে প্রতিশ্রুতি পালন হয় নাই। মাথুরবিরহ শ্রীরাধাকে বাহ্যসম্বিত-বিবর্জিতা, উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রত্যক্ষজগতে রাধা-কৃষ্ণের বিরহ হইলেও, কল্পজগতে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে রাধা ছিলেন আনন্দ-বিহ্বল। এ মিলন হৃদয়-লোকে ভাবের উল্লাসে। সাধারণ মিলনে বিপ্রলম্ভের আশংকা যখন সর্বদা মনকে ঘিরিয়া বিরাজ করিতে থাকে ভাবসম্মিলনে সেই আশংকা আর স্থান পায়না। মাথুর পর্যায়ের গান রচনার পর বৈষ্ণবমহাজনগণ ভাবসম্মিলন, ভাবোল্লাস ও মিলনপর্যায়ের পদবিধান করিয়া যথার্থ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। ভাবসম্মিলনের পদরচনা করিয়া পদকারগণ শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ-বাক্যকে ধ্রুব ও অবিতথ এবং কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর অমোঘ-আকর্ষণকে ঐকান্তিক ও ভাবঘন করিয়া তুলিয়াছেন। নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরা—গত হইলেও ভাববৃন্দাবনে তিনি শ্রীমতীর সহিত অচ্ছেদ্যমিলনের নিবিড়তায় আবদ্ধ এই কল্পনা বৈষ্ণবপদকারগণকে ভাবোল্লাস-ভাবসম্মিলন ইত্যাদির পদরচনার প্রেরণা দিয়াছে মনে করিতে হইবে।

সুচিরবিরহান্তে এক প্রভাতে শ্রীমতী রাধার মনে হইয়াছে এইবার তাঁহার প্রিয়তমসম্মিলন ঘটিবে। কপাল-গণক শ্রীমতীর কপাল দেখিয়া ইহা জানাইয়া গিয়াছে। সখীকে ডাকিয়া রাধা শুনাইতেছেন তাঁহার দুঃখের দিন শেষ হইয়া সুখের দিন আসিয়াছে ঃ

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপালী কহিয়া গেল॥

মাধব যে সত্বর রাধাকুঞ্জে আসিবেন, তাহার আরো লক্ষণ আছে—তাঁহার কেশদাম ও বেশ-বসন আনন্দবশে স্ফুরিত হইতেছে, যৌবনসন্নদ্ধ যে দেহভার পীড়াদায়ক ছিল আজ তাহা আনন্দদায়ক মনে হইতেছে। শ্রীরাধার বামনেত্র নাচিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে, দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে বক্ষোবিলম্বিনী হার-লতা। নারীর পক্ষে এ সবই যে আসন্ন-প্রিয়মিলন-সূচক। পক্ষিজগতের কাক বিচিত্র-রবে শুভাশুভ সূচনা করে। কাককে শ্রীরাধা খাদ্য দিয়া প্রিয়াগমনবার্তা শুনাইতে প্রলুব্ধ করিতেন। কাকের দল খাদ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইত। আর আজ তাহারা তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিল। আরো আছে, শ্রীমতীর চর্বিত তাম্বুল আপনা হইতে মুখ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, খসিয়া পড়িয়াছে দেব-মস্তকশোভী মঙ্গল-পুষ্প। কবি চণ্ডীদাস শ্রীমতীর পক্ষে এ সকল শুভ এবং বিধাতাকে অনুকূল ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশে চণ্ডীদাস-খ্যাত সারল্য ঃ

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল॥

কবি বিদ্যাপতি-বিহিত ভাবোল্লাসের পদ। ভাব-সম্মিলনের কল্পনায় উল্লসিতা রাধা ভাবিতেছেন প্রিয় যখন ঘরে আসিবে তখন নিজতনুতে মঙ্গলাচার সাজাইবেন। দেহমন্দিরে কুচ-যুগল হইবে কনক-কলস, কজ্জলাঙ্কিতনেত্র হইবে দর্পণ। আপন অঙ্গে রচনা করিবেন বেদী, মার্জ্জনী নির্মাণ করিবেন কেশকলাপ মেলিয়া, আল্পনা হইবে শুভ্র-চারু মুক্তামালিকা। গুরু নিতম্বকে কদলী করিয়া রোপন করিবেন, তাহাতে মধুস্বনা মেখলা হইবে সহকার পল্লব। আরো আছে। রাধা স্থান-স্থানান্তর হইতে চন্দ্রবদনী কামিনীর দল আনিবেন, মনে হইবে চন্দ্রে শোভা লাগিয়াছে, চাঁদে হাট বসিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রকে ঘিরিয়া। বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধার আশা পূরণ হইবে, দুই-এক পলকের মধ্যে কৃষ্ণ মিলিত হইবেন তাঁহার সঙ্গে। প্রকাশে বিদ্যাপতির বিদগ্ধ-ভণন :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম-হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার॥
কদলী-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
দিশি-দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বৈষ্ণপদাবলী চয়নের এই পদের পাদটীকা এখানে সমুল্লেখ্য—'তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে

জীবাত্মার মিলন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারের স্থান, —সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের কেশ দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে; আলিপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতির হারই আলিপনা হইবে। "The human body is the highest tempe of God" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে। রসের দিক দিয়া দেখিলে এই পদে বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব ভাবোল্লাস বা মিলনানন্দের কল্পনা সূচিত হইয়াছে।'

শ্রীমতী কেবল সাধিকা নন সাধিকাশিরোমণি, আরাধিকা, শ্রীরাধিকা। তাই প্রিয়তমের পূজারাধনায় নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে উপচার-উপকরণে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন।

বিদ্যাপতির এই ভাবোল্লাসের পদটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার জন্য আমরা অমরুক কবির একটি শ্লোক এখানে উৎকলিত করি ঃ

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো ন কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবায়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্‌॥

মানসভাববৃন্দাবনে নিত্যলীলায় শ্রীরাধার অন্তরে ঘটিয়াছে কৃষ্ণাবির্ভাব, আর বিরহাশংকা নয়, এবার অনন্ত ভাবমিলন। মিলনক্ষণে কৃষ্ণের প্রতি রাধাভণিতি চণ্ডীদাসের পদে অপূর্ব হইয়া আছে। বহুদিন পরে তাঁহার বঁধুয়া আসিয়াছেন, ভাগ্যে বাঁচিয়া আছেন তাই দর্শন ঘটিয়াছে। এ দুঃসহবিরহ অবলা নারী বলিয়া তিনি সহ্য করিয়াছেন, পাষাণ সহ্য করিতে পারিত না, বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পাষাণাধিক কঠিন হৃদয় বলিয়া রাধা বাঁচিয়া আছেন এবং অসহ বিপ্রলম্ভ বেদনা সহিয়াছেন ঃ

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥

চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—তিনি দুখিনী, তাঁহার দিন দুঃখেই কাটিয়া গিয়াছে। মথুরা নগরে কৃষ্ণ ভালো ছিলেন কিনা তাহাই জানিবার বিষয়। আপন দুঃখকে গণনার মধ্যেই আনেন না তিনি, কৃষ্ণের কুশলেই তাঁহার কুশল, কৃষ্ণের ভালো থাকাতেই তাঁহার ভালো থাকা। এবার তিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার হারা নিধিকে আপন ক্রোড়ে—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এসব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥

বিরহিনী-তাঁহার বিরহদীর্ঘ দিনযামিনীর প্রহরগুলিকে যে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন, মলয়মারুতের মন্দপ্রবাহ, নীলনভোবিস্তারে চন্দ্রোদয় সুদুঃসহ করিয়া তুলিত, আজ প্রিয়-মিলন-লগ্নে তাহাদের ঘটুক আবির্ভাব। রাধাকণ্ঠে তাহাদের স্বাগতোক্তি ঃ

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

বাশুলীসেবক চণ্ডীদাস বলিতেছেন এবার দুঃখের বিদায়ে সুখোদয় ঘটিল দুখিনী রাধার জীবনে ঃ

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

মৈথিল বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা মিলনকে স্বগতবচনে প্রকাশ করিয়া বলিলেন বহু ভাগ্যবশে তাঁহার আজিকার রজনীর প্রভাত হইয়াছে, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন প্রিয়তম কৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্র। শ্রীমতী যাঁহার বিরহে জীবন-যৌবনকে ব্যর্থ-বিফল জানিয়াছিলেন তাঁহার মিলনে জীবন-যৌবনকে সার্থক-সফল মনে করিতেছেন। দশ দিকের বিশদ-সুষমা আজ তাঁহার নেত্রে-নেত্রে ঃ

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু*
পেখলু* পিয়ামুখচন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু*
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥

এতদিন রাধা গৃহকে গৃহ বলিয়া, দেহকে দেহ বলিয়া মানিতে পারেন নাই। আজ বিধি তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, সকল সন্দেহের হইয়াছে অবসান। আজ তাঁহার গৃহকে গৃহ, দেহকে দেহ বলিয়া মনে লইয়াছে।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু*
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু* সন্দেহা॥

বিরহের দিনগুলিতে যে বিরহিনীর নিকট কোকিল-কূজন, চন্দ্রোদয়, কামদেব ও মলয়প্রবন অসহ্য বোধ হইত সেই বিরহিনী আজ লক্ষ কোকিলকে কূজন করিতে, গগন দেশে লক্ষ চন্দ্রকে উদিত হইতে, পঞ্চবাণ মদনকে লক্ষ বাণ-যুক্ত হইতে, মলয়কে মন্দ মন্দ বহিতে বলিতেছেন। প্রিয়তম-সঙ্গত-দেহকেই তিনি দেহ ভাবিবেন। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধা অল্পভাগ্যবতী নহেন, তাঁহার নবপ্রেম ধন্যাতিধন্য ঃ

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় কর্‌উ চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহ্‌উ মন্দা ॥
অব মঝ্‌উ যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহ্‌উ* মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥

ইহার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার মতো চণ্ডীদাসের পদাংশ ঃ

এখন কোকিল আসিয়া কর্‌উক গান।
ভ্রমরা ধর্‌উক তাহার তান ॥
মলয়পবন বহ্‌উক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশ্‌উলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
দ্‌উখ দ্‌উরে গেল স্‌উখবিলাসে ॥

বিদ্যাপতি রাধার ভাবমিলনের পদে এই যে 'ধনি ধনি তুয়া নব লেহা' বলিলেন ইহার অনেক তাৎপর্য মনে করিতে হয়। অক্‌উল বিরহের মধ্যে প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে ভাববৃন্দাবনে এই মিলনবোধ অভ্‌উতপ্‌উর্ব, তাই নব স্নেহ, অভিনবপ্রেম। ইহা কেবল রাধাতেই সম্ভব হইয়াছে।

বিদ্যাপতি রচিত আর একটি পদ। বিষয় ঃ ভাবমিলন। রাধা ভাবিতেছেন বহ্‌উদিনের পর তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁহার মন্দিরে উপনীত হইয়াছেন। তাই রাধা-হৃদয়ের আনন্দ আজ সীমা মানিতেছে না। বিরহদীর্ঘা ত্রিযামাযামিনীর প্রহরগ্‌উলিতে পাপস্‌উধাংশ্‌উ তাঁহাকে যত পীড়িত করিয়াছে প্রিয় ম্‌উখদর্শনে তিনি ততই আনন্দ লাভ করিলেন। অঞ্চলপ্‌উর্ণ মহাম্‌উল্য রত্নের বিনিময়েও তিনি আর কৃষ্ণকে দ্‌উরদেশে পাঠাইবেন না ঃ

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ স্‌উধাকর যতদ্‌উখ দেল।
পিয়াম্‌উখদরশনে তত স্‌উখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দ্‌উর দেশে না পাঠাই ॥

প্রিয়তম কৃষ্ণের অপরিহার্যতা শীতে বস্ত্রের মতো, গ্রীষ্মে পবনের মতো, বর্ষায় ছত্রের মতো, অপারবারিধিসম্‌উত্তরণে নৌকার মতো। রাজসভার কবি বিদ্যাপতি মালার্‌উপক অলঙ্কারে বলিলেন ঃ

শীতের ওঢ়ণী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥

ভণিতা দিয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধাকে,—সুজনের দুঃখ চিরকালাবধি নহে ঃ

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি ॥

আমরা জানি মথুরাগত কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-প্রত্যাগত হন নাই। তাই রাধার আর কৃষ্ণমিলন ঘটে নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভণিত ভাবসম্মিলনের পদ এতই বাস্তব যে এই পদগুলিতে রাধা যে মিলনের কথা বলিয়াছেন তাহা যে কল্পনা-মিলন তাহা ভাবিতে অসম্ভব বোধ হয়। অবশ্য যে প্রেম বিরহেও তন্ময়তাবশে রাধাকে মানস-বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গতা ভাবায় সে প্রেম যে তুলনা-রহিত তাহা বলাবাহুল্য। রাধা কৃষ্ণসঙ্গে মিলিত হন নাই, অথচ ভাবিতেছেন বহু দিবসান্তে কৃষ্ণ আসিয়াছেন তাঁহার কুঞ্জে। একনিষ্ঠ প্রেমবতী সরলা আভীরবালার এই কারুণ্যঘনবেদনা সহৃদয় পাঠককে কাতর করিবে সন্দেহ নাই।

আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা

বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীর পদসমূহকে যে যে ভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাহাদের সর্বশেষ ভাগ 'প্রার্থনা' নামে চিহ্নিত। বৈষ্ণবপদকারগণ রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতবৃন্দাবনলীলাকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, রূপোল্লাস, অভিসার, মান ও কলহান্তরিতা, বংশীশিক্ষা ও নৃত্য, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, নিবেদন ইত্যাদি পর্যায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ভাবোল্লাস ও মিলনে সমাপ্ত করিয়াছেন। যে অখিলরসামৃতসিন্ধু নন্দনন্দন কৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিনী রাধার বিচিত্রমধুর লীলা কথার কবিতাবিগ্রহ তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন সেই কৃষ্ণ ও রাধার নিকট কবি-চিত্তের যাচঞা 'প্রার্থনা' অংশে নিবদ্ধ। কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রার্থনা নিখিল বিশ্বের তাবৎভক্তজনের প্রার্থনা হইয়া সার্বজনীন স্তরে সমুত্তীর্ণ হয়। কবি-প্রতিভার এমনই আলোকিকী মায়া। 'প্রার্থনা' অংশে কবির আত্মনিবেদন সংকলিত। ইহার সঙ্গে 'নিবেদন' অংশের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'নিবেদন' অংশে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পর দয়িত কৃষ্ণের নিকট শ্রীমতী রাধার আত্মনিবেদন কাব্যকায়া লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী রাধার আত্মনিবেদনের মতো শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদনও বৈষ্ণবমহাজন-লেখনীতে রূপ পাইয়াছে। তবে শ্রীরাধার আত্মনিবেদনই সমধিক প্রখ্যাত। চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীরাধার আত্মনিবেদন ঃ

বঁধু, কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি ।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী

চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণৈক প্রাণতা জ্ঞানদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। জ্ঞান দাসের বিখ্যাত পদ ঃ

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে ।।

মৈথিলকবি বিদ্যাপতি-ভণিত প্রার্থনার এক বিখ্যাত পদ 'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।' বিদ্যাপতি পবিত্র তিলতুলসী দিয়া মাধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট দেহ সমর্পণ করিয়া দিতেছেন। সেই সমর্পিত দেহে বিদ্যাপতির আর কোনো

অধিকার থাকিবে না। প্রার্থনা, মাধব যেন কখনো তাঁহার প্রতি দয়া পরিত্যাগ না করেন। দোষ-গুণের বিচারে তাঁহার সকলই দোষ; গুণের লেশ মাত্র নাই। তবু কবির আশা মাধব কৃষ্ণ জগন্নাথ বলিয়া বিঘোষিত; যতই গুণ-বিবর্জ্জিত তিনি হউন না কেন, সেই ছার তিনি তো আর জগতের বহির্ভূত নহেন; অতএব দয়া তিনি পাইবেন, সেই জগন্নাথই কবির নাথ;

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসীতিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥

বিদ্যাপতির প্রার্থনা কর্মবিপাকে জীবকে এই জগতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় কখনো মানুষ, কখনো পাখী, কখনো কীট, কখনো পতঙ্গ-রূপে। যে রূপে তিনি এই জগতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন শ্রীকৃষ্ণচরিতপ্রসঙ্গে তিনি যেন তাঁহার মতি অবহিত রাখিতে পারেন। কবি বিদ্যাপতি এই জগৎ হইতে সমুদ্ধারের জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছেন। ভবপারের উপায়ও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপদপল্লব যদি ক্ষণেকের জন্য কবি পাইতে পারেন তবে তাঁহার আর ভব-বারিধির ভয় নাই। কবি অতি দীন। দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন তিনি ঃ

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

বিদ্যাপতিরচিত আর এক অবিস্মরনীয় প্রার্থনা বিষয়ক পদ 'তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম।' কবি উপমাযোগে বলিতেছেন সৌরকরতপ্ত বালুকাসঞ্চয়ের উপর জলকণা যেমন একান্ত ক্ষণস্থায়ী পুত্র-মিত্র-রমণীপরিবৃত এই সংসারও তেমনই ক্ষণস্থায়ী। কেবল শাশ্বত হইলেন মাধব কৃষ্ণ। সেই সনাতন কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া ক্ষণস্থায়ী সংসারে তিনি মন দিয়া ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন তখন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিতে

পারিয়াছেন তাঁহার জীবনের কোনো মূল্যই আর নাই। জীবন ব্যর্থতায় হইয়াছে পর্য্যবসিত :

তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুতমিতরমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ॥

কবি তাঁহার নৈরাশ্যময়জীবনের পরিণতির দিকে দৃষ্টি দিয়া কাতর হইয়াছেন। কৃষ্ণ জগতের ত্রাণকারী, দীনের প্রতি দয়াবান ; কবি বিদ্যাপতি এই জগতের এক দীন প্রাণী,—তাই কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস। জীবনের অর্ধেককাল তিনি নিদ্রায় ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পর শৈশব ও বার্ধক্যেও বহুকাল গিয়াছে, প্রমোদকাননে রমণীসঙ্গে রসরঙ্গে মাতিয়াছেন, মাধবভজনার সময় তিনি খুঁজিয়া পান নাই :

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ, দীনদয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা ॥

বিদ্যাপতির প্রার্থনার মাধব ব্রহ্মারও উপরে। এক এক ব্রহ্মার পরমায়ু যুগ-যুগ-ব্যাপী, সেইরূপ অনেক ব্রহ্মা চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু মাধব শ্রীকৃষ্ণের আদিও নাই অন্তও নাই। জলনিধির তরঙ্গভঙ্গ যেমন জলনিধিসঞ্জাত ও জলনিধিপ্রত্যাগত সমগ্রজীবজগৎও তেমনি মাধব-সমুদ্ভূত এবং মাধব-প্রত্যাগত। মাধব সমুদ্রোপম আদি-অন্তহীন ও বিশাল।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি-অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা ॥

বিদ্যাপতির জীবনের শেষ পর্য্যায় মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত। তিনি ভাবিয়াছেন এই ভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারেন একমাত্র মাধবই। মাধবই আদি ও অনাদিকালের নাথ। তাই ত্রাণের ভার তাঁহারই।

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা
আদি-অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব তারণ-ভার তোহারা ॥

চৈতন্যোত্তরযুগের পদকর্তা চন্দ্রশেখর নিজেকে 'ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, নিজের উদ্ধারের আশা দেখিতে পান নাই 'অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার'। তাঁহার প্রার্থনা ঃ

চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পারিষদ-সঙ্গে সংকীর্তণ রসরঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥

চৈতন্যোত্তর কালের পদরচয়িতা নরোত্তমদাস শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের সেবা করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন এক প্রার্থনার পদে ঃ

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥

এই দুহুঁ-সেবায় নরোত্তমদাস পদান্তরে শ্রীরূপ-সনাতনের করুণাভিক্ষা করিয়া লিখিলেন ঃ

হেন রূপ মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

রাধা-কৃষ্ণের দুই রূপের মিলিত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যও পদকার নরোত্তমদাসের প্রার্থনার দিব্য পুরুষ ইহাই স্বভাবিক।

বৈষ্ণবপদসাহিত্যে ঋতুপ্রকৃতি

গ্রীষ্ম

বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীর অনুপমকাব্যসৃজনায় ঋতুপ্রকৃতি বিচিত্ররূচিরা। বৈষ্ণবপদসাহিত্যে গ্রীষ্মের বিরল আবির্ভাব। সাধারণতঃ শ্রীমতী রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ এবং কৃষ্ণকুঞ্জে অভিসারকে উপজীব্য করিয়া বৈষ্ণবকবিগণের গ্রীষ্মবর্ণন। রাধিকার দ্বাদশমাসিক বিরহের মতো বিভিন্ন পদকর্তার গৌরাঙ্গ বিরহকেও অবলম্বন করিয়া গ্রীষ্ম সময় বর্ণিত হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

গ্রীষ্ম। বুঝি, নিঃশেষে ধরণীকে দগ্ধ করে বলিয়াই ইহার নামান্তর নিদাঘ। অভিসার-চিত্রণ-নিপুণ পদকার গোবিন্দদাস কবিরাজ সেই নিদাঘ গ্রীষ্মেই রাধাকে করিয়াছেন দিবাভিসারিণী। উপর আকাশে ললাটন্তপ গ্রীষ্মতপন। প্রচণ্ড মার্তণ্ডরশ্মিতে পথবিস্তীর্ণ বালুকাকণা তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আতপের দাহ-বিস্তৃতি সর্বত্রই বিকীর্ণ। তাহার মধ্যে নবনীতকোমলা কমলোপমচরণা রাধিকা চলেন অভিসার স্থলে ঃ

মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণকমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার ॥

শস্যশূণ্যপ্রান্তরে উন্মুক্তনদীতটে বাংলার বিখ্যাত নিদাঘ-দিবসের ধূলি-ঘূর্ণিতে অভ্যস্তদৃষ্টি গোবিন্দদাস তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। কিন্তু বররঙ্গিনী সব ভুলিয়া চলিয়াছেন অভিসারে ঃ

গুরুজননয়ন পাশগণবারণ
মারুতমণ্ডলধূলি।
তা পয়ে মেলি চললি বররঙ্গিনী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ-বিন্যস্ত শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহের পদে দেখি, বৈশাখ 'মাধবি মাস'। সেখানে পিককুলের পঞ্চমগান ও দক্ষিণপবনের প্রমত্ত প্রবাহ। রাধার কিছুই ভালো লাগে না। কৃষ্ণ যে তাঁহার নিকটে নাই ঃ

মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি নারহ পরাণ ॥

রঙ্গবতীগণ জ্যৈষ্ঠকে মিষ্ট বলিয়া ভাবেন, সেখানে চন্দনচর্চা লাগিবে ভালো, ভালো লাগিবে চাঁদিনী রাত্তি, আরো আছে শীতল সমীর। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিনী রাধার কিছুই ভালো লাগে না। অতি কঠিন মদনদেব তাঁহাকে শাস্তি দেন ঃ

জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনী
চন্দন চান্দিনীরাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ শাতি ॥

তুলনীয়—

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো
র্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারী করোষি ॥

—অভিজ্ঞান শকুন্তল—৩য় অঙ্ক ৩য় শ্লোক।

এইপ্রসংগে গ্রীষ্মের প্রথম মাস বৈশাখের প্রচুরপুষ্প, পদ্মিনীতে মধুপান চঞ্চল ভ্রমর, বৃক্ষবল্লরীর মুকুলশোভার উল্লেখ করিলেন গোবিন্দ দাস। বিরহ তাপিনী রাধা এ সকল সুখোপভোগ হইতে বঞ্চিতা ঃ

মোহই মাধবি মাস।
চৌদিকে কুসুম বিকাশ
বিকাশহাস বিলাস সুললিত
কমলিনি রসজৃম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরীকুল
পদ্মিনি মুখ চুম্বিতা।
মুকুলপুলকিত বল্লী তরু অরু
চারুচৌদিকে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা ॥

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস জৈষ্ঠের যামিনী চন্দ্রোজ্জ্বলা, কবি ভাষায় 'চাঁদ উজোর যামিনী'। কিন্তু রাধার 'বঞ্চিত রহু নিশি বাস। ভৈগেল জেঠহি মাস ॥'

পদকার বলরামদাসের রচনায়ও এই গ্রীষ্মচিত্র। নিশাকর চন্দ্রের কিরণ-প্রকাশ রাধার নিকট জগৎ ভরিয়া অনলবিস্তার বলিয়া মনে হইয়াছে ঃ

পাপ নিশাকর কিরণ পসারল
জগভরি আনল বিথার।

বলরামদাস জৈষ্ঠের আকাশে নব নব মেঘের সঞ্চার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জৈষ্ঠেই বর্ষা ঋতুর নবপ্রবেশ। ক্ষণে ক্ষণে গগনে গগনে মধুর মেঘধ্বনি শুনিয়াই রাধার ত্রাস।

নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর
বরিখা নব পরবেশে :
খেণে খেণে জলদ মধুরময় ধনিশুনি
গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে ॥

পদকার লোচনদাস বৈশাখে চম্পকলতার উল্লেখ করিলেও বিষমরৌদ্রের কথা বলিতে ভুলিলেন না। তাঁহার গৌরাঙ্গ-বিরহ বড় প্রবল।

ও গৌরাংগ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র ॥

জৈষ্ঠ সূর্যের প্রচন্ডতাপে উত্তপ্তবালুকায় পথ চলিতে গৌরাংগের রক্তচরণ কমলে কতনা বেদনা জাগিবে—ভাবনায় লোচনদাস কাতর হইয়াছেন ঃ

জৈষ্ঠ প্রচন্ডতাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা ॥

কবি-প্রাণের আকুলতা তাঁহারই নিজের ভাষায় 'ছটপট করে যেন জল বিনে মীন।' জৈষ্ঠের শুষ্কজলা নদী-দীঘির মীনের অবস্থা কবির স্মরণে আসিয়া থাকিবে।

বর্ষা

ঋতু সমুচ্চয়ের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সে বর্ষা আসিয়াছে প্রধানতঃ অভিসার ও বিরহকে কেন্দ্র করিয়া। সে বর্ষায় অনেক মেঘ, অনেক গর্জ্জন, অনেক বিদ্যুৎ, অনেক অশনিপাত এবং ঘন গহন অন্ধকার। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব গোস্বামীও প্রথমশ্লোকে বৃন্দাবিপিনের উপর আকাশে মেঘে মেঘে মেদুরতার উল্লেখে লিখিয়াছিলেন 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'।

চন্ডীদাসের রাধাসন্নিধানে এক কৃষ্ণাভিসারের পদ। রাধা অভিসারে আসিতে পারেন নাই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছেন অভিসারী। সে এক ঘোর রাত্রি সময়। মেঘের ঘন আড়ম্বর। তাহাতে ধারাপাত। কৃষ্ণ সর্বাঙ্গে সিক্ত-পরিষিক্ত হইয়া রাধার অঙ্গনবর্তী। রাধা হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠেন, সে উক্তিতে বর্ষা-বর্ণনা ও কৃষ্ণদুঃখদর্শনে আপনার আর্ত্তি উভয়ই প্রকাশিত ঃ

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

চন্ডীদাসের মতো বিদ্যাপতিতেও বর্ষা আছে। তাহার আরম্ভ অভিসার-সময়ে। কৃষ্ণ আপন কুঞ্জে থাকিয়া রাধাভিসারের কাঠিন্য স্মরণ করিতেছেন। এমন অন্ধকার যে, মনে হইতেছে যেন রাত্রি সজ্জিত হইয়াছে কজ্জলে। জলদদল ঘন হইয়া আসিয়াছে. বর্ষণ করিতেছে জলভার। এ সময় দূরপথের গমনাভিসার কঠিন ঃ

কাজরে সাজলি রাতি।
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি ॥

বরিস পয়োধরধার।
দূরপথ গমন কঠিন অভিসার ॥

বিদ্যাপতিবিহিত আর এক রাধাভিসারের পদে দেখি সেখানে শর্বরী এমনই সন্তামসী যে মনে হইতেছে যে যেন কাজল বমন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, কিন্তু সে মেঘ বিদ্যুতবিহীন। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিকালোকে পথ দেখিবার উপায় নাই। অভিসারের আশায় সংশয় সমুপস্থিত।

কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি।
অইসন বাহর হোইতে যাতি ॥
তড়িতহু তেজলি মিত আঁধিআর।
আসা সংশয় পরু অভিসার ॥

ত্রিপদী-সম্বলিত বিদ্যাপতি-রচিত অন্য একপদে দেখি তখন বর্ষাবিভাবরী, নিদারুণ অন্ধকারে কোমলাবলা রাধিকা চলিয়াছেন অভিসারে। পথে পথে সহস্র নিশাচরের সঞ্চার। তাহার উপর সঘনবর্ষণ ঃ

বরিস জামিনী কোমলকামিনী
দারুণ অতি আঁধিয়ার।
পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর
ঘনপর জলধার ॥

বিদ্যাপতি-ভণিত মাথুরবিরহের পটভূমিকায় বর্ষার এক নূতন রূপ। সেখানে তাপিনী রাধা একাকিনী সঙ্গিবিরহিণী হইয়া রহিয়াছেন মন্দিরে। তখন বর্ষা প্রবেশ। 'বরিসা পরবেস।' নবীন মেঘের দল চারিদিক ঝাঁপিয়া আসিয়াছে। 'নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল।' মিলনের শুভ মুহূর্তে প্রিয়-বিরহে রাধিকার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। তাহার উপর মেঘের 'ঘন ঘন গরজিত।' আরো আছে, পাপিয়া পিউ পিউ ডাকিয়া প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিতেছে ; আর তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে কেহ নাই। 'পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙর ভ্রমি ভ্রমি দেই তসুকোর।'

বিদ্যাপতিরচিত বর্ষাবিরহের এক অনুপম পদ এখানে আমরা উৎকলিত করি ঃ

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্যমন্দির মোর ॥
ঝম্পিঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কামদারুণ
সঘনে খরসর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাতমোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া ॥

—'হে সখি আমার দুঃখের অবধি নাই। এই ভরা বাদলের ভাদ্রমাসে আমার মন্দিরশূন্য। মেঘসমূহ ঝাঁপিয়া আসিয়াছে, অবিরত গর্জ্জন করিতেছে, ভুবন ভরিয়া তাহার বর্ষণ-ধারা। এমন সময় প্রিয় আমার প্রবাসী জন। দারুণ মদন প্রখর শর হানিতেছে। শত শত বজ্রপাতে আনন্দিত ময়ূর নৃত্য করিতেছে। মত্ত দাদুরী ও ডাহুকী ডাকিয়া চলিয়াছে। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তিমিরে পরিপূর্ণ ঘোররাত্রিতে অস্থির বিদ্যুতের চমক। বিদ্যাপতি বলিতেছেন —রাধা, হরি বিনা তুমি কি করিয়া দিবস-শর্ব্বরী অতিবাহিত করিবে।'

ভাদ্রদিনের ভরাবাদল। বর্ষা এখানে নিবিড় করিয়া আসিয়াছে। গর্জ্জনে বর্ষণে অশনিপতনে চপলাচমকনে বর্ষা ঘনঘোর। তাহার উপর আনন্দিত ময়ূরের নৃত্য, উন্মত্ত দাদুরী-ডাহুকীর উল্লসিত রব। পথিকপ্রিয়া বিরহিণীর নিকট যেন সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের জালপাতা।

জ্ঞানদাসের এক অভিসারপদে বর্ষা। মেঘময়ী যামিনী। অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যুৎ সর্বদিক ব্যাপিয়া চমকাইতেছে। খরতরমেঘে ঝরঝর বর্ষণ।

মেঘযামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশদিক আপি।
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥
দুইচারি সহচরি সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভ'রে চলি গেল ॥
বরিখত ঝরঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনি সঙ্কেত গেহ ॥

যেমন অভিসারের পদে তেমনি উৎকণ্ঠিতা ও মাথুরের পদেও বর্ষা। উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা মেঘ-গর্জ্জিতা দামিনী-চমকিতা রজনীর কথা বলিলেন:

এ ঘোর রজনি মেঘগরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া ॥
... ...
দহয়ে দামিনি ঘনঝলঝলি

পরাণ মাঝারে হানে।

তুলনীয়ঃ এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
... ...
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥—চণ্ডীদাস।

মাথুরের পদে জ্ঞানদাস বলিতেছেন আকাশ নবীন বারিদে ভরিয়া গিয়াছে। নব নব বেশে বর্ষা আসিয়াছে—নামিয়াছে দর দর ধারায়। ডাহুকী প্রিয় ব্যথা জাগরিত করিয়া ডাকিতেছে—হরণ করিতেছে প্রাণ। চকিত চাতকদল নিকটেই ডাকিতেছে—নিকটেই শোনা যাইতেছে মদনবিজয়ী কোকিল-রব। আষাঢ়ের বিরহ প্রগাঢ়।

গোবিন্দদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীমতীরাধার এক বর্ষাভিসারের পদে দুস্তরবাদলের দোলন, ঝনঝনরবে মর্মবিদারণ ঘনঘন বজ্র-পতন, দশদিক-ব্যাপী দামিনী দহন বিস্তারঃ

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদরদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশদিক দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনতার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার॥

—শ্রীমতী আজ অভিসারকুঞ্জের বর্ষাভিসারিকা। মন্দির বাহিরের কঠিন কপাটে মন্দির দ্বার রুদ্ধ। পঙ্কিলপথে চলিতে কতো না শঙ্কা, কত আশঙ্কা! তাহাতে বর্ষার বেগ অতি দুঃসহ। নীলিম নিচোলে বারি নিবারণ হইতেছে না। সুন্দরি কিরূপে অভিসার করিবে? মানসসুরধুনী গঙ্গার অপরপারে তোমার প্রাণের হরি। ঘনঘন ঝনঝন অশনিপাতে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মর্মস্থল জর্জরিত। আর বিদ্যুতের বহ্নিজ্বালা দশদিক ঘিরিয়া। দেখিতেই চক্ষু ঝলসাইতেছে। সুন্দরি শ্রীমতি, এসময়ে যদি গৃহত্যাগ করিয়া অভিসারে চল তবে দেহের মায়া

ছাড়িয়া যাইতে হইবে। গোবিন্দদাস বলেন, যে বাণ ছুটিয়াছে শত যত্নেও তাহা ফিরে না। দয়িতের প্রতি অনুরাগিনী যাইবেনই—দেহ ? সে তো তুচ্ছ।

অভিসারপদের পটভূমিকায় দুর্যোগময়ী বর্ষা থাকিয়া যে তত্ত্বেরই সূচনা করুক না কেন রোম্যাণ্টিক-কবিচিত্তের প্রকাশ যে সূচিত হয় তাহা নিঃসংশয়িত সত্য।

বর্ষাপ্রসঙ্গে রায়শেখরকে মনে পড়ে। কৃষ্ণকুঞ্জে রাধাভিসারের পটভূমিতে মেঘমেদুর, বিদ্যুৎবিলসিত, অশনিপাত-শব্দিত, পবনাস্ফালনময় বর্ষার চিত্র আঁকিলেন তিনি ঃ

গগন অবঘন মেহ দারুন
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশপাতন শবদ ঝনঝন
পবন-খরতর বলগই ॥

এই পদেই পুনরায় তরল জলধরের ঝরঝর বারিপাত ও ঘনঘোর গর্জ্জনের উল্লেখ ঃ

তরল জলধর বরিষে ঝরঝর
গরজে ঘনঘন ঘোর ॥

ভানুসিংহ তাঁহার পদাবলীর অভিসার-বিষয়ক এক অনবদ্য-সুন্দর পদে বলিয়াছেন শ্রাবণ গগনের ঘোর ঘনঘটায় এক নিশীথ-যামিনী, উন্মদ পবনে যমুনার তর্জ্জন, মেঘের সঘন গর্জ্জন। পথতরু লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তাহাতে দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আকাশে নীরদপুঞ্জ রিম্‌ঝিম্‌ শব্দে বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, শাল-পিয়াল, তাল-তমালের কুঞ্জে নিবিড় তিমিরের সঞ্চার। ভাবনা ঃ কুঞ্জপথে অবলা কামিনী কি করিয়া যাইবে ঃ

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনীরে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত, ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
চমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ বরখত নীরদপুঞ্জ।
শালপিয়ালে তালতমালে নিবিড়-তিমিরময় কুঞ্জ।

এই বর্ষাকে উপজীব্য করিয়া ভানুসিংহ রবীন্দ্রনাথের বহুবহু কবিতা সঙ্গীত প্রভৃতির রচনা।

শরৎ

বৈষ্ণবমহাজনপদে অন্যান্য ঋতুর মতো শরৎ ঋতুও স্থান পাইয়াছে। সাধারণতঃ রাসোৎসব ও বিরহ উপলক্ষে শরৎ-ঋতুর পদাবলীসাহিত্যে আগমন।

রাসের পটভূমিতে শরৎ ঋতু গোবিন্দদাস কবিরাজে অতি মনোরমা। সেখানে শরতের আকাশে চন্দ্রপ্রকাশ। পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে। কুসুমগন্ধে বনভূমি ভরিয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল মল্লিকা, মালতী, যূথি পুষ্পের সৌরভে মধুকরবৃন্দ মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শারদচন্দ পবনমন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্লমল্লিকা মালতি যূথি
মত্তমধুকরভোরণি।

এই বিষয়ে পদান্তরে চন্দ্রকরোজ্জ্বলা শারদী শর্বরী, কুসুমিতনিকুঞ্জ, ভ্রমরদল

কী য়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমরভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।

শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহে কবি গোবিন্দদাস শরৎ প্রকৃতিকে কাজে লাগাইয়াছেন। শরতের বিকশিত পদ্ম, সারস-হংস-ধ্বনি, মেঘ-শূন্য আকাশ, চন্দ্রোদয় প্রভৃতিকে দেখিয়া রাধা-হৃদয়ে বিরহ-বেদনা ঃ

আশিন মাসে বিকশিত পদুমিনি-
সারসহংসনিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ ॥

অন্যপদে নির্মল চন্দ্রের দীপ্তি-যুক্ত দীর্ঘ রাত্রি, মালতি-কুন্দ-কুমুদের আকর্ষণে ভ্রমরদলের উল্লেখ ঃ

সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীর্ঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দকমুদিনি
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া ॥

পদকার বলরাম দাসের রাস-প্রসঙ্গে শরৎ ঃ

এ কে সে মোহন যমুনা কূল
আরে সে কেলিকদম্বমূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদযামিনি।

পদকর্তা বলরামদাস শ্রীমতী রাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ প্রসঙ্গেও শরৎ ঋতুর বর্ণনা লিখিয়াছেন। সেখানেও উজ্জ্বল চন্দ্র, নির্মল গগন, ভ্রমর-ভ্রমরী, পদ্ম-বিকাশ ও হংসনিনাদে বিরহিনী রাধার প্রাণের আকুলতা ঃ

উজোর হিমকর নভতল নিরমল
চাঁদনি রজনি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই
বিকশিত পদ্মিনি-কোর ॥
তোহারি দরশাবনন্দ অতি খিন জীবন
গদগদ কহে আধবোল।
আশিন সারস হংসশবদ শুনি
পিয়া-জিউ অতি উতরোল ॥

মেঘ-শূন্য আকাশ, চন্দ্র-কিরণ, মল্লিকা মালতী যূথী কুন্দকুমুদ পদ্ম, মন্দ পবন, ভ্রমর-পঙ্ক্তি, হংস-সারসধ্বনি প্রভৃতিকে লইয়া বৈষ্ণবপদাবলীর শরৎ সময় যেমন বাস্তবানুগ তেমনি মনোহরণ।

হেমন্তশিশির

কেবল বৈষ্ণব পদাবলীতে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে হেমন্ত-শিশিরের স্থান বড় সীমিত। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ ভারতীয় কবিদের মন সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য, বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের ঋতুসংহার ইত্যাদিতে হেমন্ত মনোজ্ঞ হইয়া দেখা দিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি জীবনানন্দের কাব্যে হেমন্ত শিশিরের বহুল প্রকাশ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকংকন মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাস্যা-প্রসঙ্গে হেমন্ত-শীতের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। সেখানে তাহাদের বিশদ বিস্তৃত রূপচিত্র নাই। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে হেমন্ত-শিশিরের যে উপস্থাপনা আছে, তাহা বর্ষাবসন্তের মতো উপচিত রূপ না হইলেও একান্ত সীমিত নহে।

রাধাকৃষ্ণের অভিসার, বিরহ, মিলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়াই হেমন্ত-শিশিরের অবতারণা এই বৈষ্ণব-পদাবলীতে।

রসশাস্ত্রে বিবিধ অভিসারের সমুল্লেখ। পদকর্তা কবিশেখর তাঁহার একপদে শ্রীরাধার হিমাভিসার বর্ণনা করিলেন ঃ—

হিমকর কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরি পবনবিথার ॥
চললি রমণি ধণি আকুলচিত।
সঙ্কেত কেলি নিকটে উপনীত ॥

হিম ঋতুতে হিমের হাওয়ার বিস্তার। উপর আকাশে শীতরশ্মি চন্দ্রের কিরণ। আকুলহৃদয়া শ্রীমতী রাধা সঙ্কেতকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন।

অভিসারের কবি গোবিন্দদাসের পদে অভিসারের কতো না বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে হিমাভিসার অন্যতম। পৌষ রাত্রি। বাতাস মন্দ বহিতেছে। চারিদিকেই হিমপাত। এতোই হিমানীসম্প্রপাত যে চন্দ্র দেখা যাইতেছে না।

সারা জগতের লোক কম্পিত দেহে শয্যায় শুইয়া শীতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছে। এই সময়, সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া রাধা কৃষ্ণের অভিসারে চলিলেন।

পৌখলি রজনি পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপ ॥
হে সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥

কৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তিতে গোবিন্দদাস হিমঋতুর বর্ণনা করিতেছেন। একে হিমময়ী শর্বরী। তাহার উপর যমুনার তীর-ভূমি। সেখানে কুঞ্জকুটীরের আবরণ বলিতে কেবল বল্লরীবলয়। তাহাও আবার ঘন নিবিড় নয়, তরল। হিমসমীর বাধাপ্রাপ্ত হইবে কী করিয়া ঃ

হিমঋতু যামিনি যামুন তীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর ॥
তহুঁ তনু থির নহে তুহিন সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যাম শরীর ॥

পদকার রাধামোহন রাধার শীত সময়ের দিবাভিসার লিখিলেন। একে শীতের হিম, তাহার উপর শীতের সঞ্চার। কুহেলী দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সূর্যকিরণকে প্রতিরোধ করিয়াছে। ইহাতে শ্রীমতীর সুবিধা এই যে কেহই সঙ্কেতকেলিকুঞ্জে তাঁহার অভিসরণ-পথরেখা দেখিতে পারিল না।

সহজই শীত সময় অতি হীম।
ততোধিক পবন বাঢ়ায়ত সীম ॥
কুঝটি ভেল তঁহি দশদিগ ব্যাপি।
দিনমণি কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি ॥
রাই করল সুখে হরি অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার ॥
কছু নাহি দীশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার ॥

পদকর্ত্তা অনন্তদাস। শ্রীমতী হেমন্ত-শিশিরের দিনে নিকুঞ্জআশ্রয় করিয়া পূর্ব পূর্ব বাসক-শয়ন-স্মৃতিতে আকুল হইতেছেন। বিরহবেদনার সঙ্গে তুহিন পবন তাঁহাকে কম্পিত করিতেছে—

তোহারি সঙ্কেতে নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিন পবনে বিরহবেদনে
সঘনে-হৃদয়ে কাঁপ ॥

শীতের দীর্ঘাঙ্গী রজনী অবসিত হইতে চাহে না সহজে। 'দীঘল রজনি তুরিতে না পোহায়। ছটফট করি নিশি জাগিয়া গোঙায়।' উদ্ধবদাসের মধুর ত্রিপদী এই একই প্রসঙ্গে—

হিমঋতু সময়ে সংকেত কুঞ্জেধনি
তুয়া লাগি করত বিলাপ।
ঘোর বিরহ জরে জর জর মানস
শিশিরহি থরথর কাঁপ॥

গোবিন্দ দাস রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনার অবসরে পৌষ-প্রসঙ্গ বলিয়াছেন।

কোই করয়ে জনি রোখে।
আওল দারুন পোখে॥

বলরাম দাস শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ মাসিক বিরহ গাহিতে হেমন্ত শীতের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমতীর দূতী মথুরায় গিয়াছিল। মথুরা হইতে আসিয়া দূতী বিস্তারিয়া বলিতেছে। সেখানে মাস অগ্রহায়ণ।

আঘন মাস নাহহিয় দিহই
শুনইতে হিমঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির
সুন্দরি তুঁহু ভেলি বাম॥

হেমন্ত শিশিরে অভিসার-বিরহের মতো মিলনও। পদ কর্তা রাধামোহন—

রাধা মাধব করু রস পুঞ্জে।
হিম ঋতু দিসহি মিলল দুহুঁ কুঞ্জে॥
নিবিড় আলিঙ্গনে শীত নিবার।
একমুখে ঘাম আরে শিতকার॥

নিবিড় মিলনের নৈকট্যে শীত দূরে গিয়াছে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে শ্রীরাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনার মতো বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বর্ণনাও আছে। পদকার লোচন দাস হেমন্ত-শীতের উপস্থাপনা করিয়াছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তিমুখে—

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কোপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা॥
পোষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুখ তিলকে না থাকে॥
মাঘে দ্বিগুন শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥

বর্ষার বাধার মতো হেমন্তের বাধা অতিক্রম করিয়াই শ্রীরাধার কৃষ্ণাভিসার। বর্ষার বিরহ ব্যাকুলতার মতো হেমন্ত-শীতেও রাধা কৃষ্ণের-বিরহব্যাকুলতা।

বিরহব্যাকুলতা বিষ্ণুপ্রিয়ার। বর্ষার মিলন-সুখের মতো হেমন্ত শিশিরেও রাধার প্রিয়-মিলন-সুখ। কেবল বর্ণনার জন্য ঋতু বর্ণনা নয়, রাধা-কৃষ্ণের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় সুবলিত হইয়া তাহাদের অবতারণউপস্থাপনা।

বসন্ত

ভারতীয় সাহিত্যে বসন্ত ঋতু প্রাচীন। বৈষ্ণবমহাজন পদাবলীতে বসন্ত আছে। বৃন্দাবিপিনের বসন্ত অনন্ত বসন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির বসন্ত ঋতুপতি। পাটলের পত্র তাহার আসন, কেশর কুসুম হেমদণ্ড, কাঞ্চন পুষ্প ছত্র, পাটলের ফুল তূন, অশোকের বিকাশ বাণ সমূহ, ভ্রমরঝঙ্কার সুরযন্ত্র, বিহগের কাকলী আশীর্বাদমন্ত্র, কোকিলকূজন সঙ্গীত, ময়ূর-উল্লাস নৃত্য, মধুমক্ষিকা সৈন্যবৃন্দ।

আ এল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্হ ॥

কবি কণ্ঠহার নবাগত বসন্তকে দেখিবার জন্য ডাক দিয়াছেন। কুন্দ ও কেতকীর হাসি, নির্মল চন্দ্র, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, উজ্জ্বল রাত্রি, অন্ধকার দিন। এই বসন্তেই তাঁহার 'মধুসূদন-রাধা বনবিহার'। অতএব

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত।
জঁহা কুন্দকুসুম কেতকি হসন্ত ॥

শিশিরান্তের বৃন্দাবনের বসন্ত বর্ণনা করিলেন গোবিন্দ দাস তাঁহার অলঙ্কার-প্রসন্ন-কণ্ঠে। নব পল্লবে শোভিত তরুগুলি। ভ্রমর ও কুসুমের মিলন। সারী-শুক-কোকিলের সঙ্গীত। তাহার মধ্যে বৃন্দাবনের যুগল কিশোর কৃষ্ণ-রাধার বিহার।

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সর্ব কানন-অন্ত ॥

জ্ঞানদাসের সহজ সরল সুর। 'তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। মদন মহোৎসব পিককুল রাব'॥ শ্যামল কৃষ্ণের প্রেম বসন্তে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ॥

এই সুন্দর বসন্তে সুঠাম নাগর নীলমনি কৃষ্ণ ও কাঞ্চনবর্ণাঙ্গী রাধার মিলন। বসন্ত বর্ণনায় বলরাম দাসের বাণী—

দোঁহে দোঁহে হেরইতে দুঁহু ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম, শ্যাম ভেল গোরী ॥

কবি গোবর্দ্ধন এই মিলনের সরস বর্ণনা দিলেন—

মধুর কেলি, মধুর মেলি,
মধুর মধুর করয়ে খেলি,

মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যামর গৌরী কাঁতিয়া।

বসন্তে কবি আজ এ কী অপূর্ব দেখিলেন—

কিবা সে দুঁহুক বদন ইন্দু
তাহে শ্রমজল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া ॥

সময়ের সার বসন্ত। বসন্তের সার ফাগু বা দোল উৎসব। গগনে সূর্যের রঙ, বনে ফুলের রঙ, মনে মনে ভাবের রঙ, ভুবনে ভুবনে আনন্দের রঙ, বৃন্দা-বিপিনের কুঞ্জে কুঞ্জে ফাগের রঙ, সবই রঙ্গময়। ফাগুয়ার রঙে তরুলতা, ময়ূর ময়ূরী কোকিল-কোকিলা, ভ্রমর-ভ্রমরী, এমন কি কালিন্দীর কালি আভা আজ রঞ্জিত। রাধাবদনে ফাগুয়ার লাল, লাল শরমের। কবি জ্ঞানদাস বলিলেন—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে ॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি অঙ্গে।
মুখমোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে ॥

নব রসালের মুকুল মধুমত্ত নব কোকিলের গান নব যুবতীর চিত্তকে উন্মত্ত করে। রাজসভার কবি বিদ্যাপতির বিদগ্ধ ভণিতি—

নবল রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিল কুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নবরসে কানন ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবল নব নাগরী
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥

বসন্তের আবীর খেলার বৃন্দাবন। উদ্ধব দাসের উক্তি—

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।

বাসন্তী রাকা রজনী। রসরাজ কৃষ্ণ ও রসবতী রমণীরত্ন ধনী রাধিকা। রঙ্গিনী সঙ্গিনীর কঙ্কনাকিঙ্কিনী ও শিঞ্জিনীর রণরণি শব্দের রসনৃত্য ও রতিগীতি। রবাব-মুরলীর সুরনির্ঝর। বিদ্যাপতির কলাবতী কবিতায় সেই নৃত্য-গীতিকা—

রঙ্গিনীগণ রসরঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কন কিঙ্কিনী রটই ॥

আজ বিদ্যাপতির নিকট সবই মধুর—

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি ॥

আর যদুনন্দন দাসের সবই ফুলময়, ফুলের বনে ফুলের দোলা, ফুলের দেহ, ফুলের আভরণ, হাতে ফুলের শরাসন।

ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিষয়ে ফুল পুঞ্জ ॥

আরও—

অপরূপ ফুল দোল ফুল বিলাস।
ফুল করে রহু যদুনন্দন দাস ॥

বসন্ত স্বভাববশতঃ রসমূর্ত্তি। তাহার উপর বৃন্দারণ্যের বসন্ত। রসামৃত সিন্ধু কৃষ্ণকিশোর রসময়ী রাধাকিশোরীর সঙ্গে মদনমহোৎসবে মাতিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর বসন্ত অন্য তুলনাবহিত।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

ক. বিদ্যাপতি

বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর ইতিহাসে বিদ্যাপতি এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। এই মৈথিল কবির জীবনকাল সম্ভবতঃ ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের আস্বাদনমাহাত্ম্যে, বাঙ্গালীর পদাবলী প্রিয়তায় মিথিলারাজসভার কবি বিদ্যাপতির পদসমূহ আজ বাংলার সম্পদরূপে পরিগণিত।

বিদ্যাপতি 'একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনীকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত-লেখক ও স্মার্তনিবন্ধকার হিসাবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন।' 'কীর্তিলতা' নামক ঐতিহাসিক কাব্য, 'পুরুষপরীক্ষা' নামক নীতি পুস্তক, 'কীর্তিপতাকা,' নামক অবহট্‌ঠ ভাষায় গ্রন্থ, 'শৈবসর্বস্বহার,' 'গঙ্গাবাক্যাবলী' 'বিভাগসার' 'দানবাক্যাবলী' 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, প্রভৃতি পুস্তক ও অসংখ্য রাধাকৃষ্ণপ্রেমবিষয়কগীতি পদ্যে ও গদ্যে বিদ্যাপতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। দেবসিংহ, কীর্তিসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সরস কবি, কবিকণ্ঠহার, নবজয়দেব, অভিনবজয়দেব, নব কবি শেখর, ভূপতিসিংহ ইত্যাদি উপাধি-ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির পদ আমরা পাই। ষাট বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনা। শিবসিংহের রাজত্বকালে রচিত বিদ্যাপতির পদসন্দোহ উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় বহন করে। "এই যুগের পদে রূপরস ও বর্ণের ইন্দ্র

ধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। কল্পলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন নায়িকার (রাধাচিত্রের) মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।” বিদ্যাপতির ধর্মমত বিষয়ের সংশয় আজিও নিরসন লাভ করে নাই। আমাদের মনে হয় প্রথম জীবনের শৈব বিদ্যাপতি উত্তরকালে বৈষ্ণব বিদ্যাপতিতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবতের পুঁথি-নকলের কাজ হইতেই বোধ হয় তাঁহার ধর্মমতপরিবর্তনের সূচনা।

বিদ্যাপতির উপর সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিগণের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কালিদাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি, অমরু প্রমুখের কাব্য, বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দো-গ্রন্থ বাৎসায়নাদির কামশাস্ত্র বিদ্যাপতির রচনায় যে প্রভাব রাখিয়াছে তাহা অগ্রসর পাঠক ও গবেষকজনের বুঝিতে কষ্ট হয় না।

তাঁহার রচনায় মননশীলতার সঙ্গে আলঙ্কারিক ও ছান্দসিক চারুতা মেলবন্ধন লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়প্রধান অঙ্গবর্ণনের মানবিক আবেদন তাঁহার রচনায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিল। তাই নায়িকারাধার ক্রমপরিবর্তন অঙ্কণে বিদ্যাপতি বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন। ইন্দ্রিয়নিবন্ধ মর্ত্ত্যজগৎ হইতে ভাবতন্ময়তার রাজ্যে বিদ্যাপতির সমুত্তরণ তাঁহার পদাবলীকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

প্রেমমতাদর্শ ও কলাবিধিতে কালিদাস, ভর্তৃহরি, অমরু, জয়দেব প্রমুখের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জয়দেবের হরিস্মরণাকাঙ্ক্ষা ও বিলাসকলাকৌতুহলের মধ্যে বিলাসকলাকৌতুহল বিদ্যাপতিতে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার বুঝি অভিনবজয়দেব বা নবজয়দেব-আখ্যা। ভর্তৃহরি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতকের রচয়িতা। তিনি যখনই যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন তখনই তাহাকে চরম পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার শৃঙ্গারশতকে উপভোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত। অমরুর নিকট দয়িত এবং দয়িতার সম্পর্কই সব, আর সকলই তুচ্ছ। প্রেমের কবি অমরু জানেন শুধু আপন প্রিয়াকে। ‘Amaru paints the relation of lovers and takes no thought of other aspects of life.’ কালিদাস কেবল অদ্বিতীয়। কালিদাস সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন ‘কালিদাসের সৌন্দর্য্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগ বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য্যভোগের এবং ভোগ বিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্যসৌন্দর্য্য বিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্যে জয়দেবলভ্য রতিসুখসার প্রেম-চিত্র, ভর্তৃহরি-অমরুখ্যাত শৃঙ্গারসম্ভোগ, বাৎসায়নবিখ্যাত কামকলা, সংস্কৃত কাব্যভঙ্গির সবই মিলিবে। কালিদাস তাঁহার কাব্যে যৌবন তথা সৌন্দর্য্যোপভোগস্পৃহাকে যে ভাবে কল্যাণমাধুর্য্যে পরিণতি দান করিয়াছেন তাহা কেবল বিদ্যাপতি নয়, অন্যত্রও দুর্লভ। তবু

বিদ্যাপতি বিষয়ে উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার দেহাশ্রয়বর্তিনী কামনা একসময় বিরহতন্ময়তার পবিত্রতায় উন্নীত হয়। অঙ্গাশ্রয়িনী কামনাতটিনী লীন হইয়া যায় বিরহের অশ্রুসমুদ্রে।

যে-কৌশলে বিদ্যাপতি তাঁহার বয়ঃসন্ধিগতা রাধাকে বিকচযৌবনা করিয়া তুলিয়াছেন, চঞ্চলাকে চাতুর্যময়ী ও গভীরা করিয়া তুলিয়াছেন, ভীরু ও মুগ্ধাকে কৃষ্ণপ্রেমবিভোরা ও আত্মহারা দেখাইয়াছেন, কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত মানস-বিবর্তন সাধিত করিয়াছেন তাহা এক কথায় পদাবলীসাহিত্যে তুলনা রহিত। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বিষয়ের পদ অনুপম। বয়ঃসন্ধি-বর্ণনায় বিদ্যাপতির নৈপুণ্য এমনভাবে প্রকট হইয়াছে যে পূর্বরাগের পদপ্রয়োজন যেন নিঃশেষিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত বয়ঃসন্ধি-পদে বয়ঃসন্ধি-সমুচিত দেহ-মনের পরিবর্তন প্রকাশিত ঃ

সৈসব জোবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দন্দপড়ি গেল॥
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয়থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে সুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

কিংবা

খনে খনে নয়ান কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন ছটাছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চঁউকি চল এ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি ঘোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুণ ভেট।
লখএ ন পারএ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুণিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥

তবু পূর্বরাগময়ী বিদ্যাপতির রাধা যখন বলেন কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ ব্যাখ্যা করিতে তিলে তিলে নূতন বলিয়া মনে হয়, জন্ম হইতে রূপ দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হইল না, মধুর বাক্য শুনিয়াও যেন শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল না এবং

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥

তখন বিদ্যাপতির গভীরতামুখী মনের প্রকাশ উন্মোচিত হয়।

রাধাপূর্বরাগের মতো কৃষ্ণ-পূর্বরাগও বিদ্যাপতির তুলিকায় কম পারিপাট্য লাভ করে নাই। নায়িকার অঙ্গ-বর্ণনা সেখানে প্রকট, রচনারীতি সংস্কৃতানুগ। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সজনি ভালো করিয়া দেখা হইতে পারিল না। মেঘমালার সঙ্গে বিদ্যুৎবল্লরীর মতো নীলবাসে গৌরাঙ্গী রাধা হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। অর্দ্ধেক বক্ষ হইতে অঞ্চল স্খলিত হইয়াছে, অর্দ্ধেক বদনে হাস্যরেখা। অর্দ্ধেক নয়নে কটাক্ষতরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অর্দ্ধেক অঞ্চলে আবৃত অর্দ্ধেক স্তন-দর্শনে মদন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। একে রাধাদেহ গৌরাভ, তাহার উপর কনক-কটোরার মত স্তনযুগ্ম, অনঙ্গ তাঁহার কাঁচলী, তাহার উপর হারলতা মনোহরণের জন্য কামদেব কর্তৃক স্থাপিত; বুঝি বামদেববিহিত ফাঁস। মুক্তাপঙক্তিসুন্দর-দন্তরাজি অধরে মিলিয়াছে, তাহার উপর মৃদু বচনাবলী। বিদ্যাপতি বলিতেছেন কৃষ্ণের সে রূপ দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হয় না :

সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল
মেঘমালা সঁয় তড়িত লতা জনু
হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হাসি
আধ হি নয়নতরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একতনুগোরা কনয় কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনু বুঝি ঐ সন
ফাস পসারল কাম ॥
দশনমুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আসা ॥

রাধা-পূর্বরাগের পদরচনায় বিদ্যাপতির অমরু-অনুসৃতি লক্ষণীয় ঃ

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর।।
ততহু সঞে হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তই অও পসারএ পাখি।।
মাধবে বোললি মধুর বাণী
সে সুনি মুদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পচবান।।
তনু পসেবে পহাসনি ভাসনি
পুলক তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু।।—বিদ্যাপতি

তস্বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং
দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো
স্তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে
শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাং চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ
স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা
মৎকঞ্চুলীসন্ধয়ঃ।।—অমরু

অভিসারবিষয়কপদ রচনায় বিদ্যাপতির কালিদাস, অমরু, জয়দেব প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণের অনুসরণ চোখে পড়ে। তবু বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। অভিসারিণীর প্রতি সখী-দূতী-উপদেশ ঃ প্রথমে নিকটবর্তিনী হইবে না। কুটিল অপাঙ্গবিক্ষেপে কৃষ্ণর মদনকে জাগ্রত করিবে। স্তনস্কন্দ আবৃত করিয়া স্তনমূলসৌন্দর্য্য দেখাইবে। নীবিগ্রন্থি দৃঢ় রাখিবে। মান করিবে, ভাবও রাখিতে হইবে। এমনভাবে রস রাখিতে হইবে যাহাতে সে পুনঃপুনঃ আসিতে পারে ঃ

সজনি পহিলহি নিঅরে না জাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি।।
ঝাপাবি কুচ দরসায়বি কন্ধ।
দৃঢ় করি বান্ধাবি নীবিক বন্ধ।।
মান করাবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুনপুন আব।।

মানের পদে বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের প্রভাব প্রকট। মাথুর ও ভাব-সম্মিলনের পদে বিদ্যাপতির কবিত্ব অসাধারণ মহিমা লাভ করিয়াছে। দেহকেন্দ্রিক প্রেম সেখানে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। রাধাআর্ত্তি তাহাকে লোকোত্তর সমুন্নতি ও গভীরতা দান করিয়াছে। মাথুরের এক পদে রাধা বলিতেছেন ঃ মিলন-ব্যবধান-ভয়ে বক্ষে সূক্ষ্মবাস ও চন্দনদ্রবানুলেপন অর্পণ করি নাই ; সেই

প্রিয়তম আজ নগ-নদী-অন্তরবর্তী। যে কৃষ্ণগর্বগৌরবে আমি কাহাকে গণি নাই, আজ তাহাদের কেই বা না কি বলিতেছে ঃ

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা।।
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়াঁ বিনা মোহে কে কি না কহলা।।

প্রকৃতিসচেতন কবিবিদ্যাপতির কালিদাসানুগত্য সার্থকতা লাভ করে যখন তাঁহার মাথুর-বিরহ বর্ষাপ্রকৃতির পটভূমিকায় সংস্থাপিত হইয়া অনন্যসাধারণ প্রকাশনা লাভ করে ঃ

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

রাধা অবিরত 'মাধব মাধব' স্মরণ করিয়া মাধব হইয়া গেলেন, আপনার গুণ-লুব্ধ তিনি নিজ ভাব-স্বভাব ভুলিয়া গেলেন।—

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজভাব স্বভবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাঈ।।

—অংশে প্রকাশিত অধ্যাত্ম-তন্ময়দৃষ্টি বিদ্যাপতিকে লোকোত্তর-কবি-মর্যাদা দিয়াছে।

রাধা ভাবসম্মিলনের পদে বলিতেছেন কৃষ্ণ ঘরে আসিলে তিনি নিজ দেহে করিবেন মঙ্গলাচরণ। স্তনদ্বন্দ্ব হইবে সুবর্ণকুম্ভ। নেত্রে অঞ্জন দিয়া করিবেন দর্পণ। আপন-অংগে নির্মাণ করিবেন পূজা-বেদী। কেশদাম হইবে মার্জনী। গুরু নিতম্বযুগল হইবে কদলী। নিতম্বমণ্ডল-কিঙ্কিনী হইবে আম্রপল্লব। দেশ-দেশ-সমানীত পরিপার্শ্ববর্তিনী কামিনীরা চাঁদের হাট বসাইবে।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মংগল জতহু করব নিজ দেহে।।
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগরাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি।।
বেদি বনাওব হম অপন অংগমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুরবিছানে।।
কদলি রোপব হম গুরুআ নিতম্ব।
আমপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প।।
দিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদক হাট।।

ইহার সংগে মিলাইয়া পড়িবার মতো অমরুকবিতা ঃ

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈবনেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।

দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা ।
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তম্ব্যা কৃতং মংগলম্ ।।

বিদ্যাপতি বিরচিত

(১) মাধব. বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ।।

(২) তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুতমিতরমণীসমাজে ।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ।।

প্রভৃতি পদে ভগবদুপলব্ধির সংগে ভক্তহৃদয়ের গভীর আকুতি সহৃদয় পাঠকবর্গকে দেহাতীত জগতে লইয়া যায় ।

খ. গোবিন্দদাস

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবমহাজনমালিকায় গোবিন্দদাসকবিরাজ এক অত্যুজ্জ্বলমণি-স্বরূপ । খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত কবির জীবনকাল । গোবিন্দদাস কবিরাজের বাসভূমি তেলিয়া বুধরী, পৈত্রিক বাসস্থল কুমার নগর । পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা, পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্র দিব্য সিংহ, পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ । নরহরি চক্রবর্তিপ্রণীত ভক্তিরত্নাকরে আছে—

রামচন্দ্রগোবিন্দ এ দুই সহোদর ।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ।।
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডতে ।
তেঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে ।।

মাতামহ দামোদর হইলেন বিখ্যাত সঙ্গীতদামোদরের রচয়িতা । জাতিতে বৈদ্য হইলেও গোবিন্দদাস পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ হইতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের ধারা লাভ করিয়াছিলেন ।

অগ্রজ রামচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণভক্ত । বাল্যে গোবিন্দদাস মাতুলালয়ের শাক্ত পরিবেশে হন বর্দ্ধিত । কঠিন গ্রহণীরোগে মরণাপন্ন গোবিন্দদাস অগ্রজ রামচন্দ্রের প্রেরণায় শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । ইহার পর হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার প্রকাশ । গুরু শ্রীনিবাসের আদেশে গোবিন্দদাস কর্তৃক কৃষ্ণ পদ-রচনা । শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামিগণ গোবিন্দদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হন ও কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন । গোবিন্দদাস ছিলেন 'মঞ্জরী' ভাবের সাধক ।

গোবিন্দদাস সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন । শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদাবলী' ও শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত, গোবিন্দদাসের উপর প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিল। গোবিন্দদাস প্রায় ছত্রিশ বৎসর যাবৎ সারস্বত সাধনায় রত ছিলেন। যুগ-ব্যবধানে ব্যবহিত হইয়াও গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি-ব্যবহৃত ব্রজবুলিকে ভাষা ও সংস্কৃতানুগ অলংকার ছন্দ-রীতিপ্রধান রচনাভঙ্গীকে নিজ সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শাক্তপদ', সংস্কৃতনাটক 'সঙ্গীত মাধব' ও বৈষ্ণবপদ-সমূহের রচয়িতা গোবিন্দদাস।

(১) বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ
নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
(২) কবি-পতি বিদ্যাপতি মতি মানে
লাখগীতে জগচীতে চোরায়ল
গোবিন্দ-গোরি-সরস-রস-গানে।
ভুবন আছয়ে যত ভারতি-বাণি।
তাকর সার সার পদসঞ্চয়ে।
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥

এবং অন্যান্য পদে গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বৈষ্ণবকবি বল্লভদাস গোবিন্দ দাস কবিরাজকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতিআখ্যায় ভূষিত করিয়া লিখিলেন ঃ

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনে দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি॥
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

যেহেতু বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলাবলম্বনে সুন্দর পদরচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন এইজন্য গুরু শ্রীনিবাস গোবিন্দদাসকে সে বিষয়ে পদরচনা না করিয়া কৃষ্ণবিষয়ক পদরচনায় মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছিলেন। তবু গোবিন্দদাসের গৌরবিষয়ক পদ তাঁহার গৌরশ্রদ্ধার অকৈতব প্রকাশ। গৌরাঙ্গ-দর্শন-বঞ্চিত গোবিন্দদাসের ভক্তকবিচিত্ত সেই সেই পদে যে আর্তিমিশ্রা ভক্তি-পরিচিতি রাখিয়াছে তাহার তুলনা কম মিলে ঃ

(১) অবিরত প্রেম রতনফলবিতরণে
অখিল মনোরথপূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর॥
(২) গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি
ও-রূপ মাধুরী পিরিতি চাতুরী
তিল আধ পাশরিতে নারি॥

(৩) নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

কৃষ্ণরূপ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের অলংকারছন্দো-ধ্বনি-সুষমার পদ্যাংশ ঃ

নন্দনন্দন চন্দচন্দন
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

রাধারূপেও তাই।

এ ধনি না করু পসাহন আন।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিনরজনী নাহি জান।
সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
যো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি ॥

—'ধনি রাধা অন্য প্রসাধন করিও না। এই দেখিয়াই মধুসূদন এমন মুগ্ধ যে, দিন-রজনী-ভেদে তিনি অসমর্থ। ভুরু-মধ্যবর্তী সিন্দুরবিন্দু তরুণারুণের সৌন্দর্যমণ্ডিত, ললাটে ইন্দুদ্যুতি। সেই সূর্য-চন্দ্র, ঘনকেশান্ধকারের দ্বারা চুম্বিত। ইহা অতি অপূর্ব দৃশ্য।'

গোবিন্দদাসের সৌন্দর্য-সচেতন-মনের সৃষ্টি-রূপে এই পদ্যাংশচয় উদাহৃত হইবার যোগ্য।

পূর্বরাগের পদে রূপগোস্বামিকৃতবিদগ্ধমাধব নাটকে রাধা-পূর্বরাগের স্পর্শ

সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু-আখর
তৈখনে মনচুরি কেল।
না জানি কোন ঐছে মুরলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানি কোন উহ পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।

চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুনি সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর
পটে ভেল যো পরকাশ ॥

তুলনীয়ঃ একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ বিদগ্ধমাধব

—'একজনের কৃষ্ণ নামাক্ষর শ্রবণমাত্রই মতি লোপ হইয়াছে; অপর একজনের বংশীনিনাদ উন্মাদ দশা বিধান করিয়াছে; আর এক স্নিগ্ধ মেঘকান্তি একবার দেখামাত্র মনে চিত্রবৎ লগ্ন হইয়া আছে; এই কষ্ট ধিক—তিনজন পুরুষে প্রণয় অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।'

পদরচনাকর্মের গুরু বিদ্যাপতির 'জহাঁ জহাঁ পদযুগধরঈ' পদটির আদর্শে শিষ্য গোবিন্দদাসের বিখ্যাত কৃষ্ণ-পূর্বরাগ-বিষয়ক পদ, চিত্রধর্মে সুন্দর, মালা-নিদর্শনা-অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের শোভাযুক্ত :

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥

দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিন লহু রাই চিনই নাহি জান ॥

—যেখানে যেখানে শ্রীমতীর তনুদেহের দ্যুতি-প্রকাশন, সেখানে সেখানে বিজুলীর চমক, যেখানে যেখানে তাঁহার অরুণ-বর্ণ-চরণপাত সেখানে সেখানে স্থলকমলদলবিকাশ; সখি দেখ কে ধনী সঙ্গিনীমেলায় আমার জীবন সঙ্গে খেলা করিতেছে। যেখানে যেখানে তাঁহার ভঙ্গুরবিলোল ভ্রূ-ভঙ্গিমা সেখানে সেখানে

উদ্বেলিত কালিন্দীর তরঙ্গভঙ্গ ; যেখানে যেখানে তাঁহার তরল-দৃষ্টিপাত সেখানে সেখানে নীলোৎপলের পূর্ণতা ; যেখানে যেখানে তাঁহার হাস্যমাধুরী সেখানে সেখানে কুন্দ-কুমুদের প্রকাশ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন রাধা-রূপমুগ্ধ কৃষ্ণ রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না।

গোবিন্দদাসকবিরাজ-বিরচিত পদের চিত্রধর্মিতা ও বচন-রচন-চাতুরীর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তযুক্ত আর এক উদাহরণ ; পদটি কৃষ্ণ-পূর্বরাগের রাধা-রূপ ভণনে ঃ

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চার।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধল
রঙ্গিনি বঙ্ক নেহার।
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ সাধ নহি পূরল
পালটি না হেরলুঁ রাধা।
ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর
হাসি হাসি তহিপুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়াকুম্ভ ভরি
মুহরি রাখল কত বেরি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তাহি মিলন আন আন।
কাঠক পুতলি ঐছে মরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

শ্রীরাধার বদন বায়ু-ভরে উলটাইয়া-পড়া স্বর্ণ-পদ্ম। সর্বস্বহরণ করিয়া সেই রঙ্গিনী আবার বঙ্কনেহারণী হইতেছে। সখি, আমাকে কে বাধা দিল জানিনা, সাধ পূরণ করিয়া নয়ন ভরিয়া রাধাকে দেখিতে পারিলাম না। ঘন-মেঘরুচি বসনাঞ্চলের কাঁচলীতে কুচ-গিরি ঢাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহা তিনি দেখিলেন। নাকি, ঘন ঘন আঁচল খসাইয়া স-কঞ্চুলিকা কুচগিরির প্রতি হাসিয়া হাসিয়া দৃষ্টি দিয়া যেন আমার মন হরণ করিলেন ; রাখিলেন মুদ্রাঙ্কিত করিয়া কনক কলসীতে। যখন মন বাঁধা পড়িল তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গ্রামও তাহার সঙ্গে মিলিল। কাষ্ঠ পুত্তলীবৎ মূর্চ্ছিত হইলাম। প্রমাণ গোবিন্দদাস।

অভিসারপ্রস্তুতি, বিবিধ অভিসার, বিচিত্র অভিসারোচিত বসন-ভূষণানু-লেপন, অভিসারের ঋতু প্রকৃতি ইত্যাদি যথোচিত শব্দ-ছন্দো-গ্রন্থনে গোবিন্দদাস এমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে অভিসারের শ্রেষ্ঠ পদরচয়িতা-রূপে তাঁহাকে সকলেই স্বীকার করিবেন। এ স্থলে গোবিন্দদাস সংস্কৃতশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুবর্তী।

গোবিন্দদাস সম্পর্কে আরো বলিবার আছে।

ক) রূপে ভরলাদীঠি সোঙরি পরস মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পর সঙ্গ ॥

খ) হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজনগৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে বহু ভাগি ॥

গ) প্রেমক অংকুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা ॥

ঘ) শুনলহু মাথুর চলত মুরারি।
চলতহিঁ পেখলোঁ নয়ন পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহুঁ হেরি।
শূন্য মন্দিরে আয়ল ফেরি ॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরিতি জানায়ত অবঘন রোই ॥
যো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
যো যমুনাজল মলয় সমীর ॥
যো হিমকর হেরি লাগএ চংক।
কাহু বিনু জীবন কেবল কলংক ॥

ঙ) যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলিযাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥

ইত্যাদি অংশে কৃষ্ণানুরাগিনীর প্রেমগভীরতা ও আবেগ, বিরহবিবশার আর্তি ও ক্রন্দন গোবিন্দদাস যেভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা একান্ত হৃদয়-স্পর্শ-ক্ষম। অলংকরণ, শব্দচয়ন, ছন্দোগ্রন্থন, চিত্রকল্পবিধান ইত্যাদিতে তাঁহার বাক্‌প্রতিমার বহিরঙ্গে লোচন-রোচন-রূপ ও অন্তরঙ্গে আনন্দ-বেদনাঘন অনুভূতির সুষমা তাঁহাকে অলোকসামান্য গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। তিনি কেবল ভক্ত কিংবা কেবল কবি নহেন; তিনি ছিলেন ভক্ত-কবি।

প্রায় শতাব্দীকাল ব্যবধানে ব্যবহিত হইয়াও বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের নৈকট্য লক্ষণীয় হইয়া আছে। বিদ্যাপতি ছিলেন প্রথম জীবনে শৈব, গোবিন্দদাসের

প্রথমজীবন অতিবাহিত হয় শান্ত পরিবেশে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছেন। ভণিতা পদ না পাওয়া গেলে ভাষাসাম্যহেতু পদকর্তা বিদ্যাপতি কি গোবিন্দদাস—নির্ণয় কঠিন হইয়া উঠে। বিদ্যাপতির বিবিধ শাস্ত্রে, বিশেষ সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে বৈদুষ্য ছিল অগাধ। গোবিন্দদাসেরও বহু-শাস্ত্র-দর্শিতা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে বৈচক্ষণ্য সপ্রমাণ। মণ্ডনকলাসমৃদ্ধরচনায় উভয়েরই তাই আগ্রহ ও নৈপুণ্য। রাজসভার কবি বিদ্যাপতির পদসমূহে মার্জিত উজ্জ্বল তীক্ষ্ম নাগরিকত্বের প্রকাশ, প্রকাশ সৌন্দর্য সচেতনতার। বিদ্যাপতির পদে নায়িকা রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বেশ-ভূষা অলংকার-অনুলেপাদির সমুজ্জ্বল বর্ণনা। গোবিন্দদাসের রচনায়ও রূপবর্ণন, পূর্বরাগ, অভিসার-প্রভৃতি পদে নায়িকা রাধার বসনালংকরণাদি সহ দেহবর্ণনা সমুল্লেখ্য। বিদ্যাপতির কবিতা শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের আস্বাদন মাহাত্ম্যে ধন্য, গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বঞ্চিত বলিয়া কাতর। উভয়ের রচনায় বৈষ্ণবীয়-ভাবুকতার পরিমণ্ডল। এখানে উল্লেখ করিতে হয় বিদ্যাপতি ছিলেন চৈতন্যপূর্ববর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ পরবর্তী। পদরচনায় তাই বিদ্যাপতিতে গৌরপ্রভাব নাই; গৌর প্রভাবের বিদ্যমানতা গোবিন্দদাসে। রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তিযুক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে মানসক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়াই তাঁহার রাধা-চরিত্রের অংকন; সেইহেতু তাঁহার রাধাতে সৌন্দর্যের সঙ্গে ভাবসান্দ্রতার অন্বয় প্রকাশন। আমরা মনে করি শ্রবণলোভন শব্দ-ছন্দ-অলংকারাদির সহযোগে ললিত বাক্‌প্রতিমা-নির্মাণ ও চারু চিত্রকল্পবিধানে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসারী তো বটেই কোথাও কোথাও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তবে অন্তর্লীন আবেগ-বেদনার দ্যোতনায় গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতি-অতিক্রমণ স্বতঃই সহৃদয়-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

॥ চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস ॥

ক. চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে চণ্ডীদাস এক অতি প্রিয় পরিচিত নাম। রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদগুলিতে চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস দীনহীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভণিতা দৃষ্ট হওয়ায়, চণ্ডীদাস কয় জন, তিনি বাঁকুড়ার ছাতনার, না, বীরভূমের নান্নুরের, কে কোন্ কোন্ পদের রচয়িতা, চণ্ডীদাস-খ্যাতিতে সমাগ্রহী কোনো কবি চণ্ডীদাসের নামে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কী না, গায়কদল চণ্ডীদাস-পদ-প্রিয়তায় অন্য কোনো রচয়িতার পদকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া গান করিতেন কী না ইত্যাদি চণ্ডীদাস-সমস্যা। সেই সমস্যায় না গিয়া যে চণ্ডীদাসের পদ বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাহাকে যুগ যুগ কাল ধরিয়া আকুল করিয়া আসিতেছে, আমরা সেই চণ্ডীদাসের কথা আলোচনা করিব। তাঁহার প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী-আবির্ভূত ব্যক্তি তিনি। তিনি ছিলেন চৈতন্যপূর্ব যুগের এবং বিদ্যাপতি-সমকালের। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্র চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিরা গভীর আনন্দলাভ করিতেন।

চণ্ডীদাসপদাবলীকে বাল্যলীলা, পূর্বরাগ-অনুরাগ, মিলন, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, বিরহ বা মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়। চণ্ডীদাসের সমধিক কৃতিত্ব পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও মাথুর বিভাগে।

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে দুই ভাষারীতি—এক ব্রজবুলি, প্রবর্ত্তক—বিদ্যাপতি ; অন্যটি বাংলা,—প্রবর্ত্তক চণ্ডীদাস। বাঙ্গালীর মুখের ভাষা তাঁহার কবিতায় স্থান পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের ভাষায় অনলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য, মণ্ডন-বিরহিত মাধুর্য্য, অনাগরিক-সারল্য। 'সহজ সরল রচনাপ্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা' তাঁহার রচনাভঙ্গী সম্পর্কে যথাযথ উক্তি হইবে। বিদ্যাপতির রচনাশৈলীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের রচনাশৈলীর এইখানেই মৌল পার্থক্য। বিদ্যাপতির রচনায় নাগর কবির পাণ্ডিত্যের পরিচিতি পদে পদে পরিলক্ষিত, চণ্ডীদাসের রচনায় গ্রাম-জনপদের কবির অকৈতব স্বভাব-সুষমার মুদ্রাঙ্কন। বিদ্যাপতির রচনা-ভঙ্গীতে বিচিত্র আলোকের ঔজ্জ্বল্য, চণ্ডীদাসে চন্দ্রকরস্নিগ্ধতা ; বিদ্যাপতিতে সযত্নলালিত উদ্যানলতার নয়নবিলোভনী কান্তি, চণ্ডীদাসে অনায়াস-বিকশিত বনবল্লরীর অকৃত্রিম শোভা। চণ্ডীদাস-ব্যবহৃত ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলীর সহজচারুতা রচনাশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করিয়াছে।

রাজসভার কবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবের নায়িকা পার্বতীর লজ্জা, ভয়, আশা, আশংকা প্রভৃতিকে যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত করিয়াছিলেন

রাজসভার কবি বিদ্যাপতিও তেমনি তাঁহার নায়িকার হৃদয়-স্তরকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত বিকশিত করিয়া ধরিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথমে ও পরিণতিতে সমাবস্থা, প্রথম হইতে প্রেম-বিভোরা। পূর্বরাগের পদে রাধার সেইরূপ ঃ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনীপারা ॥

নাম-শ্রবণে নায়িকাচিত্তে পূর্বরাগ-সঞ্চার-সম্ভাবনা—ইহাই হইল নন্দনশাস্ত্রের রীতি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নাম শুনিয়াই আকুলা ঃ

সই কে সবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

এই পূর্বরাগবিষয়ক পদেই চণ্ডীদাস তাঁহার রাধার কৃষ্ণ-দর্শন-লালসার অধীরতা, উদ্বেগ ও ঘননিঃশ্বাসের সমুল্লেখে লিখিলেন ঃ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায় ॥

চণ্ডীদাস রাধা-পূর্বরাগের মতো কৃষ্ণপূর্বরাগও বলিয়াছেন, সেখানে কৃষ্ণনেত্রে উদ্ভাসিত রাধা-রূপের সংযম-পরিশীলিত প্রকাশ, কাব্যধর্মে রোম্যান্টিকতার অনির্দেশ্যতা। তখন দিবসের শেষভাগ। শ্রীমতী চলিয়াছেন পথে। রাধা দেখিলেন, চক্ষু জুড়াইলেন, কিন্তু এমনই রূপ-রহস্য যে চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না ঃ

বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইছে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥

সে-রূপ অধিক কাল নিরীক্ষণ করা চলে না, যেমন দেহ-দ্যুতি, তেমনি বসন-শোভা, তাঁহাকে বিস্মরণ সম্ভব নয়।

সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসনের শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥

তাঁহার রূপ-বর্ণন, রূপ-বর্ণন বলিলে কম বলা হয়, চিত্রাংকন ; —বাম-অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক মুদ্রা, বামহস্তে সোনার ঝাঁপি, সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু, নেত্রে নেত্রে অঞ্জনরেখা, নাসালংকারে মুক্তা। মনোমোহিনী নীলশাড়ী পরিধানে ; পবনোচ্ছ্বসিত বসনে অঙ্গ-পার্শ্ব হয় পরিদৃষ্ট। গিরিসম সুন্দর কুচযুগের উপমা সুবর্ণ কটোরা। তাঁহার তুঙ্গ স্তনযুগমকে বক্ষে ধরিয়া রাধা চলিয়াছেন ; গতিতে ধীর মন্থরতা ; কখনো দৃষ্টিতে সবিভ্রম চমক, লোকলজ্জায় অনেকক্ষণ নিবিড় করিয়া চাহিতে পারেন না। সব মিলিয়া সে ভঙ্গিমার উপমা নাই। শিবারাধনে ভাগ্যবানের এই ফল-প্রাপ্তি। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, এ মূর্তি রসিক-মর্মঘাতিনী নয় ; অনুমান হয় অমৃত-সঞ্জীবনী দিয়া এই মূর্তি-নির্মিত।

বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে
কনককটোরি হাতে।
সীঁথায় সিন্দুর নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে ॥
সুনীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোক-লাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা
চলন মন্থরগতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয়
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে ॥

এখানে রূপ আছে, কিন্তু উন্মাদক নয় ; এখানে ইন্দ্রিয়মূল দেহসৌন্দর্যচ্ছবি আছে, তবে তাহা বাসাবরণে সম্বৃত, বসনোচ্ছলনে যদি বা দেহ প্রকাশ আছে তবে তাহা অংশমাত্র। এখানে নবীনা নায়িকার ত্বরিত চরণের বিলাস-বিভ্রম-বিললিত ঘন-সঞ্চরণ নয়, এখানে আছে ভাবগভীরার ধীরালসপদের মন্দমন্থর গমনভঙ্গী ; সঙ্গে আছে সসম্ভ্রমনেত্রযুগ্মে রুচির-লজ্জিত-দৃষ্টিপাতের সুষমা। সব মিলিয়া চণ্ডীদাস-পদপটে পরিতৃপ্ত কৃষ্ণনেত্রে শ্রীমতী রাধার অমৃতময়ী মূর্তির অনুপম চিত্রাঙ্কন।

যে চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদেই কৃষ্ণময়ী রাধার অপূর্ব আলেখ্য আঁকিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভিসার ও রূপানুরাগের পদ যে তেমন ফুটিবে না তাহা বলা বাহুল্য। সব কাজ যে সেখানেই অবসিত করিয়াছেন কবি। তবু যখন শুনি ঃ

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

কিংবা রাধাঙ্গনে ঘোররাত্রির মেঘাড়ম্বরের মধ্যে সমাগত বর্ষণ-পরিষিক্ত কৃষ্ণের দর্শনে রাধা-ভণিতি ঃ

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

তখন চণ্ডীদাসের প্রেমবোধগভীরতা ও রাধার প্রেমাকুলতা উপমা-রহিত-রূপে প্রতীত হয়। খণ্ডিতা-বিষয়কপদে রাধার অভিমান ও রাধাচরিত্রে লৌকিক-নায়িকার স্বভাব-স্পর্শ রূপায়িত ঃ

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
... ...
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল সে
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥

আক্ষেপানুরাগ, মিলন, আত্মনিবেদন প্রভৃতিতে চণ্ডীদাসের সাফল্য সন্দেহ-বিরহিত। প্রেমের প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি, বংশীর প্রতি সকলেরই প্রতি রাধার আক্ষেপ।

১) কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥

২) অন্তরে অসার বাঁশী বাঁশী বাহিরে গরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল ॥

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥

৩) সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল॥

—প্রভৃতি অংশে অনুরাগমিশ্রিত আক্ষেপের ভাবাভিব্যক্তি চণ্ডীদাস-ভণনে সুষ্ঠু প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবমহাজনগানে রাধার সঙ্গে মথুরা-প্রয়াত কৃষ্ণের ভাববৃন্দাবনে মিলনের ছবি দৃষ্ট হয়; চৈতন্যপূর্ব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গানে মথুরা-প্রত্যাগত কৃষ্ণের সঙ্গে রাধামিলন চিত্রিত। চণ্ডীদাস-বিন্যস্ত মিলনের পদ সমগ্র-পদমালিকায় এক মহার্ঘ মণিরত্ন ঃ

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

সর্বশেষে রাধার আত্মনিবেদন প্রাণস্পর্শী করুণ মাধুর্যে বিলসিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রাধার আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিনিষ্ঠ নিবেদন ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। সে বিচারে চণ্ডীদাস-কবিতার গীতি-কাব্য-পদবীতে সার্থক সমুত্তরণ। চণ্ডীদাস রচিত 'আত্মনিবেদন' বিষয়ের এক পদ ঃ

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহমন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
... ...
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্যসম
তোহারি চরণখানি॥

খ. জ্ঞানদাস

চৈতন্যোত্তরকালের বৈষ্ণব কবিসমাজে জ্ঞানদাস অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি। বর্ধমান জেলায় কাঁদড়া-মাদরা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জ্ঞানদাসের আবির্ভাব। প্রভু নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাদেবীর নিকট তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ। 'ভক্তিরত্নাকরে' নরহরি চক্রবর্তী লিখিতেছেন—'আকুমার বৈরাগেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশে।' জ্ঞানদাসের খেতুরী মহোৎসবে অংশগ্রহণ তাঁহার জীবনের বিখ্যাত ঘটনা।

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সম্পাদিত 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী'-তে ৪৭৪টি অসন্দিগ্ধ ও ৩০টি সন্দিগ্ধ মোট ৫০৪টি পদের উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষর ও মাত্রাবৃত্তের পয়ার, ত্রিপদী জাতীয় ছন্দে তাঁহার পদাবলী প্রায়শঃ বাহিত হইয়াছে। জ্ঞানদাস সংস্কৃতছন্দের অনুকরণ করিয়াছেন এমন উদাহরণও দৃষ্ট হয়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার তাঁহার কাব্য শরীরের ভূষণ। জ্ঞানদাসের কাব্যভাষা ব্রজবুলি ও বাংলা হইলেও বাংলা-বাহিত পদেরই উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন, জ্ঞানদাস তেমন ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। ভাষার সারল্যে, অনায়াস-সিদ্ধ অলঙ্করণকার্যে, ভাব-গভীরতাদিতে চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের এতই সাধর্ম্য যে ভণিতা না দেখিলে পদ-পার্থক্য-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসও অনুরাগ পর্য্যায়ের পদ—পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদিতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। আরো উল্লেখ্য, উভয়ের রাধাচরিত্রে ভাবপ্রগাঢ়তার সমাবেশ। উভয়ের মধ্যে আত্মনিবেদন তথা আত্মসমর্পণের আনন্দ ও স্বস্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

জ্ঞানদাসের কবি-স্বভাব সম্পর্কে বলা চলে তাঁহার রোম্যান্টিক লিরিক স্বভাব কালোত্তীর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কল্পনার দূরযাত্রা, সৌন্দর্য্য ও রূপ-অভীপ্সা, স্বপ্নদর্শন, বিষাদবোধ, গভীর অনুভূতি, মাধুর্য্যবিমণ্ডিত পদ-রচনা-শৈলী ইত্যাদি তাঁহার মন্ময় গীতিকবি-স্বভাবের পরিচায়ন। চণ্ডীদাসের ভাবাদর্শকে গ্রহণ করিয়াও জ্ঞানদাস মৌলিক-প্রতিভার পরিচিতি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার কবি-স্বভাবে সময়-সীমা অতিক্রম করিয়া কবীন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে মধ্যযুগের কবি বলিয়া ভাবিতে বিস্মিত হইতে হয়।

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা, বাল্যলীলা, বয়ঃসন্ধি পূর্বরাগ, সখীশিক্ষা-নবোঢ়ামিলন, দান ও নৌকালীলা, রূপানুরাগ, অভিসার, মানবিভাগে বাসকসজ্জিতা-খণ্ডিতা-কলহান্তরিতা, বংশীশিক্ষা অনুরাগ-রসোদ্গার-আক্ষেপানুরাগ, মিলন ও রাগ, মাথুর ও ভাবসম্মিলন, আত্মনিবেদন ইত্যাদি পর্য্যায়ে জ্ঞানদাসের রচনাকে ভাগ করা যাইতে পারে।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরাঙ্গ-দর্শন বঞ্চিত জ্ঞানদাসের বিলাপ স্পষ্ট হইয়াছে।

সংকীর্তন রসে সব গৌর-গুণ গাই।
পড়ল সুখের সিন্ধু অবধি না পাই ॥
আকিঞ্চনে অধিক ভকতি রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল ॥

বলরামের নিত্যানন্দরূপে আবির্ভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রখ্যাত হইয়া আছে। জ্ঞানদাসের সেই বিষয়ে উল্লেখ:

পুরবে গোবরধন ধরল অনুজ যার
জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইল কীর্তন রঙ্গে
আনন্দে নিত্যানন্দ ধাম ॥

বাল্যলীলার পদে জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ ও রাধার বাল্যলীলোপজীব্য রচনা বর্তমান। তবে গোষ্ঠলীলায় বলরাম দাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক।

বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়ামিলন প্রভৃতির পদে জ্ঞানদাস কবিত্বের পরিচয় রাখিয়াছেন। এই এই পর্যায়ের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতি বিরচিত পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। বয়ঃসন্ধির পদে শ্রীমতী রাধার মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন জ্ঞানদাস:

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত ন হাসত মুখ মুচকাই ॥
এ সখি এ সখি পেখলু নারি।
হেরইতে হরখি রহল দুই চারি ॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উঘারি ॥

রাধা খেলিতে থাকেন কখনো, কখনো খেলেন না। কিন্তু লোক দেখিয়া হন লজ্জিতা। সহচরীমধ্যবর্তিনী রাধা কখনো দেখেন কৃষ্ণকে কখনো দেখেন না। কথা বলিলে কিছু শুনেন, কিছু শুনেন না। অধরে কখনো হাস্য, কখনো স্মিত রেখা। আমি, হে সখী সেই নারী দেখিলাম। সেও দুই-চারি যুগ যেন চাহিয়া রহিল। সে পরাবৃত্ত হইয়া আমাকে দেখিতে দেখিতে চলিল, মনে হইল পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে অমৃত উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে।

ইহার সঙ্গে বিদ্যাপতি-রচিত 'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ' পদটি মিলাইয়া পড়িবার মতো।

নৌকালীলার পদে জ্ঞানদাসের নিসর্গপ্রীতি, চিত্রণ-নৈপুণ্য সপ্রমাণ। নিম্নে কলকলিততরঙ্গা মানসগঙ্গা, উপর আকাশে অকস্মাৎ মেঘোদয়, পবনবেগের আতিশয্য। ভাষা বাংলা, ছন্দ ত্রিপদী:

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণি রাখিতে নারে কেউ॥

রাধার কৃষ্ণাভিসার-পদে রাধাচিত্রে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দরের লীলাকীর্তন-পর ছবির প্রতিভাস ঃ

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীলবসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীনা সুমেল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবন জয় জয় দিয়া॥

তুলনীয়া
সহচর অঙ্গে 'গৌর অঙ্গ' হেলাইয়া
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥

রাধাভিসারের অন্য এক পদে বর্ষা নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, একে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি তাহার উপর ঘন অন্ধকারের সমাহার। দশদিকেই দামিনীর দমক। শ্রীমতী নীলাম্বরীতে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চলিয়াছেন অভিসার কুঞ্জে ঃ

মেঘযামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনি দশদিক আপি।
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥

রোম্যাণ্টিক গীতিকবির নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি স্পৃহা বর্ষাভিসারের পদে রূপায়িত হইয়াছে।

অনুরাগ পর্যায়ের পদে জ্ঞানদাসের রোম্যাণ্টিক গীতি-কবিমনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রাধাভাবনার অন্তরালে কবি-অন্তরের নিভৃতভাবনাও স্থান করিয়া লয় ঃ

(ক) রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ॥

(খ) রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অংগলাগি কান্দে প্রতি অংগ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

(গ) দেইখ্যা আইলাম তারে
সই দেইখ্যা আইলাম তারে
এক অংগে এতরূপ নয়নে না ধরে॥

এ-হেন রচনা আধুনিক যুগের কবিলেখনীতে বুঝি দুর্লভ ঘটনা।

রোম্যাণ্টিকতার সঙ্গে স্বপ্নের এক নিবিড় যোগ থাকে। জ্ঞানদাস তাঁহার স্বপ্ন মিলনের পদে স্বপ্ন ও প্রকৃতিকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাঁহার রোম্যাণ্টিক অনুভূতির পরিচয় রাখিয়াছেন। একে শ্রাবণী রাত্রি, তাহার উপর ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন, রিমঝিম বর্ষা, কেকা-কুহুর মুখরতা, দাদুরী-ডাহুকী-ঝিঁঝিঁর মত্ত রব:

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুর বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিক বাজে ডাহুকী সে ঘন গাজে
স্বপন দেখিঁলু হেন কালে॥

জ্ঞানদাসের স্বপ্ন মিলনের পদের মতো আক্ষেপানুরাগের পদও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার প্রেমতন্ময়তা শরীরিনী হইয়া আছে। সেখানে রাধাহৃদয়ের বেদনাভিব্যক্তির সুষ্ঠু প্রকাশ:

(ক) পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
(খ) কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
শাশুড়ীর ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুর পণা সোঙরিয়া মরি॥

জ্ঞানদাস রচিত আক্ষেপানুরাগের আর এক অবিস্মরণীয় পদ এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে:

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিলুঁ
রহিতে নারিলুঁ ঘরে॥
কাম-সাগরে কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।

আপনি হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব
যখন যাইবা জলে ॥
মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বলে বুঝিবে তখন
পিরীতি বিষম জ্বালা ॥

আক্ষেপানুরাগিনী রাধার ভণিতি—'হে বন্ধু আমি আর অধিক কি বলিব। নিজেকে খাইয়া প্রেম করিয়াছিলাম, ঘরে রহিতে পারি নাই। আমি কাম-সমুদ্রে কামনা করিয়া মনের আশা সিদ্ধ করিব। নিজে নন্দনন্দন হইয়া তোমাকে রাধা করিব। প্রেম করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিব, কদম্ব-মূলে রহিব, যখন জল আনিতে যাইবে তখন মুরলীতে তান ধরিব। সহজ কুলবালা সেই মুরলী-শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিবে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তখনই প্রেমের বিষম জ্বালা অনুভব করিতে পারিবে।'

এ পদের অতুলনীয়তা সম্পর্কে সহৃদয় পাঠককে বলিবার কিছু নাই। শ্রীমতী রাধার কৃষ্ণ-প্রেমময়তা ও আর্তিকে অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া এই অল্পায়িত ত্রিপদী-ললিত পদটি আশ্চর্য্য-নিটোল-সৌন্দর্যে শোভমান।

রসোদ্গারের পদে কৃষ্ণপ্রেমগৌরবিনী বৃষভানুনন্দিনীর উক্তিতে রাধা-প্রেমবিভোর কৃষ্ণের চিত্র :

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥

জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ' বা বংশী-শিক্ষার পদ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই অংশে কর্মে-সংলাপে নাটকীয়তার স্পর্শ রাখিয়াছেন কবি। রাধা বংশীশিক্ষালাভের অনুরোধ রাখিয়াছেন কৃষ্ণ-সন্নিধানে। কৃষ্ণ বংশীতে তান তুলিয়াছেন, কিন্তু শ্যামনাম ধ্বনিত না হইয়া রাধানাম হইয়াছে ধ্বনিত। পুনরায় রাধা কথা বলিয়াছেন, রাধা কৃষ্ণ একত্র বাঁশী বাজাইয়াছেন। কৌতুক-গর্ভ পদরচন জ্ঞানদাসের :

ঘর হইতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজদাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥

কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান্।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিলে হে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম ওঠে॥

তখন কৃষ্ণ নিজনাম ধ্বনিত করিতে চাহিয়া বাঁশী বাজাইলেন। শ্যাম নাম বাজিল না, বাজিল রাধা নাম ঃ

নিজনাম শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা॥

কুতুকিনী চাতুর্য্যময়ী রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে একই সময়ে বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন। যেমন ইচ্ছা তেমনই কাজ ঃ

রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুক।
না জানি বেমনে বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥

বিরহ বেদনাকে জাগ্রত, উদ্দীপিত ও ঘনীভূত করিতে বর্ষার ক্ষমতা ভারতীয় কবিবৃন্দের নিকট সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকৃত। শ্রীমতী রাধার মাথুর-বিরহকে নববর্ষারপটভূমিতে সমর্পিত করিলেন জ্ঞানদাস ঃ

গগন ভরল নব বারিদ হে
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর ডাকে ডাহুকী সব
শবদে পরাণ হরি নেল॥

চৈতন্যোত্তর কবিগণের পদে মথুরা-গত কৃষ্ণের ব্রজ-প্রত্যাগমন নাই। বিরহোন্মাদিনী রাধা ভাবসম্মিলনে কৃষ্ণ-সঙ্গ-প্রাপ্তা। ভাবসম্মিলনের পদে বিষাদ ও বেদনাবোধ সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। মিলিতা না হইয়াও মিলিত ভাবনায় রাধার কৃষ্ণপ্রতি নিবেদনের করুণ-মাধুর্য্য বৈষ্ণবমহাজন পদের অমূল্য সম্পদ ঃ

শুন শুন হে পরাণ পিয়া
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে যে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলে তুমি॥

চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের সমভাবাত্মক-রচনার দু-একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :

চণ্ডীদাস	জ্ঞানদাস
(১) গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া। পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥ পুলক পূরয়ে অঙ্গ আঁখে নামে জল। তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥	(১) গুরুগরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥ পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।
(২) পিরীতিমিরীতি এ দুই বচন কে কহে পিরীতি ভাল। হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া জনম কাঁদিতে গেল॥	(২) সবাই বোলয়ে পিরীতি কাহিনী কে বলে পিরীতি ভাল। কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর ধসিয়া গেল॥
(৩) বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ। যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগৎমাঝে না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥	(৩) বন্ধু কহিলে বাসিবা দুখ। আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখে সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ।
(৪) বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব কুণ্ডল পরিব কানে। সভার আগে বিদায় হইয়া যাইব গহন বনে॥	(৪ গিরিয়া বসন বিভূতিভূষণ শঙ্খের কুণ্ডল পরি। যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি॥
(৫) সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া এমতি করিল যে। আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে॥	(৫) বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়। এ ধন আমার লয় অন্য জন ইহা কি পরাণে সয়॥ সই কত না রাখিব হিয়া আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ বন্ধুর হিয়া এমন করিলে না জানি সে জন কে। আমার পরাণ করিছে যেমন এমনি হউক সে॥
(৬) প্রভাত সময় কাককোলাহলি আহার বাঁটিয়া খায়॥ পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে উড়িয়া বসিল তায়॥	(৬) আজু পরভাতে কাক কলকলি আহার বাঁটিয়া খায়। বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে উড়িয়া বৈঠল ঠায়॥

বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীর ইতিহাসে যেমন বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস তেমনি চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস। চণ্ডীদাস নান্নুর বা ছাতনা যেখানের হউন বাশুলী-সেবক বলিয়া খ্যাত। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবার নিকট দীক্ষিত। চণ্ডীদাসের

পদ শ্রীমনমহাপ্রভু গৌরাঙ্গের আস্বাদনমাহাত্ম্যে পূত; জ্ঞানদাস গৌরাঙ্গ-দর্শন-বঞ্চিত বলিয়া ব্যথিত চিত্ত। বাংলা ভাষায় পদরচনাকর্মে চণ্ডীদাস পথিকৃৎ, জ্ঞানদাস ব্রজবুলিতে কিছু পদ রচনা করিলেও চণ্ডীদাসপ্রদর্শিত বাংলাতেই তাঁহার পদের বিকচ-বিকশিত রূপ। চণ্ডীদাস সরল-সহজভাষায় দিনদিন লোকব্যবহৃত শব্দসহযোগে বিরলালংকারে পদরচনা করিয়াছেন। কাব্যের বহিরঙ্গের মতো নায়িকাচিত্তেও সহজসারল্য। চণ্ডীদাস-রচিত পদসাহিত্যে গ্রাম-জনপদের গৃহাঙ্গনে মাধবী-বল্লরীবেষ্টিত তুলসীমঞ্চের পবিত্রতা; এক অকৈতব-অকৃত্রিম সুষমার বিস্তার। জ্ঞানদাসে তাহার অনুসৃতি প্রয়াস। চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলিয়া তাঁহার রচনায় চৈতন্য প্রভাব নাই, কিন্তু চৈতন্য চন্দ্রের আগমনী-গীতি ধ্বনিত; জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর বলিয়া রচনায় চৈতন্যপ্রভাব স্বতঃই প্রতি-ফলিত। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের গীতি-সর্জনায় যে মূলসুরের ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তাহা হইল তন্ময়-আত্মলীনতা। যেমন চণ্ডীদাসে তেমনি জ্ঞানদাসেও রাধার গভীর আত্মলীন সৌন্দর্য ও তন্ময় প্রেমানুভূতি; চণ্ডীদাসে মিলনে অতৃপ্তিবোধের প্রাধান্য, জ্ঞানদাসে মিলনচিত্র থাকিলেও তাহা অতৃপ্তি জড়িত বলিয়া সেখানে স্বপ্নসংযোগের অভিলাষ। এখানে উল্লেখ করিতে হয়, ভাবাদর্শ ও রচনাশৈলী বিচারে জ্ঞানদাসের চণ্ডীদাসানুসরণ ও সাযুজ্য লক্ষিত হইলেও রোম্যাণ্টিক-ভাব-ভাবনায় জ্ঞানদাস আপন প্রতিভার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য সহৃদয়-পাঠক-চিত্তে রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যধর্ম ও নানা কথা

[লিরিসিজম্-রোম্যাণ্টিসিজম্-নাটকীয়তা-মিষ্টিসিজম্-লীলাশুক-বৈষ্ণব-কাব্যে পৃথিবী-স্বর্গে সমাহার-লৌকিকআবেদন-রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরীর' : 'বৈষ্ণব কবিতা'—বৈষ্ণবকাব্যে সমাজ সচেতনতা।]

লিরিসিজম্ বা গীতিকাব্যত্ব

বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীর গীতিকাব্যধর্ম নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত। কাব্য-বিভাগে ইংরাজীতে যাহাকে 'লিরিক' বলা হয়, বাংলায় তাহার সম্ভাব্য-আখ্যা গীতিকাব্য। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই, ইহা শ্রব্য কাব্যেরই অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গীতিকাব্য প্রবন্ধের একস্থলে লিখিলেন 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বক্তব্যকে স্ফুটতর করিয়া লিখিলেন—'যখন হৃদয় কোনো বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক কি ভয় কি যাহাই হউক তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয়; কতকটা ব্যক্ত হয় কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা

ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী।'

পরিমিত আয়তন, সুললিত শব্দচয়ন, সুরমূর্চ্ছনাময় ছন্দোবন্ধন, কবির ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতনা (Subjectivity), তীব্র ভাবানুভূতি রোম্যাণ্টিকতা ইত্যাদি লিরিক বা গীতিকাব্য-সুলভ গুণ। সত্যই নাটক মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে গীতি-কাব্য একেবারে স্বতন্ত্র। জীবন-প্রয়োজনবোধ-সঞ্জাত বস্তু নির্ভরতা এখানে থাকে না, এখানে থাকে মন্ময়ভাবনাময় একটি কবিচিত্তের স্পর্শকাতর মর্মলোকচারণা। এখানে থাকে না বস্তুলীনচেতনা, থাকে সৌন্দর্য্যাতুরতাময় রোম্যাণ্টিক কবিচিত্তের আনন্দবেদনাঘন অভিব্যক্তি।

আয়তন-বিচারে বৈষ্ণবমহাজনপদ দীর্ঘায়ত তো নয়ই, পরন্তু পরিমিতি-সুন্দর। অল্পায়তনের মধ্যে পদগুলি ভাব-বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ। নিটোল হীরক খণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়। বৈষ্ণবমহাজনগণ অনেকেই সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন, অনেকেই সংস্কৃতকাব্য-বিধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই কি শব্দচয়নে কি ছন্দোবন্ধনে তাঁহারা যে লালিত্য ও শ্রবণমাধুর্য্য বিধান করিতে পারিয়াছেন তাহা তুলনা-রহিত- বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ইহাদের সঙ্গে মিলিয়াছে অলঙ্করণ-নৈপুণ্য। অলঙ্কার-চারু, ললিত-শব্দ-সমন্বিত শ্রুতিসুখকর ছন্দোবন্ধ যুক্ত পদের দুই একটি উদাহৃতি এখানে রহিল।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে গোবিন্দ দাস ঃ

নীরদনয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥

রাধা-রূপ-বর্ণনায় জগদানন্দ ঃ

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপশব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল-রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়নী
খঞ্জনগতিহারী ॥

মাথুর-বর্ষা-বর্ণনে বিদ্যাপতি ঃ

ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥

রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র লীলাকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবমহাজনবৃন্দ কবিতা রচনা করিলেও তাঁহারা ছিলেন লীলাশুক, বিশেষ চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যপরবর্তি-কবি সমাজ। তাঁহারা কখনো সখা, কখনো সখী। তাঁহাদের চিত্ত রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস-লীন। কবির ব্যক্তিজীবনে-অনুভূত প্রেম পর্যায়ের বিচিত্র অবস্থা রাধা-কৃষ্ণ-কথা-মুখে বিলসিত হইবার সম্ভাবনাকে দূরে পরিহার করা যায় না। যাযাবর রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় লিখিলেন স যৎ-স্বভাবঃ কবিঃ তৎস্বভাবঃ কাব্যম্। কবিস্বভাবের তথা অনুভূতির পরিচিতি তাঁহার কাব্যেই বর্তমান থাকে। বিদগ্ধ কবিসমালোচক ড. সুশীল কুমার দের উক্তি এখানে উৎকলিত করি 'কবির রাধা শুধু কল্পলোকের কল্পনারূপিনী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তবলক্ষ্মী।' ড. দে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিলেও বৈষ্ণবমহাজনগণ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইহা ব্যতীতও কবির ব্যক্তি জীবন ধরা পড়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক ও প্রার্থনা বিভাগের পদগুলিতে। গৌরদর্শনবঞ্চিত পদকারবৃন্দ যখন লিখেন ঃ

(ক) তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥
(খ) যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥
(গ) অকিঞ্চনে অধিক ভকতি-রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল ॥
(ঘ) পরমানন্দের সনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে ॥

—তখন বৈষ্ণব পদাবলীর Subjectivity বা ব্যক্তিনিষ্ঠতা-সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রার্থনা-বিভাগের পদে বৈষ্ণব মহাজনগণ যে, জীবনপ্রয়োজন বোধ-সঞ্জাত বস্তুনির্ভরতার উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন, পেঁৗছিয়াছিলেন মন্ময়ভাবনাময় অনুভূতিলোকে তাহাও সন্দেহাতীত। বিদ্যাপতি-ভণিত 'প্রার্থনা' পদ এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ঃ

(ক) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ।

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

(খ) তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম
সুত মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি-মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হাম পরিনাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥

তীব্র ভাবানুভূতির প্রকাশ আছে এমন পদ বৈষ্ণবমহাজনসাহিত্যে সংখ্যায় অনেক। যেমন মাথুর পদে চণ্ডীদাসের রাধা একস্থলে বলিতেছেন :

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের রাধা-উক্তি :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥

মাথুর পদে বিদ্যাপতির রাধা-বিলাপ :

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি ॥

[রোম্যাণ্টিসিজম্]

রোম্যাণ্টিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। তবে রোম্যাণ্টিকতার সঙ্গে নিসর্গ প্রকৃতি, সৌন্দর্যলোক ও কল্পনার দূরযাত্রা বিষাদ ও বেদনা প্রভৃতির যোগ একান্ত নিবিড়। বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত শিশির, বসন্ত-ক্রমে ষড় ঋতুর সাড়ম্বর আবির্ভাব। যমুনা পুলিনের বৃন্দারণ্যের মোহন

পরিবেশে নিসর্গ-প্রকৃতির সলীল-বিলসন কবি-চিত্তকে পুলকাকুল করিয়াছে, করিয়াছে সৌন্দর্যজগতের দূরাভিসারী। সেখানে পরভৃতবিরুত এবং বারিবাহ-ধ্বনিত,—সৌরভ-মন্থর সমীরসঞ্চার ও চকিত চপলার মেঘ-সঙ্গ-বিহার, চৈত্রের গত-ঘনা যামিনী ও পৌষের শীত-সমীরা শর্বরী বিরহ-বেদনাকে সন্দীপিত করে।

জ্ঞানদাসের রাধা-নেত্রে শ্যাম-তনুতে রূপের অনন্ত সঞ্চয়। রাধা-মুখে রোম্যান্টিক কবিচিত্তের সৌন্দর্যতৃপ্তির স্বীকৃতি ঃ

দেইখ্যা আইলাম তারে—
সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এতরূপ নয়ানে না ধরে ॥

পূর্বরাগের পদে এই জ্ঞানদাসের রাধাই রূপের সমুদ্রে আঁখি ডুবিবার, যৌবনের অরণ্যে মন হারাইবার, ঘরে ফিরিতে পথ অফুরান হইবার, হৃদয়ের আকুল করিবার অনুপম প্রকাশ রাখিয়াছেন ঃ

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥

রোম্যান্টিকতার সঙ্গে স্বপ্নসংযোগ বর্তমান। বৈষ্ণব মহাজন পদে বহু বহু স্বপ্ন-সংশ্লিষ্ট পদের মধ্যে শ্রীমতী রাধার রসোদ্গার-বিষয়ে চণ্ডীদাস বিন্যস্ত ত্রিপদীসংবলিত এক মধুর পদের অংশ ঃ

পরাণবন্ধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসায় বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে ॥
… … …
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুংকুম কস্তুরীপারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা ॥

আনন্দ-বেদনার যুগপৎ-সঞ্চারণা বৈষ্ণবপদাবলী-লীন রোম্যান্টিকতার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। কবি চণ্ডীদাস ঃ

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥

[নাটকীয়তা]

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি, স্থান পরিবর্তন, action বা কার্য্য ইত্যাদি নাটকীয়তার ইঙ্গিত দেয়। অভিসার, বংশীশিক্ষা প্রভৃতি পর্য্যায়ে সেই নাটকীয়তা প্রতীত হয়। মনীষী ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য। 'বৈষ্ণবকাব্যে রাধাকৃষ্ণ থাকায় এবং তাহাদের ভাববিনিময় ও উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকায় বাহ্যলক্ষণে তাহা হয় তো গীতি-নাট্য।'

[মিষ্টিসিজম্]

মিষ্টিসিজম্ কথাটি আধুনিক সাহিত্যালোচনার ধারায় এক প্রচলিত শব্দ। ইহার অর্থ দুর্জ্ঞেয়তা। ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রে এই মিষ্টিসিজমের অনুরূপ কথা বোধ হয় নাই। দুর্জ্ঞেয়তার সঙ্গে অস্পষ্টতার যোগ যে ঘনসন্নিবিষ্ট তাহা বলা-বাহুল্য। অস্পষ্টতার কুহেলী থাকে বলিয়াই রহস্যের উন্মোচন কঠিন হইয়া দেখা দেয়। অথচ আকর্ষণ হয় দুর্নিবার। তীব্র অনুভূতি-শক্তি বা প্রখর বোধিদৃষ্টি (Intution)-র সাহায্যে এই দুর্জ্ঞেয়তার অবসান ঘটে। কবি-সাধক-দার্শনিক সেই অনুভূতির বা বোধিদৃষ্টির সাহায্যে সীমার অতীতলোকে যাইতে পারেন। তাঁহাদের নিকট বাহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। অনুভূতিপ্রবলা বোধিদৃষ্টির আলোক দুর্জ্ঞেয়তার অন্ধকারকে অপসারিত করিতে সমর্থ হয়। ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনায় মিষ্টিসিজম্ লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীতেও তাহার স্পর্শ। তিনি পুরুষ নন, আমি রমনী নই, দুইএর মনে মনোভব বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

না সে রমণ না হাম রমনী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥

কিংবা, পার্থিব প্রেম কামবাসিত হইবে জানাকথা, তবু

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।

লক্ষ লক্ষ যুগ প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে রাখিয়াও অতৃপ্তি ঃ

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয় জুড়ন না গেল।

—ইত্যাদি মিষ্টিক কবি চিত্তের অসাধারণ-সর্জনা।

[লীলাশুক]

বৈষ্ণব মহাজনমাত্রই কৃষ্ণলীলাশুকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন-মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রিয়গ্রন্থ 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা বিল্বমঙ্গলকে মনে পড়িবে। সংসার জীবনে তাঁহার নাম ছিল মাধবানল। দাক্ষিণাত্য ভূ-প্রদেশে কৃষ্ণবেন্বা নদীর পশ্চিমতীরবাসী এই কবি কৃষ্ণলীলাকে উপজীব্য করিয়া মধুময়বচনসন্দোহে এক কাব্য রচনা করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে এই গ্রন্থ আনয়ন করিয়া, রাধাকথাসম্বলিত কৃষ্ণলীলোপজীব্য এই গ্রন্থে কিরূপ আগ্রহশীল ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনী হইতে জানা যায়। বিল্বমঙ্গল মহাকবি গিরিশ ঘোষের কৃপা-কল্যাণে বাঙ্গালীর প্রিয়-পরিচিত নাম। বিল্বমঙ্গলরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপমা ব্রজবিপিনের কৃষ্ণকুঞ্জতরুশাখাশ্রয় শুকবিহগের কণ্ঠনিঃসৃত শ্রবণ-সুখদ কাকলী-স্বর-লহরী। একে রাধাকৃষ্ণ কথা, তাহার উপর মোহন মঞ্জুলভঙ্গী। সব মিলিয়া অনুপম, অমৃতসমান।' বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণলীলাশুক নামে হন আখ্যাত। অপার্থিব বৃন্দাবনধামের কুঞ্জকাননোপান্তে বসিয়া সারীশুকের মতো সকল বৈষ্ণবমহাজনের রাধা-কৃষ্ণ-পক্ষপাতিনী গীতাবলী তথা পদাবলী। বৈষ্ণবমহাজনগণ নিজেদেরকে অলৌকিক ব্রজলীলার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা কখনো সখা, কখনো সখী। তাঁহারা মধুর কল-কলিত-সুরের রাধাকৃষ্ণকথার গানের পাখী লীলাশুক। অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাহৃতি যথাযথই—'সঠিক করিয়া পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবনলীলাকে অদূরের কদম্ববৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাদন এবং শুকের ন্যায় মধুর কাব্য-কাকলীতে তাহারই মাধুর্য্য-বর্ণন।'

বৈষ্ণবকবিতায় পৃথিবী-স্বর্গের সমাহার

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণের মতে বৈষ্ণবকবিতা বৈষ্ণবতত্ত্বের রসমূর্তি। বৈষ্ণব-তত্ত্বমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। রাধা-চন্দ্রাবলী-ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি ভগবান কৃষ্ণের আনন্দাংশের মানবীরূপ। রাধা হ্লাদিনীর সার বা পূর্ণ-প্রকাশ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দাংশ-সৃষ্ট জীবের প্রতীক-স্বরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে অপ্রাকৃতবৃন্দাবনে লীলারত। ভগবান কৃষ্ণ যখন নিজ আনন্দিনীশক্তির সাহায্যে নিজেকে আস্বাদন করেন তখন কামের কোনো কথা আসিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা গৌরাঙ্গ-চৈতন্যের জীবনে শরীরিণী হইয়া দেখা দিয়াছিল। চৈতন্য ছিলেন 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত'। তাঁহার জীবনে রাধা-বিরহ-ব্যথা হইয়াছিল প্রমূর্ত। বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর উপর চৈতন্যের প্রভাব অসীম। তাই বৈষ্ণবপদাবলী-ধৃত প্রেমকথাকে সাধারণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

[লৌকিক আবেদন]

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা বর্ণিত হইলেও সেখানে ধূলি-ধূসর-ধরিত্রীর যোগ নিবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী-বর্ণিত বয়ঃসন্ধি,

পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতি আমাদের এই মর্ত্য-মৃত্তিকার মানব-মানবীর বিচিত্র প্রেম-পর্য্যায়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে মর্ত্য-প্রাপ্ত কামনা-বাসনার প্রকটমানতার সঙ্গে দেহ, ইন্দ্রিয়মূল নিতম্ব-কটি-নাভি-স্তন-বাহুমূল-পার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গের বর্ণনা আছে, বেশ-ভূষা-অলংকারের উল্লেখ আছে, আছে প্রেম-প্রকাশে নায়ক-নায়িকার ছলা-কলা-প্রদর্শন, আছে লোক-সমাজের বিচিত্র রীতি-নীতি, কথাবার্তা, আচার-আচরণের বিবৃতি। প্রাচীন সাহিত্যে 'শকুন্তলা'-প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথের ভাষা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কবি মর্তের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই।' এখানে আশা-আশঙ্কা, হাস্য-ক্রন্দন, হর্ষ-বিষাদের আলো ছায়ার খেলা। কবি-রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্যে 'বৈষ্ণব কবিতায়, বৈষ্ণবপদাবলীবিধৃত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতারাজির সঙ্গে মানবসংযোগ ও মানবীয় উৎসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া লিখিলেন ঃ

['সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা']

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ-মিলন
বৃন্দাবন গাথা এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে-সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার।

রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে 'যিনি বাহির ভুবনে ও কায়াসৌন্দর্যে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই আবার গানের আড়ালে ও ছায়াসৌন্দর্য্যে কল্পনারূপিনী হইয়া ধরা দিয়াছেন' পদাবলীর পদে পদে। তাই তাঁহার প্রশ্ন ঃ

সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে!
বিজনবসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধসাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে?

বৈষ্ণবকাব্য-বর্ণিত প্রেম-ভাবনার যোগ এই পৃথিবীর মৃত্তিকায় আছে ধরিয়া লইয়া রবি-কবির সিদ্ধান্ত ঃ

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে-প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণবমহাজনগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বাস্তবানুগ বর্ণনা ধরিয়া দিয়াছেন সেই বর্ণনার ধারায় বৈষ্ণবকবিতাকে ধরণীস্পর্শরহিতা ভাবা সম্ভব নয়। পুষ্প যেমন বৃন্তহীন হইয়া বিকশিত হইতে পারে না বৈষ্ণবকবিতাও তেমনি পৃথিবী-সংগ-অসম্পৃক্ত হইয়া কায়া পরিগ্রহ করিতে পারে না। যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ইহার পরেও কথা আছে। বৈষ্ণবকবিতা তাহার সহৃদয় পাঠকের অন্তরের অনুভূতিতে অলৌকিক রসস্বরূপ পরমপুরুষকে আনিয়া দেয়। লৌকিকপথ-বর্তিনী বৈষ্ণব-কবিতা অলৌকিকী রসানুভূতি সঞ্চার করিয়া পাঠককে অন্যজগতে লইয়া যায়। বৈষ্ণবমহাজনপদে মানবিক আধারে রচিত রাধাকৃষ্ণপ্রেম চির নূতন :

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু — রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম — রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল — শ্রবণ হি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী — রভসে গোঁয়াইলু
না বুঝলু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ — হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥

প্রার্থনার পদে বৈষ্ণবকবিতার লৌকিকভাবমুক্তি পরিলক্ষিত হয় :

কিয়ে মানুষ পশু — পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ।
করম বিপাকে — গতাগতি পুনপুনঃ
মতিরহু তুয়া পরসংগ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি — অতিশয়কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব — করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

তাই বৈষ্ণবপদাবলী কেবল পৃথিবী বা কেবল স্বর্গ নয়, পৃথিবী-স্বর্গের সমাহার। ধূলি-মলিন ধরনীর গৃহে অবতীর্ণ প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যের তনুমনে ছিল স্বর্গ-সৌরভের পবিত্র সঞ্চার। এই প্রসঙ্গে এই উক্তি যথার্থ মনে হয় 'কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য চৈতন্যদেবই তাহার প্রমাণ।' এই সম্পর্কে বিদগ্ধ-ভণিতি স্মরণীয়—'বৈষ্ণবকবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে, দুই দিকে তটভূমি, মহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে: দুইধারে ফল-ফুল সমন্বিত তরুলতা, জনকোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহানায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগকূজিত জন-কোলাহল মুখরিত, উদ্যান-সংকুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।'

বৈষ্ণবমহাজন পদাবলীতে সমাজসচেতনতা

বৈষ্ণবপদাবলী কমনীয় কল্পনার নন্দনকানন হইলেও কবিগণের সমাজচেতন-মন বিভিন্ন পদে ধরা পড়িয়াছে। সমাজ প্রচলিত লোকবিশ্বাস, বিচিত্র সাজ-সজ্জা, ভোজনবিলাস, গীত-নৃত্য-বাদ্য প্রভৃতি নানা অবসরে রূপায়িত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সুখের ঘর ভাঁগিয়া যাইবে ইহা বিষ্ণুপ্রিয়া নানা নিমিত্ত-দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গৌর-সন্ন্যাসের পূর্বাভাস বিষয়ক এক পদে বাসুঘোষ বিষ্ণুপ্রিয়ামুখে শচীর উদ্দেশ্যে জানাইতেছেন:

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমংগল কাঁপিছে পরাণী ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিতে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডাহিন আঁখি।
দক্ষিণে ভুজংগ যেন রহি রহি দেখি ॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥

নারীদেহ-হইতে ভূষণ-পতন, দক্ষিণনেত্র কম্পন, দক্ষিণে সর্পদর্শন ইত্যাদি লোকবিশ্বাস মতে অশুভ-ফল-দায়ক।

সমাজে কপাল-গণক কপাল-দর্শনে শুভাশুভ বলিতেন। নারীগণের দক্ষিণাঙ্গ-স্পন্দন যেমন অশুভ-সূচক তেমনি বামাঙ্গ-স্পন্দন শুভ-সূচক। কাকের বিচিত্ররব বিচিত্রফলনির্দেশন বলিয়াও সমাজের ধারণা—যেমন বর্তমানকালে

তেমনি অতীতেও। অন্যান্য দিনে কাক রাধা প্রদত্ত অন্ন খাইয়া চলিয়া যাইত, মথুরা হইতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-প্রত্যাবর্তন-বার্তা জানাইত না। কিন্তু আজই কেবল কৃষ্ণ-বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া রাধা-সন্নিধানে উড়িয়া আসিয়া বসিল। আরো আছে চর্বিত তাম্বুল, দেবমস্তকারোপিত পুষ্প শুভ সূচক হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, চিকুর হইয়াছে স্ফুরিত, বক্ষের হারলতা হইয়াছে আন্দোলিত। কবি চণ্ডীদাস—পদ ভাবোল্লাসের। রাধা সখীসম্বোধে বলিতেছেন:

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময় কাককোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুলে খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল॥

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে লোকবিশ্বাস প্রাচীনকাল-বাহিত। জ্ঞানদাসের পদে কাকের রব, কপালগণনা, স্বপ্নদর্শন ও রাশিচক্রবিচার প্রভৃতি রূপ পায়।

পদ ভাবোল্লাসের—

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম শোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল ঠায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালি কহিয়া গেল॥
সুচারুচন্দন দেখিলুঁ স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি॥

গণক আনিয়া পুণ গণাইলু*
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে ॥
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানুসুত শিখি সে দ্বিতীয়ে
বৈসয়ে দেখি বিচারু ॥
দেয়াসিনী আনি দেব আরাধলু*
পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলু*
কোলে মিলাওল কুল ॥

শারীর-লক্ষণ দেখিয়া শুভাশুভ-নির্ণয়রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। রাধা-জননী কীর্তিদার নিকট কোনো প্রতিবেশিনী রাধা-শরীরে শুভত্ব দেখিয়া বলিয়াছে, রাধা মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে, উদ্ধার করিবে পিতৃ-বংশ। কবি জ্ঞানদাস লিখিতেছেন :

স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে
সোঙারিবা যদি জীবে ॥
দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ
ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে শুন্যাছি কমলা
ইহার অংশের অংশ ॥

বিচিত্র বসন—কখনো মেঘরুচি, কখনো শুভ্র, কখনো নীল। বিভিন্ন ভূষণ—সীমন্ত, কর্ণ, গ্রীবা, বক্ষ, নিতম্ব, কর, চরণ-প্রভৃতির। নানা প্রসাধন—কালাগুরু, মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দন, কজ্জল ইত্যাদি। পুষ্প সজ্জাতো আছেই। বৈষ্ণবমহাজনপদাবলীতে বিভিন্ন অবসরে বিশেষ অভিসারে ইহাদের কতো কতো পরিচয়ই না রাখিয়াছেন পদকার সম্প্রদায় :

১) নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি (জ্ঞানদাস)
২) বারি কি বারই নীল নিচোল (গোবিন্দদাস)
৩) চন্দ্রে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর (চণ্ডীদাস)
৪) ধবল বিভূষণ অম্বর বনই (গোবিন্দদাস)
৫) তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘনবিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা। (রায়শেখর)

বক্ষোবসন, প্রসাধন, পুষ্প ও অলঙ্কারের উদাহরণ যথা :

১) তনু পসেবে পহাসনি ভাসনি
পুলক তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু ॥ (বিদ্যাপতি)

২) তঁহি পুন মতিহার তোড়ী ফেকল
কহত হার টুটি গেল (বিদ্যাপতি)

৩) মঞ্জীর চীর হিঁ ঝাঁপি। (গোবিন্দদাস)

৪) পরিহরি মৌক্তিক মালতি মাল। তেজল মণিময় গীমক হার ॥
(গোবিন্দদাস)

৫) কুন্দকুসুমে ভরি কবরিকভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
(গোবিন্দদাস)

৬) অলক তিলক না কর রাধে। অঙ্গে বিলেপন করহি বাধে ॥
(বিদ্যাপতি)

৭) চিরুণি করে ধরি কেশবেশ করি সিঁথায়ে দেই সিন্দুর।
(রায়শেখর)

জ্ঞানদাস, কবিশেখর প্রভৃতির পদে যে বিচিত্র খাদ্যবস্তু, মোদক-মিষ্টান্ন, অন্ন-ব্যঞ্জন, তাম্বুল-কর্পূর ইত্যাদির উল্লেখ আছে তাহা তদানীন্তনকালের বঙ্গদেশীয় বলিয়া ভাবিতে হইবে।

১) এ ক্ষীর মোদক চীনি কদলক
কে তোর আঁচলে দিল। (জ্ঞানদাস)

২) তাম্বুল কর্পূর থপুরে পুন রাথয়ে
বাসিত বারি সমীপ। (জ্ঞানদাস)

৩) কর্পূর মালতি করল যুবতি
মনোলোভা মনোহরা।
কণ্ডলা কদম্বা রেউড়ি পদুমা
মতিচুর সুমধুরা ॥ (কবিশেখর)

বিবিধ নৃত্যকলা-বিশেষ রাসনৃত্য—

(১) চাঁদবদনী নাচত দেখি।
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জরীর ॥

(২) শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে।
না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই।

বিবিধ বাদ্যযন্ত্র—বীণা, মৃদঙ্গ, সপ্তস্বরা, কপিনাস, তম্বুরা, পিনাক, মন্দিরা-ইত্যাদির ব্যবহার সমাজে প্রচলিত ছিল।

এই সব বাদ দিলেও,

(১) কপোত পাখীরে চাকিতে বাটুল বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয়॥ (চণ্ডীদাস)

(২) গুরুজন জ্বালা জলের শিয়ালা পড়শী জিয়ল মাছ।
(চণ্ডীদাস)

(৩) কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া ওঠে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে॥
(জ্ঞানদাস)

(৪) চোরের রমনী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥ (জ্ঞানদাস)

(৫) কুমারের চাক যেন ঘুরণি উঠিছে হেন দেখি সভে হইল বিমনা॥
(যদুনাথ দাস)

উৎকলিত পদ্যাংশগুলিতে সমাজচিত্র আভাসিত হইয়াছে। 'সতীকুলবতী 'কুলবতী নারী' 'কুলকলঙ্কিনী' 'পতিগুরুজন' 'কুলের বৈরী', 'ননদি দারুণ', 'ননদি কাঁটা,' 'ঘর মোর বাদী শাশুরী ননদী' 'মিছা অপবাদ' 'পড়শী জিয়ল মাছ,' 'হাটে মাঠে বাটে কুলটা খেয়াতি' ইত্যাদি কথার মধ্যে সমাজ ও পরিবার চেতনা প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্য্যায় ঃ শাক্তপদাবলী

॥ বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়াগানে রামপ্রসাদ ॥

শাক্তপদাবলীর সুরতরঙ্গিনী সুরতরঙ্গিনী-জাহ্নবীর মতোই মধুরা ও প্রবলা। কবিরামপ্রসাদ সেনকে তাহার ভগীরথ বলিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। রামপ্রসাদের পূর্বেও শাক্তগীতি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু শাক্তগীতি আজ যে যুগ জয়ী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাহাতে রামপ্রসাদের দান অসাধারণ। তাই শাক্তগীতি সাধারণ্যে প্রসাদী সংগীত বলিয়াও পরিচিতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর সেদিনের অবসিতপ্রায় উদ্দীপনায় ও মোহঘোরসুপ্তিতে এই শক্তিগীতাবলী যে একদা শক্তি বিধায়নী সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল তাহা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সপ্রমাণ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে ভূমিকা শাক্তপদাবলী সাহিত্যে রামপ্রসাদের সেই ভূমিকা। রাধাকৃষ্ণগান গাহিয়া চণ্ডীদাস যেমন বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া ভাবাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, শক্তিদেবতা শ্যামা দুর্গার গান গাহিয়া রামপ্রসাদ তেমনি বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া ভাবাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের হালিশহর নিকটস্থ কুমারহট্ট গ্রামের সন্তান রামপ্রসাদ সেন যেন পুরুষানুক্রমে এই শক্তি বিষয়ক রচনার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। পিতামহ রামেশ্বর ছিলেন 'দেবীপুত্র' বলিয়া কথিত। পিতা রাম রাম সেনের প্রতি সর্বদা সদয়া ছিলেন অভয়া। আর স্বয়ং জগজ্জননী কন্যা রূপে রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিবার কাজে লাগিয়া তাঁহাকে যে ধন্যাতিধন্য কৃত কৃতার্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

রামপ্রসাদ সাধক। রামপ্রসাদ গৃহী। রামপ্রসাদ কবি। তাঁহার সাধনাব্রত ছিল, ছিল স্ত্রীপুত্র কন্যার স্নেহমমতার সংসার পরিবেশ, ছিল কবিভাবুকের কল্পনাও সৃষ্টি ক্ষমতা। সব মিলিয়া অতি সৌন্দর্যের মহাফল দিব্যভাব, সুখ দুঃখময় বাস্তব জগতের করুণ মধুর অনুভূতি ও সর্বত্যাগব্রতী আত্মনিবেদন তাঁহার রচিত পদনিচয়ে গীতিকবিতার পূর্ণ আবির্ভাব রসিকজন চিত্তকে বিমোহিত করে। সেখানে কবি-অন্তরের গভীর আবেগ-কাতর অনুনয় ও বিচিত্র মূর্চ্ছনার মোহন শোভন সুবলন। প্রকাশ শৈলীতে রস উদ্বোধনের অপৃথগ্‌যত্ন নির্বর্ত্য প্রচেষ্টা হয় পরিলক্ষিত। শাক্তপদসমূহে জগন্মাতা দুর্গা কখনো কন্যা, কখনো জননী। বাল্যলীলা আগমনী ও বিজয়াশীর্ষক পদগুলিতে-তাঁহার কন্যারূপে প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালীর অন্তরের কবি রামপ্রসাদ দুর্গার বাল্যলীলা গাহিয়াছেন—এমন একটি গান 'আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।' এখানে গিরি হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন গিরিরানী। উমার অসামান্যতা ও কন্যা গৌরবে গৌরবিনী জননীর আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে এই গীতখণ্ডে। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ

মহাদেব ও গরুড়াসন কৃষ্ণ সকলেই তাঁহার কন্যার আরাধনা করেন। এ সবই জননী মেনকার স্বপ্নসন্দর্শন ঃ

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্মুখ কার পঞ্চমুখ উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্যবদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ যোড় হাতেতে করে বিনয়॥

গানটির শেষাংশে রামপ্রসাদের অভিমতটুকু ভক্তিতে বিললিত হইয়াছে ঃ

প্রসাদভনে, মুনিগনে যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরিধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

রামপ্রসাদ রচিত অন্য একটি বাল্যলীলা বিষয়ক পদেও উমাকে উপজীব্য করিয়া হিমালয়ের প্রতি মেনকার বাক্য। উমা কাঁদিতেছে, অভিমান করিয়া আছে, স্তন্যপান ও ক্ষীরননী গ্রহণে বিরত হইয়া আছে। মেনা কোন প্রকারেই প্রবোধ দিতে পারিতেছে না॥

অতি অব শেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে,
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন ওমুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?

গিরিপুরের উমাশশী আকাশশোভী শশীকে নিকটে পাইতে চাহিতেছে, তাই-এই বিপত্তি। শেষে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন মেনা। দর্পণ লইয়া তাঁহার উমামুখে ধরিয়াছেন, সমস্যার হইয়াছে সমাধান—

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীকে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা, এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে॥

শিশুর অসম্ভব অসম্ভব বায়না, বায়না না পাইয়া ক্রন্দন, অভিমান-অনশন এবং তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে জননীজনের চেষ্টা ও ব্যগ্রতা ইত্যাদি বাঙ্গালী ঘরের সকলকালের চিত্র রামপ্রসাদী সংগীতে রূপায়িত হইয়াছে। সংগীতের সমাপনাংশে তাঁহার ভক্তচিত্তের অভিব্যক্তি এখানে উল্লেখ্য ঃ

শ্রীরামপ্রসাদে কয় কত পুণ্য পুঞ্জচয়
জগতজননী যার ঘরে॥

কবি রামপ্রসাদের বাসনা যেন এই সেই 'জগত জননী'কে যদি তিনি কন্যারূপে লাভ করিতে পারিতেন! ক্ষণেকের জন্য হইলেও ভাগ্যবান কবির এ বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন মহামায়া।

বাঙ্গালীর ধারণা বৎসরান্তে প্রসন্ন শরতে কন্যা দুর্গা কৈলাস হইতে আসেন পিত্রালয় হিমপুরে। সে হিমপুর কবি কল্পনায় বঙ্গভুবনের ভবনে ভবনে। আদরিণী দুর্গা আসিবেন, তাই ত্বরা সর্বত্র। কবিকণ্ঠে জাগে গান। সে গান শাক্তপদসঞ্চয়নে 'আগমনী' অভিধায় অভিহিত।

রামপ্রসাদরচিত স্বল্পায়ত সুন্দর এক আগমনী গান, যেখানে শুনিতে পাই মেনকা হিমালয়কে বলিতেছেন উমা আসিলে আর তাহাকে তিনি কৈলাসে শিবপুরে পাঠাইবেন না। লোকেরা হয়তো ইহাতে মন্দ বলিবে, তাহাতেও তিনি কান দিবেন না। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব আসিবেন উমাকে লইবার জন্য। তখন জননী কন্যা উভয়ে মিলিয়া ঝগড়া করিবেন। জামাই বলিয়া সম্মান দিবেন না। রামপ্রসাদ কারণ বলিলেন, শিব শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, উমার দুঃখের শেষ থাকে না। তাই জননীর বেদনা—

গিরি, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজরামপ্রসাদ কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

এ ভাবনা বাঙ্গালী সমাজে পরিচিত। সেই ভাবনাচিন্তাকে রামপ্রসাদ সংগীত-মূর্তিতে তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে উপহার দিয়াছেন।

একটি গানে রামপ্রসাদ নিজেকে কবিরঞ্জন বলিয়াছেন। কবি-রঞ্জনভণিত 'ওগো রানি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো' আগমনী-গীতে সংলাপ জয়া ও মেনকার। মেনকা-পরিচারিণী জয়া উমার আগমনবার্তা শুনাইয়া উমাবরণের ত্বরা জাগাইতেছেন মেনকার অন্তরে। শুভসংবাদে উল্লসিতা গিরিরাণী প্রস্খলিত কেশভারে প্রেমজলে ভাসিয়া দ্রুতগতিতে কন্যাকে রথ হইতে নামাইয়া আনিয়াছেন। তখন—

রথ হতে নামিয়া শংকরী মায়েরে প্রণাম করে
সান্ত্বনা করে বারবার।
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভনে এমন শুভদিন আর কার গো॥

কবিরঞ্জন বটে, তবে অহংকার নাই। দাস কবিরঞ্জন, বোধহয় কম বলা হইয়াছে। তিনি নিখিলজনচিত্তরঞ্জন।

রামপ্রসাদের অন্য এক আগমনীতে বক্তা হিমালয়, উদ্দেশ্য রাণী মেনকা।

আজ শুভদিন নিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখ শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখ রাশি।
ও চাঁদমুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥

উমার আগমনে জনক-জননী, সঙ্গিনী-পরিচারিণী সকলেই আনন্দিত। আনন্দিত কবি রামপ্রসাদ। সংগীতের শেষাংশ—

কবি রামপ্রসাদ দাসে মনে মনে কত হাসে
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজনে, দিবানিশি
নাহি জানে আনন্দ পাসরে॥

জগজ্জননীর আগমনে বাঙ্গালীর অপার আনন্দ রামপ্রসাদীআগমনীতে প্রকাশিত।

আগমনী যেমন আনন্দের, বিজয়া তেমনি বেদনার। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শরতের তিনটিমাত্র দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে পূজা গ্রহণ করিয়া দুর্গা বিদায় গ্রহণ করেন চতুর্থ দিবসে দশমীতে। দুর্গার এই বিদায় বিসর্জনে বাঙ্গালী কন্যাবিদায়ের ব্যথা উপলব্ধি করে। রামপ্রসাদরচিত একটি বিজয়া গানে শুনি গিরিরাণী নগাধিরাজ হিমালয়কে বলিতেছেন স্বয়ং মহাকাল কৈলাস হইতে গিরিপুরে আসিয়াছেন দুর্গাকে লইতে। দ্বারে বাঘছাল বিছাইয়া আছেন তিনি। গণেশজননীকে বারবার বলিতেছেন প্রস্তুত হইতে। পাষাণ গৃহিণীর পাষাণ দেহ বলিয়া বিদীর্ণ হইতেছে না। তনয়া অপরের, ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না—

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা-সুধার॥

দশমী রাত্রির অন্তে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দুর্গোৎসবের আনন্দসুধা আর থাকে না। 'অর্থো হি কন্যা পরকীয়া এব' কালিদাস-ভণিতির প্রতিধ্বনি যেমন 'তনয়া পরের ধন।' কালিদাস হউন বা রামপ্রসাদ হউন তনয়া বিচ্ছেদে ইহা অপেক্ষা কঠিন সান্ত্বনা আর কি থাকিতে পারে?

যাহা মানুষের খেলা তাহা দেবতার লীলা। রামপ্রসাদরচিত সঙ্গীতসন্দোহে "প্রিয়ানুকরণং লীলা' সুষ্ঠু বিলসিত হইয়াছে। বঙ্গের অন্তরের কবি রামপ্রসাদ বঙ্গভূমির আগমনীবিজয়ার আনন্দবেদনাকে হাসি কান্নার অমৃত সমুদ্রে মিলাইয়া দিয়াছেন—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

॥ আগমনী ও বিজয়ার গান : কমলাকান্ত ॥

বাঙ্গলা এক অদ্ভুত দেশ এবং বাঙ্গালী এক অদ্ভুত জাতি। এই দেশের মৃত্তিকায় বাঙ্গালী কবি স্বর্গের দেবতাকে বারংবার নিজের করিয়া লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। শাক্তপদ সাহিত্যে শক্তি দেবতা দুর্গাকে বঙ্গকন্যা, নগনগরীকে বঙ্গভূমির সমাসনে বসাইয়া যাঁহারা কাব্যকৃতিতে চমৎকারিত্ব বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য অন্যতম। কেবল অন্যতম বলিলে কম বলা হইবে। কবিতার গুণে কমলাকান্ত বাঙ্গালীর প্রাণের কবি।

বৎসরান্তে ধনিনির্ধন নির্বিশেষে আপন তনয়াকে গৃহে আনিবার বাসনা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর। কমলাকান্ত দুর্গার আগমনী রচনা করিলেন। সে আগমনীতে মেনকা-জননী গৌরীকে হিমপুরে আনিবার জন্য অধীরা। তাঁহার নিশীথনিদ্রা কন্যার স্বপ্নে যায় টুটিয়া, নিদ্রাপর স্বামীকে ডাকিয়া মেনকা বলিতে থাকেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।

মেনা দেখেন তাঁহার কন্যা শ্মশানবাসিনী। আবার তাহাকে ঘিরিয়া শ্মশান-স্থলীতে শিবাকুল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—

আর শুন অসম্ভব-চারিদিকে শিবারব হে!
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।

মেনাচিত্ত এ স্বপ্নে যেমন কাতর, অন্যস্বপ্নে তেমনি আনন্দিত। পদকারের সেই উমামুখে অকলঙ্ক চন্দ্রমার সুষমা, দশনপঙ্ক্তিতে সৌদামিনীর বিশদশুভ্র বিভা, বাক্যাবলী সুধাস্থলী।

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার।
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ;
জাগিয়ে না হেরি তারে প্রাণ রাখা ভার।

গিরিরাণী হিমালয়কে বলেন তাঁহার গৌরী নারদের মুখে অভিমানবশে কত কথাই না বলিয়াছে, প্রকাশ করিয়াছে মনের দুঃখ ঃ

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে!
মনোদুঃখে নারদে কত না কয়েছে—
দেবদিগম্বরে সঁপিয়া আমারে মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে॥

জামাতা অস্বাভাবিক প্রকৃতির। কী করিয়া যে শিবকে হিমালয়ের ভালো লাগিল কে জানে! শিবের আবার অন্য পত্নী আছে, সেই হইল স্বামিসোহাগিনী,

স্বামিশিরোমণি। কমলাকান্তের সযত্ন প্রকাশভঙ্গী, ছন্দে ত্রিপদীর ছায়া, অলঙ্করণে অনুপ্রাস—

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কালফণী দুলিছে।
শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলিছে ॥
একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে ॥

আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না মেনা। স্বামীকে উমা আনয়নে ত্বরিত করিয়া তুলেন।

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে ॥

অন্যপদে সেই একই ব্যগ্রতা—'যাও গিরিবর হে আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার'।

মেনকার তাড়নায় হিমগিরি কন্যা আনিতে হিমপুর হইতে চলিয়াছেন কৈলাসে। কমলাকান্ত পট পরিবর্ত্তন করিলেন। নাটকীয়তা দেখা দিল তাঁহার গানের পদে—

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদপ্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥

পিতা লইতে আসিয়াছেন বৎসরান্তে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি না লইয়া বা যাইবেন কী করিয়া উমা। কমলাকান্ত উমামুখে ভাষা বসাইলেনঃ

গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর কর অনুমতি হর
যাইতে জনকভবনে।

এখানেও সেই নাট্যগুণসংলাপ। সংলাপ শিবশিবানীর। হর-হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাইতে জননীকে স্বপ্নযোগে পাইবার কথা বলেন উমা—

বিশেষ জননী আসি, আমার শিয়রে বসি
মা দুর্গা ব'লে ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমার কোলেতে রাখি
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনো দুঃখ কব কায়
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥

কন্যাকে নিকটে পাইতে মাতৃঅন্তরের যেমন ব্যাকুলতা, মাতৃ-সন্নিধানে যাইতে কন্যার অন্তরেরও সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন পদকার কমলাকান্ত। শাশ্বত বঙ্গজননী ও তনয়ার বাৎসল্যময় আকর্ষণের অমোঘ ধারাটুকু কবি আমাদের নিকট ধরিয়া দিলেন।

অবশেষে কন্যা উমাকে সঙ্গে লইয়া পিতা হিমাচল ফিরিয়াছেন আপন ভবনে; আসিয়া বলিতেছেন, 'গিরিরানী, এই নাও তোমার উমারে।' এখানেও সংলাপ। সংলাপ মেনা ও হিমগিরির। এখানেও পট পরিবর্ত্তন কৈলাস হইতে গিরিপুরে পরিবর্ত্তিত।

উমা ঘরে আসিয়াছে, সমগ্র নগনগরীতে তাই সে কি ব্যস্ততা। গিরিপুর-নাগরীবৃন্দ সেই আনন্দে যোগ দিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে বঙ্গপ্রতিবেশিনীর কোন পার্থক্য নাই। বাঙালার ঘরে ঘরে একের দুঃখানুভব এবং একের আনন্দে আনন্দানুভূতির যে সমপ্রাণতা কমলাকান্ত বঙ্গনারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ করিলেন তাঁহার আগমনী গানে। বর্ণনা বাস্তবনিষ্ঠ। নগরনাগরীর মণ্ডণপ্রয়াস সপ্রকাশ, অনুপ্রাস লক্ষণীয়—

আমার উমা এলো বলে রানী এলোকেশে ধায়।
যত নাগর নাগরী সারি সারি সারি, সারি দৌড়ি গৌরী মুখপানে চায় ॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু আধ অলকা শ্রেণী,
বলে চল চল চল অচল তনয়া হেরি ওমা, দৌড়ে আয় ॥

কন্যা মিলিয়াছে জননীর সঙ্গে। মাতৃক্রোড়ে বসিয়া স্বামি-গৃহের কত কথাই না উমা বলেন। স্বামিগৃহে সৌভাগ্যসুখ-সম্পদের কথা বলিতে বঙ্গ-কন্যার মতো উমারও আনন্দ ধরে না। কমলাকান্তের অকপট অভিব্যক্তি—

কে বলে দরিদ্র হর রতনে রচিত ঘর মা
জিনি কত সুধাকর শত দিনমনি
বিবাহ অবধি আর—কে দেখেছে অন্ধকার
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥

শ্যামল শরতে বঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে শক্তিদেবতা দুর্গার আগমনী প্রতিটি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আনন্দের অমেয় প্লাবন আনে। দুর্গা নয়, সে যে আমাদেরই ঘরের স্নেহাতুরা সুতা। আগমনীর পদে পদে বাৎসল্যরসায়িত কমলাকান্তের কোমল কান্ত কবি-মর্মের স্পর্শ। বাঙ্গালী জনক জননী, পতি-পত্নী, কন্যা-জামাতা প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী লইয়া কমলাকান্তের আগমনী পদাবলী চিরকালের অমৃতনির্ঝরিণী।

কবির ব্যক্তিমনের পরিচিতিও ইহাতে নিবিড়। সাধক কমলাকান্ত জানেন অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী উমার চিন্তা কে করিবে, কে করিতে পারে, তাই বলিয়া উঠেন—

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদো নাকো রানি হও গো শান্ত।
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত নিশিদিন সেবা করেন জগজ্জননীর চরণদ্বন্দ্ব। সেই দুর্গা হিমালয়মেনকার কন্যা। কমলাকান্ত একপদে গাহিলেন। 'কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ মা ; আমি কতোগুণে পেয়েছি তোমারে ॥'

এই ভক্তিবিভাসিত কবির হৃদয় আগমনীতে গলিয়া ঝরিয়া গিয়া তাহাকে মৃন্ময় তথা গীতি-কবিতায় সমুত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সমাজচিত্র, নাটকীয়তা, ভক্তিগীতি, কাব্যধর্ম একত্র মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে কমলাকান্তের আগমনীপর্যায়ের পদ-সমুচ্চয়ে।

কৈলাস হইতে বৎসরান্তে দুর্গা আসেন হিমপুরে পিত্রালয়ে। সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী তিথি অতিবাহিত করার পর দুর্গাকে দশমী তিথিতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিতে হয় কৈলাসের পথে স্বামিগৃহে। তাহাই বিজয়া। অত্যল্প সময়ে কন্যা বিদায়ে কাতর হয় জননীর প্রাণ। আবার পূর্ণ একটি বৎসরের পর সাক্ষাৎ হইবে আদরিণী দুহিতার সঙ্গে। কমলাকান্তের বিজয়াশীর্ষক পদে মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়ে। জননী মেনকা প্রথমে নবমী নিশিকে খল বলিয়া ভর্ৎসনা করেন ঃ

খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত বধরে পরেরি প্রাণ ॥

নবমী নিশি শেষ হয়, দশমী আসে ; শেষ হয় কন্যা-বিদায়ে জননীর প্রাণ। পরের মুহূর্তে বিকচকুমুদে ও চন্দন-পঙ্কে কৃতাঞ্জলি অর্চনা করেন নবমীকে, উদ্দেশ্য নবমী যেন দশমীর প্রভাত না দেখে। তাহা হইলে আর কন্যাকে বিদায় দিতে হইবে না ঃ

প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি ভয়
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ ॥

জননী বহুদিনের পরে তনয়া দুর্গাকে নিকটে পাইয়া যে সুখ পাইয়াছিলেন বিজয়ায় তাহা শেষ হইয়া যাইবে। সুখ হইবে স্বপ্নমাত্র। কবি কমলাকান্ত বলিতেছেন মা দুর্গাকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে হইবে লুকায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিয়ে স্থান। হৃদয়ে দুর্গাকে লুকাইয়া রাখিলে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আর থাকিবে না। কমলাকান্তের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভক্তকবিমন ধরা দিয়াছে।

মেনকার কোন অনুনয় রক্ষিত হয় নাই। দশমী আসিয়াছে। হিমপুরে বাহির ভবনে বিশাল ডমরু বাজিয়া উঠিয়াছে শিব-করে। দুর্গাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন স্বয়ং শিব। মাতা মেনকার কণ্ঠে নাটকীয়তা ও ব্যথিত বচন—

কি হলো নবমী নিশি হৈলো অবসান গো
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥

জননী ভিখারী-ত্রিশূলধর শিবকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন, উমা দিতে পারেন না। 'বরঞ্চ জীবন চাহে তাহা করি দান'। জামাতা শিবের রীতিনীতি, আচরণ-পদ্ধতি শুনিয়া জননীর হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে! 'আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গো'। অবশেষে কমলাকান্ত ভণিতিতে পাই—

কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো ॥

হিমালয় নিজে বুঝাইতে পারিবেন না, সঙ্গে যাইবেন কমলাকান্ত।

অন্য একটি পদ 'জয়া, বল গো পাঠানো হবে না'। এই পদে কমলাকান্ত জয়াকে আনিয়াছেন। মেনকা সঙ্গিনী-পরিচারিণী বিখ্যাতা জয়াকে দিয়া হরের

নিকট বলিয়া পাঠাইলেন—উমা পাঠানো হইবে না। কারণ হর মায়ের বেদন কেমন জানে না। মেনকা কন্যাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন, নয়ন দুইটিকে করিবেন প্রহরী। হিমালয় আসিয়া বলিলে নিজ জীবন দিবেন বিসর্জন।

ওগো হৃদয় মাঝারে রাখিব বাহারে প্রহরী এ দুটি নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া তখনি ত্যজিব জীবন ॥

কারণ বলিতেছেন তিনি—

সবেমাত্র ধন গৌরী মোর প্রাণ তিনদিন যদি রয় না—
তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে
এ দুঃখ প্রাণ আমার রবে না ॥

মেনকা ভাবিতে পারেন নাই রাজকুমারী উমা জনম ভিখারী শিবের ঘরে পড়িয়া এতো কষ্ট পাইবে।

ওগো শ্মশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন লাজে হর এসেছেন লইতে
জানে না যে বিদায় দেবে না ॥

কমলাকান্ত প্রথমে জয়াকে দিয়া বলাইয়াছেন 'কত বিরিঞ্চিবাঞ্ছিতপদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।' বহু ব্রহ্মার বাঞ্ছা দুর্গার চরণদ্বন্দ্ব; তাহাকে কেবল কন্যা ভাবিলে চলিবে না। অবশেষে কবি মূল বক্তব্য রাখিলেন—শিব ভিন্ন শিবালাভ ঘটে না, জামাতা রাখিলে কন্যা থাকিবে।

কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শংকরে পার রাখিবারে
তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥

জয়ার প্রতি সংলাপে পদটির নাটকীয়তা লক্ষ্য করিবার মতো। আর 'হৃদয় মাঝারে রাখিব বাহারে প্রহরী এ-দুটি নয়ন।' এই অংশে বাৎসল্যরসের ঘন-সঞ্চার। এই অংশটি সহৃদয় পাঠককে বৈষ্ণবপদাবলীর গোবিন্দদাসভণিত বিখ্যাত উক্তি 'হৃদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহু জাগি' স্মরণ করাইয়া দিবে। জননীমাত্রই চাহেন কন্যা বিভবসম্পন্ন সংসারের কর্ত্রী হইবে। মেনকা তাহাই চাহিয়াছিলেন। আপাত ভিক্ষু শিবের ব্যবহারে তাঁহার মনের কষ্ট পদটিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশেষে শিব দুর্গাকে লইয়া চলিয়াছেন হিমালয় হইতে কৈলাসে। মেনকা বহু বাধা দিয়া যখন পারিতেছেন না, তখন বলিয়া উঠিয়াছেন ঃ

আমার গৌরীকে লয়ে যায় হর আসিয়ে—
কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে।

জামাতার ফণিহার, বাঘছাল বসন ভূষণই কেমন লাগে, তাহার উপর ক্ষণে ক্ষণে বিস্রস্ত বিগলিতবাস হইয়া যাওয়া।

এ কি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার
পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।

স্বামীর প্রতি অভিযোগ স্বর্ণপুত্তলীকে তিনি সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছেন—'সোনার পুতলী দিলে পাথারে ভাসায়ে।'

এই অভিযোগ খণ্ডন করিতেছেন হিমালয়। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে গুণনিচয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য, সে সবই শিবের মধ্যে বিদ্যমান। 'শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, অণিমাদি আছে যার চরণে লোটায়ে।'

কন্যাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় দেন জননী। বলিয়া উঠেন ঃ

ফিরে যাওগো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি ;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো ?

রত্নভবনের ঔজ্জ্বল্য আজ অন্ধকারে গেল ঢাকিয়া, 'ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন।' কন্যাকে বলিতে বলেন মাতা, কতদিনে সে ফিরিয়া আসিবে।

দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথপানে।
বোলে যাও আসিবি আর কতদিনে এ ভবনে॥

বঙ্গবাসী কমলাকান্ত বঙ্গজননী ও কন্যার বাৎসল্যপরিচয়ে অতি অভিজ্ঞ। কন্যা অদর্শনে বঙ্গজননীর বেদনা কি পরিমাণে মর্মস্পর্শী হয় তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। তত্ত্ব ও ভক্তিকথার অন্তরালে বাঙ্গালী জীবনের এই দিকটি বিজয়াশীর্ষকপদগুলিতে তিনি পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। তাহাতে কবির কবিত্ব, নাটকীয়তা ইত্যাদিও বিদ্যমান।

।। আগমনী ও বিজয়া গানে প্রকৃতিলোক ।।

কৈলাস হইতে বৎসরান্তে দুর্গা হিমপুরে আসেন কিনা কে জানে। তবে, যে কবি-কল্পনা নগ-নগরী এবং বঙ্গভূমিকে দুর্গার আগমন-বিদায়ের সূত্র ধরিয়া সমাসনে বসাইয়াছে, সে-কবি-কল্পনা আনন্দিত প্রশংসার দাবী রাখে। বৎসরের পর স্বামিগৃহ হইতে কন্যা আসিবে পিত্রালয়ে; কন্যাকে নিকটে পাইবার জন্য জনক-জননী-হৃদয়ের যেমন গভীর আগ্রহ তেমনি বিপুল আনন্দ। আর সেই কন্যা যখন পিত্রালয় শূন্য করিয়া স্বামিসকাশে ফিরিয়া যান, তখন বিদায়ের বেদনাও তীব্র হইয়া দেখা দেয়। এই যে আনন্দ এবং বেদনা, ইহা বঙ্গ এবং বাঙ্গালীর বিখ্যাত শারদ দুর্গোৎসবের আগমনী এবং বিজয়াকে কেন্দ্র করিয়া অভিব্যক্তি লাভ করে। কবি-ভাবনা প্রকৃতিজগৎকে দূরে ফেলিয়া রাখে না। তাহাকে মানুষের সুখদুঃখের অংশভাগী করিয়া কাব্যমুখে ধরিয়া দেয়।

শরতের আকাশে, স্থলে, জলে, বাতাসে এমন সব চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে থাকে, যাহাতে মাতৃহৃদয়ে তনয়া-বিচ্ছেদ ব্যথা বর্দ্ধিত হয়। তনয়াকে নিকটে পাইবার জন্য জননীমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। বর্ষণক্লান্ত শরতের আকাশে নিবিড় নীলিমা। সেই নীলিমায় চন্দ্র-বিকাশ। সেই চন্দ্র দেখিয়া মাতার মনে পড়ে চন্দ্রমুখী কন্যাকে। শরতের কুঞ্জতলে বিবচ শেফালিকার সমারোহ মনে করাইয়া দেয় শেফালিকাসমবর্ণা দুহিতাকে। নির্মল তটিনী-সলিলের শতদল দল মেনকাকে স্মরণ করাইয়া দেয় শতদল-প্রিয়া পদ্মাসনা তনুজা দুর্গাকে। আরো আছে—শরতের হিম হিম হাওয়ায় যে উমা-অঙ্গের শীতস্পর্শ, কবি গোবিন্দ চৌধুরীর আগমনী গানে তাহার একাংশ :

সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি
কৈ গিরি, আমার কৈ শশি মুখী ?
শেফালিকা এল উমার বর্ণমাখি,
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী ?
নির্ঝরিণীর জল, হল নিরমল
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল !
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে—কেবল তারা নেই।
শরতের বায়ু যখন লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায়
যাও যাও গিরি আনগে উমায়
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের এক আগমনী পদে দেখি, মা মেনকা শরতের পশ্চিম আকাশে চারু চন্দ্র-কলা দেখিয়া ভাবেন তাঁহার উমা-মুখ-দ্যুতি ঐ চন্দ্র কান্তিকে ম্লান করিয়া দেয়, প্রতীচীর আকাশ-আদর্শে উমামুখের প্রতিবিম্বন ঃ

শারদশশী বঙ্কিম ,করি ঐ আভাহীন
পশ্চিম গগনে ঐ উমা মুখ ভাসে রে।

কমলাকান্ত তাঁহার আগমনী গানে উমামুখের উপমা টানিয়াছেন বঙ্গের বিলে ঝিলে তড়াগে ফুটিয়া উঠা শরতের কমলের সঙ্গে—

'শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী মায়ের '।

কন্যা কৈলাস হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন হিমপ্রস্থে, মায়ের সস্নেহ সান্নিধ্যে। মেনকা বলিতেছেন, ঐ ঊর্ধ্বলোকে আকাশের চন্দ্র কন্যার মুখ-মনে করাইয়া কতো কান্নাই না কাঁদাইত, ত্রিযামা যামিনীর দীর্ঘ প্রহরগুলিতেও ঘুম আসিয়া তাঁহার নেত্রপ্রান্ত এক করিয়া দিত না। কবি রাজকৃষ্ণ ঘোষ ঃ

আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি তব মুখ শশী
যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম হায় ॥

তাই পদকর্তা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মেনকা স্বামী হিমালয়কে বলেন—

ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি ঘরে
শরদে শারদা বিনা হৃদয় বিদরে।
আনচানু করে প্রাণ সুস্থির না হয় মন
দাবাগ্নি হরিণী যেন ব্যাকুলা অন্তরে ॥

যে প্রকৃতি জননীচিত্তে বৎসরান্তে তনয়া-আনয়নের ত্বরা জাগায়, তনয়ার বিদায়লগ্নে সেই প্রকৃতিকেই কবি-কণ্ঠে অনুরোধ হয় নিবেদিত। মহাকবি মধুসূদন বলিলেন, সুরে অনুনয়ের কাতরতা—নবমীর রাত্রি যেন অবসিত না হয়—

যেয়ো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে ॥

নবমীর নিশান্তে তৃণে তৃণে, লতায় পাতায় ভোরের শিশির বিন্দুর শোভা, বনবিতানের বৃক্ষ বল্লরীর শাখে শাখে বিহগ-কণ্ঠের গান, রেখায় রেখায় ফুটিয়া-উঠা শরতের সোনা সোনা আলোর কণা আর কোন আনন্দ বিধানই তো করিবে না, বরং তাহারাই হইয়া উঠিবে বেদনার কেন্দ্রভূমি। মহাকবি নবীন সেন সেই নবমীর রাত্রিকে বলেন—

তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে ॥
প্রভাত কাকলী গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে ॥

পাখীর অস্ফুট ললিত গীতে, পুষ্পের পরিমলবাহির মন্দ মন্দ পবনে,

রবির উজ্জ্বল আলোকে বিদায় দিতে হইবে আদরিণী কন্যাকে। এ অসহ্য, এ অসম্ভব। কবি হরিনাথ মজুমদার ঃ

মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে
ওমা ডাকিছে বিহঙ্গ পবনতরঙ্গ
গন্ধ ভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥

আমাদের বাঙ্গালার গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে বাউল বৈরাগীর দল খঞ্জনী একতারায় যখন গাহিয়া ফিরিতে থাকে আগমনী গীত 'গা তোলো গা তোল বাঁধ মা কুন্তল। ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী' তখন শারদ প্রকৃতিতে সে কি আনন্দ। আর বিজয়ার প্রকৃতিকে চাহিলে সেখানে দেখা যায় কি এক করুণ কোমল বিষন্নতা তখন মনে হয় সে তো প্রকৃতি নয়, সে যে তনয়া-বিরহলগ্নের অশ্রুমুখী জননীমূর্তি, সে যে বাঙালী মা।

।। শাক্তপদসাহিত্যে 'ভক্তের আকৃতি'তে কবিবক্তব্য ।।

শাক্ত পদসাহিত্যের রচয়িতৃবৃন্দের রচনাগুলিকে বিবিধনামে আখ্যাত করিয়া পদসংকলনগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সংকলনগ্রন্থে 'ভক্তের আকৃতি' নামক পদ সাতাত্তরটি। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নবাই ময়রা, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য, মহারাজ নন্দকুমার, রজনীকান্ত সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দাশরথি রায়, এণ্টনী সাহেব, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ প্রাচীন-নবীন কবি-গণের শাক্তবিষয়ক রচনা 'ভক্তের আকৃতি' অংশে স্থান পাইয়াছে।

শাক্তপদকারগণের পরিচয়—তাঁহারা যেমন কবি, তেমনি ভক্ত। 'ভক্তের আকৃতি' —এই নামেই প্রকাশ এই পর্যায়ের পদগুলির বিষয়বস্তু বা উপজীব্যতা। ভক্ত মায়ার সংসারের বিচিত্র মায়ায় বদ্ধ হইয়াছেন, শক্তিদেবতা শ্যামা-দুর্গাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আর আরাধনার সময় নাই। তখন ভক্তচিত্ত কৃতকর্মের জন্য অনুশয়-অনুতাপে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া শক্তি-দেবতার নিকট আবেগাকুল প্রার্থনায় ব্যাকুল-বিহ্বল। শাক্তকবিসম্প্রদায়ের ভক্ত-হৃদয়ের এই আকৃতি ভক্তের আকৃতি নামে চিহ্নিত।

'ভক্তের আকৃতি'-অংশের পদগুলি কবির ব্যক্তি-অন্তরের ভাবপ্রকাশনা বলিয়া Subjectivity বা মন্ময়তা লাভ করিয়াছে। এই ব্যক্তিচিন্তা তথা মন্ময়ভাবনা পদগুলিকে গীতিকাব্যধর্মে সুষ্ঠুরূপে চিহ্নিত করে। মন্ময়ভাবনা-সম্বলিত 'ভক্তের আকৃতি' বিষয়ক পদসমূহ নিখিল ভক্তজনের অন্তরের অভিব্যক্তি দান করিয়া সার্বজনীন স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সমগ্র শাক্তপদ-সাহিত্যের গীতিকাব্যধর্মের মর্মবাণীরূপে 'ভক্তের আকৃতি' অনবদ্য ও অমূল্য।

পদকার রামপ্রসাদ আশা করিয়া ছিলেন 'ভবের আসা খেলব পাশা।' কিন্তু এই খেলায় তাঁহার হার হইয়াছে। কবিকণ্ঠে নির্বেদ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে ঃ

আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো ॥
হন্দ হলো চোদ্দ পোয়া বন্ধ পথে যায় না পাওয়া
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো ॥

'বন্ধপথে যায় না পাওয়া'—মায়ায় আবদ্ধ সংসারে শক্তিস্বরূপিনী মা শ্যামা-দুর্গাকে লাভ করা যায় না। কিন্তু রামপ্রসাদ বুদ্ধিদোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

অন্য পদে কবির নিঃসঙ্কোচ ভ্রান্তির প্রকাশ। তিনি আলেখ্যচিত্রিত পদ্মে আকৃষ্ট ভ্রমর মাত্র। এই সংসারে আসাই মাত্র তাঁহার সার হইয়াছে, কাজের কাজ কিছুই হয় নাই ঃ

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।

কবির অনুযোগ শ্যামামায়ের নিকট। তিনিই যেন ভুলাইয়া মায়ার সংসারে আবদ্ধ করিয়াছেন, চিনি বলিয়া নিম খাওয়াইয়াছেন—'মা নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে কথায় ক'রে ছলো।' তাঁহার প্রার্থনা, জীবনসায়াহ্নে মাতৃক্রোড়ে ঘরে ফিরিবেন-'এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।'

রামপ্রসাদের অভিমান তাঁহার শ্যামা মা-ই তাঁহাকে সংসারী করিয়াছেন। ইহার প্রকাশ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নয়, একেবারে সোজাসুজি ঃ

আমি তাই অভিমান করি
আমায় ক'রেছ গো মা সংসারী ॥

সংসারবন্ধ কবিমন মাতৃনাম বিস্মৃত হইয়াছে, 'মনে করি তোমার নাম করি আবার সময়ে পাশরি।' কবি পালাইয়া বাঁচিবেন এমন স্থানও পান না। ভাবিয়াছিলেন শ্যামা মায়ের চরণ হইবে আশ্রয়, কিন্তু স্বয়ং ত্রিপুরারি শঙ্কর তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। 'মা গো তারা ও শঙ্করি' পদের শেষ দুইটি ছত্র ঃ

পালাইতে স্থান নাহি মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

'মা আমায় ঘুরাবে কত' পদে কবির বক্তব্য তাঁহার মায়ামোহের নীলাঞ্জন-বিলিপ্ত নেত্রদ্বন্দ্ব মাতৃ-পদ-দর্শনে বিরত। কবির অনুযোগময় প্রকাশ ঃ

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত ॥

রামপ্রসাদ সেনের মতো কমলাকান্ত ভট্টাচার্যও আশাভ্রান্ত। একটি পদে কমলাকান্ত গাহিলেন ঃ

বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা, এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণে আছে ॥

ছটা আগুন—ষড় রিপুর জ্বালায় তরুশাখা শুষ্ক। উপায়ও স্থির করেন কবি। তাঁহার বিশ্বাস, তারানামের বারিসিঞ্চনে কাজ হইবে। জন্ম, বার্ধক্য এবং মৃত্যুহরণ এই তারা মায়ের নাম। এই কমলাকান্ত মোক্ষ চাহেন না, চাহেন না স্বর্গাদি দুর্লভ স্থান। তাঁহার ভক্তচিত্ত কেবল চরণদুইটিকে অভিলাষ করিয়া আছে। অন্য এক পদে লিখিলেন ঃ

মা না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস
নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কিভাব ভাবিয়ে ॥

এই পদটি স্বাভাবিকভাবে মনে করাইয়া দেয়—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

ভোগ এবং মোক্ষ-স্পৃহা ভক্তিসুখের বিরোধিনী। কবি কমলাকান্তের সংসার-ভোগ-বিরক্তচিত্ত মুক্তিও চাহে না, চাহে শ্যামাচরণে ভক্তি। এ ভক্তির তুলনা কোথায় ?

পদকর্তা নবাই ময়রার আকুতি তিনি হৃদয় রাস-মন্দিরে শ্যামামায়ের শ্যাম-মূর্তি দেখিতে চাহেন। 'হৃদয় রাস মন্দিরে' পদে তিনি লিখিলেন ঃ

একবার কালী ছেড়ে হওমা কালা
ও গো ও পাষাণের মেয়ে।

তাঁহার বাসনা বড় সুন্দর। শ্যামা জননীকে শ্যামরূপে ত্রিভঙ্গঠামে রাধাকে বামে করিয়া পীতধড়া-মোহনচূড়া বনমাল-বংশীবদন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—'ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে'।

প্রেমিক মহেন্দ্র ভট্টাচার্যও অর্থবিভব না চাহিয়া শ্যামামায়ের দর্শন চাহিলেন: 'টাকা কড়ি চাই না শ্যামা, দেখা দিতে তাও পার না।' মাতৃদর্শন লাভ করিতে পারিলে ভক্তের যে আর কিছুই চাহিবার থাকে না। তাই পরম প্রার্থনীয়টি প্রার্থনা করিয়া বসিয়াছেন কবি কমলাকান্তের মতো।

মহারাজ নন্দকুমার রায় বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি ভ্রান্ত, অকারণে তাঁহার কাল বহিয়া যাইতেছে ; সকল সুখসম্পদের মূল যে শক্তি দেবতার নির্ভয় চরণাশ্রয় তাহাতেই মন নিমগ্ন হইতেছে না। মন চঞ্চল, বিষয়াশয় পাপময় ; ষড়রিপুর নিবারণ কেবল শক্তি দেবতার কৃপালব লাভ করিয়াই সম্ভব ঃ

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়।
সব সুখসম্পদ, তোমার অভয় পদ,

কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥
মতি চঞ্চল অতি দুরিত দুরাশয়,
বিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে
তব কৃপালেশ যদি হয়।

শম্ভুচন্দ্র রায় বুঝিয়াছেন প্রভাতবেলায় বিষয় চিন্তায়, মধ্যাহ্ন সময়ে খাদ্য চিন্তায়, রাত্রিযোগে অন্যান্য চিন্তায় তাঁহার সময় কাটিয়া যায়। তাই তারা-মাকে ডাকিবার সময় পান না তিনি। এখন সকল দায়িত্ব তারামায়ের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন। তিনি লিখিলেন ঃ

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগৎ—চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !

'ভক্তের আকুতি' পর্য্যায়ে রজনীকান্ত সেনের কবিতাটি একান্ত মর্মস্পর্শী। কবির জীবনে বহু দুঃখ, বহু কষ্ট। তাঁহার বেদনায় সমবেদনা জানাইবার কেহ নাই, তাই শ্যামা জননীর নিকট প্রশ্ন—'আর কতদিন ভবে থাকিব মা ? পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?' নিজ জীবনের দুঃখ শ্যামা মায়ের নিকট জানাইয়াছেন বহুবার, তবু তিনি একটা উপায় করিতেছেন না কেন ?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো—
(আমি) আঁধারে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আর কত ধুলো মাখিব মা !

কুমার নরচন্দ্র রায় আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন অভিমান জানাইয়া ঃ

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।

কবি কৃতকর্ম ও ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া এই কথা বলিতে পারিয়াছেন।

দাশরথি রায়-এর পদে মৃত্যুকালে কালী-নাম জপিবার প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তচিত্তের এইটি বাসনা ঃ

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী ॥

কবি অমৃতলাল বসু এই ভব-সংসারকে হাটের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছেন শ্যামা মা যেন অবেলায় হাট ভাঙিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা হাট করিবার তাঁহারা ঠিক হাট করিয়াছেন। তিনি পারেন নাই ; কর্মদোষে পাপরাশি শিরে ধরিয়া বসিয়া আছেন শুধু। এদিকে দিনমণি হইয়াছেন অস্তাচলগামী, রাত্রির অন্ধকার এখনি আসিবে নামিয়া। তাঁহার সব সম্বল শেষ হইয়াছে, হাট

করা হইল না। অর্থাৎ অন্তিম সময় আগত প্রায় হইলেও শ্যামা জননীর প্রতি ভক্তির সম্বল কিছুই নাই। অনুযোগ—'অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।' আকূতি--'নে মা কোলে তুলে অভাগারে দে মা তোর ঐ চরণতরী।'

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার এক কবিতায় লিখিতেছেন, শ্যামা কেমন ধারা মা তিনি বুঝিয়া পান না, কারণ মা বলিয়া তিনি কতই ডাকিয়াছেন তবু সাড়া আসিল না, তাই মা বলিয়া আর ডাকিবেন না ঃ

ও মা, কেমন মা কে জানে !
মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে ?
মা ব'লে তো ডাকব' না আর
লাগে কিনা দেখব তোমার
বাবা ব'লে ডাকব এবার প্রাণ যদি না মানে।

সন্তানের আহবানে সাড়া না দিবার কারণ বলেন গিরিশচন্দ্র। শ্যামা পাষাণের কন্যা বলিয়া পাষাণহৃদয়া পাষাণী। সন্তানের প্রতি সে নজর দিতে সময় পায় না কারণ পেত্নীসম্প্রদায় লইয়া শ্মশানে ছুটিয়া বেড়ায় ঃ

পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে ।।

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্য তিনি শ্যামা মায়ের চরণ ধরিয়া পড়িয়া আছেন, তবু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার সময় নাই। শ্যামা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে খেলায় মত্ত, সে খেলা প্রলয়ের খেলা। পদতলে শয়ান শংকর, মুখে অট্টহাসি, অঙ্গ বাহিয়া শোণিত-ধারা। ইহাতে নিখিল বিশ্ব ভয়ে চক্ষু মুদিয়া আছে, মুখে মা, মা-ধ্বনি। কবির আকূতি তিনি যেন কবিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন, স্মিতমুখে শুভ্রবাসে তাঁহার যেন বরাভয় মূর্তি ভাসিয়া উঠে ঃ

তারা ক্ষেমংকরী, অভয়ে অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারা-রূপে স্মিতমুখে শুভ্রবাসে—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে !
এতোদিন তো কালী ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হোল, এখন মা তোর অসি না মা।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊষার আবির্ভাবের মতো শ্যামার প্রলয়ংকরী মূর্তির মধ্য দিয়া বরাভয়দায়িনী মূর্তির উদয় হউক ঃ কবি-হৃদয়ের প্রার্থনা।

শাক্ত পদসাহিত্যে 'ভক্তের আকূতি' সবিশেষ উল্লেখ্য অংশ। এই অংশে দুঃখ-বিবশ কষ্ট-কাতর কবিপ্রাণের প্রার্থনা শক্তিদেবতা শ্যামা-দুর্গার নিকট নিবেদিত হইয়াছে। নিখিল ভক্ত-হৃদয়ের আকূতি যেন রামপ্রসাদের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥

কবিভেদে আকূতি প্রকাশের পন্থা অনুশয়-অনুনয়, অভিযোগ-অনুযোগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও প্রার্থনা একটিই—শ্যামা জননীর কৃপা-লাভ।

॥ ভক্তের আকৃতি ও রূপকের রূপ ॥

বাঙ্গালী বড় ভাগ্যবান জাতি। বৈষ্ণব মহাজনগণের গানের মতো শাক্ত-মহাজনগণের গানও সে যুগ যুগ ধরিয়া আস্বাদ্যরূপে লাভ করিয়াছে। শাক্ত-মহাজন-গীতিকার বিশেষ এক অংশ পদাবলী সঙ্কলনে ভক্তের আকূতি-অভিধায় অভিহিত। এই অংশ ভক্তজনের মর্মবাণীকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। মায়ামোহে আবদ্ধ শাক্তসাধক সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া মোহনির্মুক্তির জন্য কাতর হইয়া উঠিয়াছে। নানা অনুযোগ-অভিযোগের মধ্য দিয়া স্বকৃত ভুলের জন্য তাঁহারা হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন। ভক্তপ্রাণের গভীর আবেগ ও প্রার্থনা ভক্তের আকূতি অংশের উপজীব্য বিষয়। শাক্তপদকারবর্গের নিজ নিজ চিত্তের অভিলাষ যে এই অংশে বহুধা অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। প্রকাশের মাধ্যমরূপে শাক্তপদ-রচয়িতৃগণ রূপক অবলম্বন করিয়া কাব্যশৈলীকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই রূপকগুলি লোকজীবন-ভাবনা হইতে সংগৃহীত বলিয়া জনচিত্তে অধিক সংবেদনশীল হইয়া উঠিয়াছে।

সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার এক পদে লিখিতেছেন পৃথিবীর পাশাখেলায় তিনি হারিয়া গিয়াছেন ঃ

ভবের আশা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজুরি প'লো।

অবশেষে তাঁহার 'ছন্দ হ'লো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।'

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার এক রচনায় ভানুমতীর খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। ভানুমতীর ভোজবাজি। কবি ভানুমতীর খেলার রূপকে বলিলেন ঃ

ভবের খেলা খেলতে হবে
আমারে একলা পাঠালি।
ও মা কিভাব ভেবে বলনা শিবে
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি॥

সংসারের কুহক ভানুমতীর খেলা। কবি কুহকিনী কৈতবিনীর কুহককৌতুকে মাতিয়া সবই হারাইয়াছেন। তাই অনুশোচনা—

মনে করি খেলব না আর
ভানুমতীরে ছাড়তে বলি
ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক
আবার তার কুহকে ভুলি।

মায়ার আকর্ষণই ভানুমতীর কুহক।

মায়াময় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম পদকর্তা চন্দ্রনাথ দাসের মতে কেবল ধূলা খেলা। ধূলা খেলার মতোই অসার ও ক্লান্তিকর। তাঁহার যখন ভুল

ভাঙিল তখন জীবনের অন্তলগ্ন—দিবসের সন্ধ্যা সময় সমাগত। ধূলো খেলায় মাতিয়া অবোধ শিশুর মতো শাক্তসাধক শ্যামা মাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া না আসিয়া বা উপায় কি !

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গীলয়ে ধূলো খেলা
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যা বেলা ॥

মায়ার ধূলো ঝাড়িয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থান দিবার প্রার্থনা এখানে নিবেদিত।

কত ছাই মাটি দেখ গায় ভরেছে গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠান্ডা জলে পুঁছে দে মা গায়ের মলা ॥

মায়ার মোহে সারাজীবন জীবের বৃথা শ্রম, ব্যর্থ আয়োজন। অঙ্গলীন মালিন্য এই মোহসঞ্জাত। সাধক সার বুঝিতে পারিয়াছেন। পদান্তে আকুল শরণাগতি—'তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা ॥'

এই ভবসংসার শাক্তসাধকজনের নিকট কখনো ভবকূপ কখনো ভবসাগর। কূপই হউক আর সাগরই হউক এখান হইতে উদ্ধার কোথায়। সেই উদ্ধার লাভের জন্য তাঁহাদের ব্যগ্রতা এক সময় সীমাহারা হইয়া দেখা দেয়। পদকার প্যারীমোহন কবিরত্ন মা কালীর নিকট অনুযোগ তুলিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন ঃ

আর কতকাল ভুগবো কালী, হয়ে আমি কুয়োয় ছাড়া
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই উঠা-পড়া ॥

দেওয়ান রায় রঘুনাথ ভব-সংসারকে সাগর, তনুকে তরী, মায়াকে ঝড়, মোহকে তুফান, মনকে মাঝি, ছয়রিপুকে দাঁড়ি ইত্যাদিতে রূপায়িত করিয়াছেন বড় চমৎকার ঃ

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শংকরী ॥
একে মনমাঝি আনাড়ি তাতে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥

মা শংকরীর নিকট ভক্তপ্রাণের হাহাকার গীতমুখে উৎসারিত। তাঁহার ভক্তি-রূপ হাল গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, শ্রদ্ধারূপ পাল হইয়াছে ছিন্ন। এখন অবাধ্য তরীকে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি। তাই অনুপায়ে দুর্গার নামরূপ ভেলায় তাঁহার ভবসাগরের তরঙ্গ সন্তরণ—'তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি ॥'

তিনকড়ি বিশ্বাসের সেই একই কথা—সংসার তাঁহার নিকট ভবার্ণব। 'কোথায় গো মা ভবতারা ভবার্ণবে ডুবে মরি।' অতএব তারামায়ের চরণতরণী প্রার্থনাই একমাত্র পথ। 'দয়া করে দাও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী।'

কালিদাস ভট্টাচার্যের ভাষায় ভবজলধি। তিনি সেই জলধির তরঙ্গ ভঙ্গে নিমগ্ন। সাঁতারও তাঁহার জানা নাই। দেহের নৌকা জীর্ণ এবং পাপের বোঝাতেই ভারি হইয়া উঠিয়াছে। কবিকণ্ঠে তীব্র ব্যাকুলতা 'কি ধরি কি করি ভবজলধি অপার।' এহেন অবস্থায় কালীমাতা ভরসা। 'কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার।'

সাধক কবি রামপ্রসাদ ভববৃক্ষে বাঁধা চোখঢাকা এক বলদ। সংসারের মায়ামোহের আকর্ষণে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। যখন চেতন পাইলেন তখন অনুযোগ তুলিয়া ধরিলেন তাঁহার উপাস্যার নিকট—

মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত ?

সংসার বৃক্ষে কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের ছয় কলু তাঁহাকে বাঁধিয়া কেবল ঘুরাইয়াছে। ঠিক এই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে অন্যত্র, রূপকও ভিন্ন—

মলেম ভূতের বেগার খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।

সম্বল পরপারে যাওয়ার পারানী কড়ি। এই পদে পঞ্চভূত, ছয়রিপু ও দশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি।

এই রামপ্রসাদ একপদে গাহিলেন তিনি জানেন না কোন অবিচারে তাঁহার উপর দুঃখের ডিক্রি জারি হইয়াছে। আসামী তিনি একজন কিন্তু প্যাদা ছয়জন। সেই ষড়রিপু। সংসারমোকদ্দমা কৌতুকোদ্দীপক রূপক বটে ঃ

মাগো তারা ও শঙ্করি
কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রি জারি ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে এই ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কল্পনায় সংসারকে কারাগার বানাইলেন। তিনিও তাঁহার অপরাধ জানেন না। অভিযোগ তারামায়ের নিকট—

তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয়দূত, তাসিল করে কত, দারাসুত পায়ের শৃঙ্খল॥

কমলাকান্তের মতে সংসার এক শুষ্কতরু। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই তরুতে তিনি ফল পাইবেন। তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শাখা শুকাইয়া যাইতেছে। ছয়টি আগুন তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কমলাকান্ত ভাবিয়া উপায় পাইয়াছেন, 'জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা তারা নামে ছেঁচলে বাঁচে'।

পদরচয়িতা রামচন্দ্র রায়ের নিকট এই ভবসংসার হইল রোগ। তিনি ভবরোগ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। যখন রোগ ধরা পড়িল তখন বড় অকাল। 'তারিণী ভবরোগে ব্যথিত জীবন করি কি এখন ?' ব্যাধি বিবিধ। কলুষপিত্ত, বাসনা বাত, প্রবৃত্তিকফ, বিষয়কুপথ্য, আশাপিপাসা, মোহতন্দ্রা, প্রলাপ-কুআলাপ, মায়াভ্রম। তারিণীর নিকট,তাঁহার প্রার্থনা 'তব কৃপা ধন্বন্তরি কর মা প্রেরণ।' তারিণীর কৃপা-ধন্বন্তরিই কেবল ভবব্যাধি বিমোচনে সমর্থ।

কবি অমৃতলাল বসু সংসারকে হাট বলিলেন। বড় অবেলায় তাঁহার হাট ভাঙিয়া গিয়াছে। ভরা হাটের হেটোর দল একে একে চলিয়া গিয়াছে। কেবল তিনিই পাপের তরীকে শিরে করিয়া পড়িয়া আছেন। এদিকে রবি অস্তাচলগামী, রাত্রির অন্ধকার কালোকালিমায় এই নামিল বলিয়া, পরপারে যাইবার জন্য তাঁহার প্রার্থনা—'অবেলায় হাট ভাঙ্‌লি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।'

শাক্তপদসাহিত্যরূপায়িত এই রূপকনিচয় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর নাট্যকার কবি কৃষ্ণমিশ্র যতির 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক স্মরণ করাইয়া দেয়। এই নাটকে বিবেক, ভক্তি প্রবোধ, মোহ ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

ভক্তের আকূতি-নিবন্ধ রূপকরাজি লোকজীবন-সম্ভূত। পাশাখেলা, ভানুমতীর ভোজবাজি, ধূলাখেলা,ভববৃক্ষে কলুর বলদ, ভবকূপ, ভবজলধি, ভবব্যাধি ইত্যাদি আমাদের নিত্যদিনের সংসারের পরিচিত প্রচলিত ভাবনা। শাক্তপদকারবৃন্দ আমাদের লোকপ্রচলিত বিষয়বস্তুকে রূপকের মর্য্যাদা দিয়া তত্ত্বগূঢ় ভাবরাশির সহজবোধ্যতা সাধন করিয়াছেন, বিধান করিয়াছেন অকৃত্রিম সৌন্দর্য-সাধনা। ভক্তের আকূতিতে শ্যামা-জননীর নিকট অনুযোগঅভিযোগের মধ্য দিয়া শাক্তমহাজনবৃন্দের হৃদয়ের আবেগ যেমন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে ভক্তের আকূতি-ব্যবহৃত রূপকাবলীতে তাঁহাদের বাস্তবমুখী মন তেমনি কাঠিন্যের স্পর্শে স্তব্ধ হইয়া আছে। সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এ উদাহরণ কেবল বিরল নহে, অতুলন।

॥ 'মনোদীক্ষা'র কয়েকজন পদকর্তা ও তাঁহাদের পদ-প্রসঙ্গ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাক্তপদাবলী চয়নে 'মনোদীক্ষা' পর্য্যায়ের পদগুলি 'ভক্তের আকূতি' পর্য্যায়ের পরে স্থান পাইয়াছে। 'মনোদীক্ষায়' প্রায় চল্লিশটি পদের সমাহার। 'ভক্তের আকূতি'তে আমরা দেখিয়াছি সংসারের মায়ামোহে আবদ্ধ ও ভ্রান্ত ভক্তকবিবৃন্দ যখন নিজ নিজ ভ্রান্তি, ভক্তিসম্বলশূন্যতা বুঝিতে পারিয়াছেন তখন তাঁহারা শ্যামা মায়ের নিকট আকূতি নিবেদন করিয়াছেন। 'মনোদীক্ষায়' শ্যামা নামে মনকে দীক্ষা-দান বা মনের শ্যামা নামে দীক্ষাগ্রহণ উপজীব্য হইয়াছে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী, রামকুমার নন্দী মজুমদার, রসিকচন্দ্র রায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন কবিরত্ন, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দ্বিজকালিদাস প্রমুখ কবিসমাজ মনোদীক্ষা পর্য্যায়ের পদগুলি রচনা করিয়াছেন।

সংসারের কাল-বিছানায়, কামনা-কান্তাকে নিবিড় আসঙ্গে রাখিয়া, আশার

চাদর গায়ে দিয়া শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই বিষয়-মদে মত্ত মন সময় কাটাইতেছে। রামপ্রসাদ বলিতেছেন 'ভ্রমেও কালী বলনা'। এবার যে কালী বলিবার সময় আসিয়াছে। আত্মধিক্কারে নিজেকে সচেতন করিবার প্রয়াস :

অতিমূঢ় প্রসাদরে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতন পাবে না ॥

তাঁহার মন কালী কেমন তাহা চাহিয়া দেখে নাই। মাটির মূর্তি গড়াইয়া, ডাকের গহনা দিয়া সাজাইয়া, আলোচাল-বুটভিজানার প্রসাদ দিয়া, মহিষ-ছাগল ছানার নৈবেদ্যে ভ্রান্ত-মন জগৎপালয়িত্রী শ্যামাজননীর পূজা করিতে চায়। মনকে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইতে চান রামপ্রসাদ :

প্রসাদ বলে, ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তার উপাসনা।
তুমি লোকদেখানো করবে পূজা, মা তো আমার ঘুষ খাবে না ॥

স্বকৃতভুল বুঝিতে পারিয়া কবি কখনো ক্লান্ত হইয়া পড়েন। পরক্ষণেই সান্ত্বনা দেন মনকে—কালী নামের ধ্যানে সব অপরাধ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। অহঙ্কার বর্জিত পূজাই শ্যামাজননীর পূজা।

মন, তোর এত ভাবনা কেনে !
একবার কালী ব'লে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে ।।

সকলের অগোচরে এই যে পূজারীতি—ইহা প্রকৃত সাধক জন-বেদ্য ও সাধ্য। রামপ্রসাদ সেন সেই শ্রেণীর সাধক ছিলেন, বলা বাহুল্য। পদটির শেষ-বাক্য লক্ষণীয়—"তুমি 'জয় কালী' বলে দেও করতালি, মনে রাখ সেই শ্রীচরণে।"

কবির মোহ যখন অবসিত হয় তখন সম্বিৎ ফিরিয়া পান। সম্বিৎ-প্রাপ্ত কবির মনকে সম্বোধন করিয়া লেখা :

ভাব না কালী ভাবনা কিবা
ওরে মোহময়ী রাত্রিগতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা।

কখনো রামপ্রসাদ মনকে শুকপাখীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন দেহ-পিঞ্জরে কালী-নাম জপ করিবার জন্য তাহাকে রাখিয়া ছিলেন। অথচ তাঁহার মনশুকপাখী ফাঁকি দিল, কালী-নাম বলিল না। তিনি মনকে কালী-নাম জপিবার পরামর্শ দিতেছেন :

শিবদুর্গাকালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি ॥

রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তের শ্যামানামে মনোদীক্ষা। কপট ভক্তিতে শ্যামাপ্রাপ্তি হয় না, চাই কৈতববিবরহিত শ্যামানিষ্ঠা। কবি একপদের শেষাংশে সেই সারকথা লিখিলেন :

কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে
কালীনাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥

লোকলোচনের বাহিরে, ষড়রিপুকে বর্জ্জন করিয়া কমলাকান্তের শ্যামা-রাধনা। অজ্ঞানকে দূরে রাখিতে হইবে, প্রহরীরূপে নিকটে থাকিবে জ্ঞান। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কমলাকান্তের নিগূঢ় অনুভূতি 'মনোদীক্ষায়' প্রকাশ পায় ঃ

আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥

'মনোদীক্ষা'য় কমলাকান্ত আবার কখনো অনুযোগ করেন শ্যামা মাকে। মনের দোষ-ভ্রম ধরিলে চলিবেনা, চলিবেনা মিথ্যা নিন্দা করা। যাদুকরী তাহাকে যেমন করাইয়াছে সে তেমনি করিয়াছে ঃ

মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে?
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥

তবে যে-জন আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে সেই বিভূতি-পূর্ণা জননীর নিকট, তাহার কোনো ভাবনা থাকে না ঃ

তবে যে কমলাকান্ত ও-চরণে প্রাণ স'পেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার ক'রেছে ॥

রামকুমার নন্দী মজুমদার সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য মায়া-মোহের, স্বজন-পরিজনের সংসার পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন। শ্যামা-জননীতে সকল ভার অর্পণ করিতে চাহিতেছেন। মনকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার উক্তি 'মনোদীক্ষা'য় ঃ

যদি মন এবার ভব-পারাবার চাহ তরিবার
বলি বারেবার ছাড় পড়িবার
দেহ অনিবার জননীতে ভার তারিতে কুমারে ॥

বাসনার বিনাশে মনের মালিন্য দূর হইয়া যায়। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় অন্য অন্য কবিগণের মতো মনকে বিষয়-বাসনা-বর্জনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন ঃ

বাসনাতে দাও আগুন জেবলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটি ॥

প্যারীমোহন কবিরত্নের উপলব্ধি অন্তিম সময় আসিতে আর বিলম্ব নাই। 'চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে'। এতকাল শ্যামা-জননীকে ডাকা হয় নাই। আর দেরী করিলে চলিবে না। তিনি লিখিলেন 'এই বেলা মন নেরে ডেকে নীলাব্জবরণী মাকে'। কালী হইলেন শ্যামা—নীল-শতদলবর্ণা।

সকলেরই মূলে এই শ্যামা। মন বিষয়ান্তরে মত্ত হইয়া আছে, শ্যামা জননীকে ভুলিয়া গিয়াছে। দেওয়ান রামদুলাল নন্দী বলিতেছেন মন কি ভুল করিয়াও বিষয়-বাসনা বিসর্জন করিতে পারে না? মনের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ 'মূলের সন্ধান কর'।

দ্বিজ কালিদাস বলিয়াছেন দিন, মাস, বৎসর-ক্রমে বহুকাল অতিবাহিত হইল, অথচ কালী-ভজনার কাল তিনি পাইলেন না। এদিকে কালী-ভজনা-

ব্যতীত মহাকালকে যে জয় করা হইবে না। তিনি তখন মনকে কালী-ভজিবার প্রতিকূলতা করিতে নিষেধ করিতেছেন—

মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,
আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে ?

পদকর্তা রসিকচন্দ্র রায় কালী-ভজনার জন্য আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিতে দিতে চাহেন না। মনকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিলেন 'এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নেরে মুক্তির দাওয়া'।

'মনোদীক্ষা' পর্য্যায়ের পদগুলিতে কখনো শব্দের খেলা, কখনো শব্দের সরল-প্রকাশ। এই বিভাগের রচনায় যমক-শ্লেষ-রূপকের প্রাধান্য। প্রায় অধিকাংশ পদে রূপকাশ্রয় থাকিলেও সকলেরই বক্তব্য একটি—শ্যামাজননীর নামে মনকে দীক্ষিত করা। রূপক হইলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা লৌকিক জগৎ হইতে সংগৃহীত। মন-ঘুড়ি, কাল-বিছানা, আশার-চাদর, বিষয়-মদ, সাধনরূপ গ্রাবু খেলা, মায়া-নিদ্রা, কালীনামের টেক্কা, সমাধি-ছক্কা, মুক্তি-পাঞ্জা, মানব-জমিন, মন-সেতার, তারা-পাখী ইত্যাদি তাহাদের উদাহৃতি।

॥ শাক্তমহাজনগীতি ঃ ইচ্ছাময়ী মা ॥

শাক্ত পদাবলীর বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা প্রভৃতি বিভাগের মতো একটি বিভাগ 'ইচ্ছাময়ী মা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীযুত অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত শাক্তপদাবলীচয়নে 'ইচ্ছাময়ী মা' পর্য্যায়ের আয়তন অতীব সীমিত। মাত্র চারিটি পদ এই অংশে সংকলিত হইয়াছে। একটি রামপ্রসাদের, একটি রসিকচন্দ্র রায়ের, একটি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর, অন্যটি অজ্ঞাত কোনো পদকর্তার। যে পদটি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর সেই পদটি বিষয়ে সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্র রায় লিখিতেছেন, "সংগীত সন্দর্ভ" নামক পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই পরিচিত।

ভক্ত শাক্ত কবিগণের অভিমত এই যে, জগতের সমস্ত কার্য্যই শক্তি দেবতার ইচ্ছাক্রমে সংঘটিত হইতেছে। সে ইচ্ছা অনধিগম্য, অবোধ্য বলিয়া মানুষের নিকট প্রতীত হয়। এই ভাবধারা যে-পদসমূহে প্রকাশিত তাহা 'ইচ্ছাময়ী মা'তে সংকলিত হইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি কবিতায় জীবনদেবতা অন্তর্য্যামীর সর্বাতিগ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিয়া সেই ইচ্ছানুসারে তিনি পরিচালিত হইয়াছেন—জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট

যিনি জীবনদেবতা অন্তর্যামী, শাক্তপদকারগণের নিকট তিনি শক্তিদেবতা শ্যামা-তারা।

রামপ্রসাদ সেন বিরচিত পদটি রূপকাশ্রয়ী। তাহার আরম্ভভাগ বিষয়বস্তুর সংকেত দ্যোতিত করে।

'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভবসংসারে বাজারের মাঝে'।

এই ঘুড়ি উড়ানো অর্থে জীবজগৎকে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মায়া-মোহ-আকর্ষণের মধ্যে ফেলিয়া পরিচালনা করা। রামপ্রসাদ পদটির শেষাংশে লিখিতেছেন—

প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥

ভক্তির দাক্ষিণায় এই বিষয়াসক্তির ঘুড়ি ভব-সংসার-সমুদ্রের পরপারে উড়িয়া পাড়িয়া যাইবে, ভক্তকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

পদরচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়ের পদে 'ইচ্ছাময়ী' কথাটি উল্লিখিত আছে। তারা ইচ্ছাময়ী যাঁহাকে যেমন ইচ্ছা তাঁহাকে তেমন করান। কাহাকে ডুবাইয়া দেন, কাহাকে বা পারে লইয়া যান। কালকেতু, শ্রীমন্ত প্রভৃতি ভাগ্যবানের দল তারার অনুকূল ইচ্ছায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন।

'ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে।
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও নয় নে যাও পারে॥
একবার মুখে দুর্গা ব'লে, কালকেতু তোর চরণ পেলে।
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে পায়না দেখা যুগান্তরে॥
শ্রীমন্তে কমল বনে দেখা দিয়া দাও শ্মশানে।
আবার দয়া করে পরক্ষণে, চরণে রেখেছ তারে॥'

কবি ইহা অনুভব করিয়াই জীবনের শেষ দিনে ইচ্ছাময়ীর চরণতলে শয্যা পাতিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—'শ্রীচরণে দিব তল্প, জীবনের শেষ বাসরে।'

দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর পদে ইচ্ছাময়ী তারার সমুল্লেখ রহিয়াছে। তিনিই কেবল অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মদমত্ত হস্তী পঙ্কে জড়াইয়া পড়ে, চলচ্ছক্তিরহিত পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, কেহ ইন্দ্রত্ব পায়, কেহ হয় অধোগামী।

'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দেও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি।
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি॥'

পদটির জনপ্রিয়তা অসাধারণ। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি অলংকারও

উজ্জ্বল। এই পদটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার মতো হিন্দুগণের পরমানন্দ সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ মাধবের কৃপাভিক্ষা স্তব ঃ

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥'

কলিতে কালী ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। 'কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ কালী, কলৌ গোপাল কালিকা' এবং 'সর্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা'।

উপরের 'সকলি তোমারই ইচ্ছা' পদটির সংগে মিলাইয়া পড়িবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে নিবন্ধ 'অন্তর্যামী' কবিতা হইতে কিছু অংশ তুলিয়া দিলাম ঃ

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা, আপনজনারে
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

অজ্ঞাত পদকারের রচনায়ও 'ইচ্ছাময়ি' সম্বোধন দেখি। শক্তি দেবতার মায়াতে জগতের সকলেই মোহিত, সারাজগৎ তাঁহাতে বর্ত্তমান—

'জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে
মোহিত জগতজন।
রবি-শশী-তারা, আজ্ঞাকারী তারা
সদা নিয়ম করে পালন।'

পদটির শেষ পঙ্ক্তি চতুষ্টয়ে কবির বক্তব্যের স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়—

'ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়।
তুমি নিয়ে যাও যে পথে. আমি যাই মা সে পথে
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ॥'

শাক্তমহাজনগণ-বিরচিত অন্যান্য বিষয়ক গীতিসমূহের মতো 'ইচ্ছাময়ী মা' বিষয়ক পদবৃন্দও সহৃদয় ভক্তসমূহের আনন্দ বিধানে সমর্থ। শক্তিদেবতার প্রতি ভক্তিনিবন্ধ কবি-অন্তর ইহাতেও পূর্ণ প্রকাশিত। সমানধর্মা পাঠকসঙ্ঘ এই মহাজনগণের মতো সর্বশক্তিময়ী তারাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতে পারিবে।

॥ শাক্তপদসাহিত্যে শক্তিদেবতার রূপ ও কবিমন ॥

ভাবিতে অবাক লাগে, যে-জাতি রাধাকৃষ্ণরূপে বিভোর হইয়া মৃদঙ্গ করতালে কীর্তনে মজিয়াছিল, সেই জাতিই শক্তিদেবতা কালী দুর্গার রূপে বিভোর হইয়া খঞ্জনী-একতারার শক্তিগানে মাতিয়াছিল। তাহাদের কল্পনায় শক্তিদেবতার রূপবৈভব যেমন বিচিত্র, যে-মনে সেই কল্পনা স্থান পায়, সেই মনও কম বিভাবনাময় নয়। বাঙ্গালীর কাছে সেই শক্তিদেবতা কালী বা দুর্গার বড় পরিচয় তাঁহারা জননী, জগজ্জননী।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যের চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মত শাক্তসাহিত্যে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত। রামপ্রসাদ যে শক্তি-দেবতার কল্পনা করেন, তাঁর 'করে অসি মুণ্ডমালা'। এবং 'মায়ের আছে তিনটি নয়ন চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন'। কবি শুনিয়াছেন 'মার বরণ কালো।' অতএব কালী অসিধারিনী মুণ্ডমালিনী এবং ত্রিনয়নী। কালীর এই রূপকল্পনা অশিবনাশের উপযোগী ভয়ংকর। ইনি আসব পানে উন্মত্তা হন। চরণ-ভঙ্গে স্খলন দেখা দেয়। কেশপাশ হয় বিকীর্ণ। সমরভূমিতে লক্ষিত হয় গতির দ্রুততা। বিরাটকায় হস্তি-বৃন্দ তাঁহার গ্রাস।—

'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিতচিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাশে॥'

এখানে রামপ্রসাদ গীতি-কবি। তিনি জানেন এই বামা কে, তবু তাঁহার বিস্ময় ও প্রশ্ন 'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে'। রামপ্রসাদ যখন কালীর কালো শরীরের রুধির-শোভায় কালিন্দীর জলে কিংশুক ফুলের উপমা টানিয়া বসেন, 'কে রে কালীয় শরীরে রুধির শোভিছে কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে' তখন রোম্যাণ্টিক মনের সৌন্দর্য্যপিপাসা প্রকট হয়। রামপ্রসাদের যে-মন জননীর দানব দলনী মূর্তির কল্পনা করে, সেই মনই তাঁহার মনোমোহিনী মূর্তির ছবি আঁকে। সেখানেও তাঁহার গীতিকবিসুলভ সবিস্ময় প্রশ্ন, 'কে রে নীল কমল শ্রীমুখমন্ডল অর্ধ চন্দ্র ভালে প্রকাশে'। মুখমণ্ডল নয়, নীল কমল। ললাট-ফলকে অষ্টমীর চন্দ্রলেখা। পরমুহূর্তেই কল্পনার পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন তাঁহার জননী নীলকান্তমণি 'কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত নখর নিকর তিমির নাশে'। কবিমন অস্থির হইয়া উঠে। সেই একই পদে তাঁহার কল্পনা গগনের সৌদামিনীসঙ্গিনী হয়। কালীদেহের লাবণ্যকে তড়িৎঘটা বলিয়া বর্ণনা করে—'কেরে রূপের ছটায় তড়িৎঘটায় ঘনঘোর রবে কাঁপে তরাসে'। অন্য পদেও কালীর মনোমোহনরূপ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন। সে-রূপে চিত্তকে ভ্রান্ত করে। দৈত্য দলনা ললনাকে নলিনী বলিয়া ভুল হয়। ভুল হয় চঞ্চল বিদ্যুতের সমবায় বলিয়া, ভুল হয় মরকতমণির দ্যুতি বলিয়া।

'ও কে রে মনোমোহিনী
ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণিমরকত কান্তি ছটা
একি চিত্ত ছলনা দৈত্যদলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥

'ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা' শুনিবার সংগে সংগে বৈষ্ণব পদাবলীর 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়' মনে পড়ে। গোবিন্দ দাস শ্রীমতী রাধার মুখে শ্যামকৃষ্ণের রূপ প্রসঙ্গে কথাটি বলিয়াছেন। শ্যাম-শ্যামার ঢল ঢল রূপ লাবণ্য উক্ত কবিকে বিমুগ্ধ করিয়াছে।

কমলাকান্তের শক্তি রণ-রঙ্গিনী মুক্তকেশী, দিগম্বরী ভয়ংকরী এবং অসি-হস্তা। অঙ্গে তিমির বর্ণ, বয়সে নাবীন্য। সে নবীনা ষোড়শী গলায় পরিয়াছেন মুণ্ডের মালা, মুখে ধরিয়াছেন স্মিতহাস্যের সুষমা। প্রকাশ-শৈলীতে গীতিকবির বিস্ময়মিশ্র প্রশ্ন ঃ

রঙ্গে নাচে রণমাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হয়ে দিগম্বরী ভয়ংকরী করে ধরি তীক্ষ্ণ অসি ॥
কে রে তিমির বরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥

কোন রচনায় আবার কমলাকান্তের স্থির প্রতীতি ও প্রত্যয়। নবজলধর-বর্ণা রমণীকে তিনি চিনেন। তাঁহার কালোরূপ দেখিয়া আঁখি জুড়ায়। দানব-দলনীর অঙ্গে রুধির স্পর্শ থাকিলেও ভয় আসে না। মোহন সাজও যে কম নাই। 'কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নুপুর পায়।' তাঁহার চরণযুগল বিকচ কমলের উপমা। সংসার-দাবদাহ সেখানে প্রশান্তি লাভ করে কমলাকান্তের ভক্ত কবিমন সেই চরণের ভ্রমর হইতে চায়—

'অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায়
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ॥'

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শক্তি শ্যামা মা। তিনি হর-হৃদয়ের তুষারধবল হ্রদে বিকশিত এক নীলপদ্ম। রূপ তাঁহার রাশি রাশি অন্ধকার। কিন্তু সেই রূপের জ্যোতিতেই অন্ধকার দূর হয়। তাঁহার দেহদ্যুতি বিমানবিহারিণী সৌদামিনীকে হার মানায়। ত্রিভুবনকে আলোকিত করে। উপমা, অনুপ্রাস, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলংকারের সন্নিপাতে, শ্রবণসুভগ শব্দসংযোজনায় পদটি মনোজ্ঞ এবং গীতিকাব্যোপযোগী।—

'তুষারধবলহ্রদে নীলিম নলিনী।
হরহৃদিমাঝে আমার শ্যামা মা জননী ॥
রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি।
উজ্জলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥'

শক্তি-রূপ রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের বিস্মিত প্রশ্ন লক্ষণীয়। তাঁহার একটি পদের প্রারম্ভিক পদচতুষ্টয় এই—

'কে রে বামা বারিদ বরণী তরুণী ভালে ধরেছে তরণী
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ অনুপ রূপ নাহি স্বরূপ
মদন নিধন করণ কারণ চরণ শরণ লয়॥'

মেঘরঙ্ রমণীর বয়স বেশী নয়। সে তরুণী, ললাটে তাহার শশিকলা। শশিকলা নয়, যেন তরণী। তাহার রূপ অপূর্ব এবং অনুপম। মদন নিধনের করণ কারণ যে শিব তিনি তাঁহার চরণাশ্রিত। সে রূপে ভীতিজনকতা নাই। কিন্তু এই পদেই কবি যখন বলেন—

'বামা হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে
হুহুংকার রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে
বিপক্ষ নাশিছে আসিছে বারণ হয়।'

তখন ভয় পাই। এরূপ যে আমাদের গৃহাঙ্গনের পরিচয়পরিচিতির মধ্যে নয়।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অংকিত জগজ্জননী শক্তিদেবতার রূপ কোথাও বীভৎস ও কোথাও ভয়ানক রসের আলম্বন বিভাব। একটি কবিতা এখানে তুলিয়া দিই—

'বিষম উজ্জ্বল জ্বালা বিভাষিত কপাল
খলখল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড শোভিত কর
ঘোর গভীর কাদম্বিনী বরণী, ভীমা ভুবনগ্রাসিনী।
অতি বিশাল বদন মণ্ডল।
লক্ লক্ রুধির লোলুপ-রসনা
রুধির-ধার স্নাত বিপুল দশনা,

অস্থিচর্মসার, কঙ্কালহার
বিভূষিত দিক্‌বসনা ব্যোমগ্রাসিনী
অতিক্ষীণ কটি বেষ্টিত নরকর কিংকিণী
মহাকাল কামিনী, উৎকট আসব পান মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী নরমাংসাশী
ঈশানমর্দিনী টলটল মেদিনী।
ভয়ংকরী ভীষণা শ্মশান বাসিনী।'

গিরিশচন্দ্রের আর একটি কবিতা ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছবি। সেখানেও জগজ্জননীর উগ্ররূপ, গভীর নিনাদ, অশিবনাশিনী মূর্ত্তি।—

'উর্দ্ধ জটাজুট গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব বিমর্দ্দিনী॥
দনুজহৃত্রাসত্রাস লকলক রসনা,

অসুর-শির-চুর, ভীষণ দশনা
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া টলটল মেদিনী ॥'

কিন্তু জগজ্জননীর রূপে, ভয়মিশ্রিত মাধুর্যের সন্ধান করে গিরিশচন্দ্রের কবি-মন এমন রূপের বর্ণনাও আমরা পাই। সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্যান্তরে পলায়নী মনোবৃত্তি কবি গিরিশচন্দ্রের গীতিকবিসত্বার।

উলঙ্গিনী কালিকা মদমত্তকরিণী। নিবিড় ও দীর্ঘ-বিলম্বিত কেশকলাপ চরণে চরণে বন্ধন খুঁজিতেছে। নখদ্যুতিতে অরুণ-কিরণ-ভ্রান্তি। পা ফেলিলেই মনে হয় পদ্ম বিকশিত হইতেছে। সে পদ্মপরিমলে মধুপবৃন্দ গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। জগজ্জননীর বিরামবিহীন অট্টহাস্যে আকাশের বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণপুঞ্জে উজ্জ্বল আলোকের ঝলকানি। অলঙ্করণে ও শব্দসন্নিবেশে মায়ের মধুর ভয়ানক রূপ ঃ

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায় ॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে
মকরন্দ গন্ধ অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায় ॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালোবরণ ঘটায়।

শক্তিবিষয়ক গিরিশচন্দ্র-বিরচিত এমনও কবিতা আছে যেখানে মাতৃরূপে অবিমিশ্র মাধুর্য্য ও সস্নেহ প্রশ্রয় লক্ষিত হয়—

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন
কত রাঙ্গা রবি শশী, রাঙ্গা নখে পড়ে হায়।
পদ্মভ্রমে পদতলে পড়ে আল দলে দলে
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥'

মোট কথা জগজ্জননী শ্যামার প্রতি ভক্তি অনুরাগে গিরিশ-হৃদয় হইয়াছে রাঙ্গা। শক্তিরূপপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত কবিতা উৎকলনযোগ্য।—

'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক আঁধার করে মাতিল দিক্‌বসনা
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙ্গারসনা
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে
কালো কেশ উড়িল আকাশে
রবি, সোম লুকালো তরাসে
রাঙ্গা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥'

রবি-উপলব্ধিতে এক শক্তি চরাচর ব্যাপিয়া বিশ্বের ভুবনেভবনে অবারণ-নিবারণ অসংকোচ-নিঃসংকোচ ক্রীড়ানৃত্যে বিভোর। সেই শক্তির প্রেরণায় আমরা যত প্রাণী সকলেই সেই ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিয়াছি। নিরাবরণা সেই শক্তি এমনই আবেশে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতেই পারি না। তাঁহার রক্ত রসনার বহ্নিশিখায় সকলেই 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।' সেই শক্তির ঝটিকামত্ততায় প্রকৃতিলোকে সাধিত হয় পরম বিপর্যয়। উর্বশী-শক্তির কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবনকে যৌবনচঞ্চল দেখিয়াছি। এখানে প্রলয়কারিণী শক্তির 'ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।'

বাঙ্গালীর শক্তিরূপধ্যান ও বন্দনা যুগ যুগ বাহিত। ভিন্ন ভিন্ন কবি-মনের স্পর্শলাভ করিয়া শক্তি দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন বিচিত্র রূপ-রুচিরা।

॥ শ্যামাগানে শ্যামভাবনা ॥

বাঙ্গালী হৃদয়ের যে ভক্তিভাবুকতা বৈষ্ণবগীতিকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে সেই ভক্তিভাবুকতাই শাক্তগীতিকাব্যের উদ্ভব-উৎস। যে জাতি মৃদংগকরতালে রাধাকৃষ্ণগানে মাতোয়ারা, সেই জাতিই খঞ্জনী-একতারায় শ্যামাগানে বিভোর। আর এমন এক সময় আসে যখন শ্মশান ও মাধবীকুঞ্জের ভেদ ঘুচিয়া যায়, বিল্বদল ও তুলসীপত্রের পার্থক্য থাকে না, রক্তচন্দন ও হরিচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, অস্থিচূর্ণ ও কুঙ্কুম প্রভেদ হারাইয়া ফেলে, খঞ্জনী-মৃদংগ-একতারা-করতাল উদ্দাম হইয়া একত্র বাজিতে থাকে, আর সেই বাঙ্গালীর হৃদয়ভূমিতে শ্যাম-শ্যামা একাকার হইয়া যান।

বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের যে ভূমিকা ও স্থান, শাক্ত পদাবলীসাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের সেই ভূমিকা ও স্থান। একটি পদে রামপ্রসাদের কল্পনার দূরে বিসার লক্ষ্য করি। তাঁহার মনে আসে দ্বাপরে নন্দরাণী যশোদার মণিময় কুট্টিমে নীলমণি কানুর মোহন নৃত্য, সখীসমাবৃত রাসমণ্ডলে কৃষ্ণের ললিত ত্রিভঙ্গ রাসেশ্বর মূর্তি, শিঙ্গাবেণুরবে বলাই-সহচর কানাইর গোধনচারণ, বংশীস্বনে কালিন্দী-তরঙ্গের উজানগতির কলপ্রবাহ, শ্রীদাম-সখার সংগে তা-থেইয়া নর্তনে নূপুরনিক্বণ এবং আরো কত কি যা ভক্তজনের হৃদয়-রসায়ন। রামপ্রসাদ বলেন তাঁহার করালবদনী মুণ্ডমালিনী শ্যামা যেন আবার সেই সেই রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দেখা দেন। তিনি শ্যামমূর্তি লুকাইয়া শ্যামা হইয়াছেন। অসির স্থান গ্রহণ করুক বাঁশী, মুণ্ডমালার পরিবর্তে আসুক বনমালা, তাঁহার হৃদয় হইবে বৃন্দারণ্য। গোপীমনোমোহনরূপ দেখিবার সাধ তাঁহার অনেক ঃ

'যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী ?
একবার নাচো গো শ্যামা—
হাসি বাঁশি মিশাইয়ে মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা প'রে
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে আড়নয়নে চেয়ে
গজমতি নাসায় দুলুক ;
যশোদা সাজানো বেশে অলকা আবৃত মুখে
অষ্টনায়িকা, অষ্টসখী হোক,
যেমন ক'রে রাসমণ্ডপে নেচেছিলি
হৃদিবৃন্দাবনমাঝে ললিত ত্রিভঙ্গঠামে
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মনভোলানো বেশে
তেমনি তেমনি তেমনি করে
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে,………'

অনুরূপভাব নবাই ময়রার একটি শ্যামাগানে প্রকাশিত। ভক্তকবি নবাই ব্রজধামের রাসমন্দির দেখিতে পান নাই। হৃদয়কে রাসমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন তিনি। সেই রাসমঞ্চে যেন শ্যামা শ্যামের ত্রিভঙ্গরূপে তাঁহাকে দেখা দেন। একা আসিলে চলিবে না। শ্রীমতী রাধাকে বামে আনিতে হইবে। নরকরের কটিআবেষ্টনী দূর করিয়া পীতাম্বর পরিতে হইবে, শিরোমালা খুলিয়া গলে পরিতে হইবে বনফুলের মালিকা—

'হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হয়ে বাঁকা দে মা দেখা
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নরকর কটিবেড়া, খুলে পর মা পীত ধড়া
মাথায় দে মা মোহন চূড়া চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নরশিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।'

পদকর্তা কমলাকান্ত। শাক্তপদসাহিত্যে রামপ্রসাদের সমগোত্রীয় কবি। যেই কালী সেই কৃষ্ণ বলিয়া মনকে বুঝাইয়া তিনি বলিতেছেন কালীকে কেবল নারী ভাবিলে চলিবে না, তিনি পুরুষবেশেও আবির্ভূত হন। যিনি বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী বেশে দনুজদলনী তিনিই ব্রজপুরে শ্রবণ-লোভন বংশীর রবে গোপাঙ্গনাগণের চিতচোর। তিনি সৃজনপালনলয় করেন, আবার কখনো নিজের বিস্তৃত মায়ায় নিজেই হন আবদ্ধ—

'জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥

হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥'

এই গানের পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় ঃ

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্বতী কখন শ্রীমতী
কখন রামের জানকী হয়।
হ'য়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দানবচয়ে কর সভয় ॥
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ॥

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, এই কালীই বৃন্দাবনের নটবর-বেশধর রাসবিহারী কৃষ্ণ। পূর্বের নিরাবরণতনুতে তখন পীত বসন; আলুলায়িত কেশদাম চূড়ার একটি বন্ধনে বাঁধা, বদনে বঙ্কিম বংশী। পূর্বে গৌরীরূপে কটাক্ষ-বিক্ষেপে যিনি বিরূপাক্ষ ত্রিপুরারিকে মুগ্ধ করিয়াছেন তিনিই এখন শ্যাম-সুবলিত শরীরে নয়নভঙ্গে ব্রজপুরী ভুলাইলেন। ত্রিভুবনত্রাস ঘন অট্টহাস বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চারু অধরোষ্ঠের স্মিতহাস্যচ্ছটায় ব্রজবালার মন ভুলাইয়াছেন। একদা শ্যামারূপে শোণিতসাগরে যিনি আনন্দে নাচিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অগাধ প্রীতি যমুনার সুনীল সলিলসঞ্চয়ে ঃ

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে এ কথা বিষমভারি।
নিজতনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীতধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে মোহন করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল তনুরেখা ভাল ভুলালে নগরী নয়ন ঠারে ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনত্রাস, এবে মৃদুহাস ভুলে ব্রজকুমারী।
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা এবে প্রিয় তব যমুনাবারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি ॥

এই রামপ্রসাদ শ্যামামায়ের বহুরূপের কল্পনা করিয়া 'মা বসন পর। বসন পর, বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি'।—পদের একস্থলে বলিতেছেন,

—'বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোপিনী গো ॥' 'আমি তাই অভিমান করি আমায় করেছ গো মা সংসারী'—পদে রামপ্রসাদ রাধাকৃষ্ণের দানলীলা স্মরণ করিয়া বলিলেন—'ও মা বিনা দানে মথুরাপুরে যাননি সেই ব্রজেশ্বরী'।

দেওয়ান রঘুনাথ 'তারা তুমি কতরূপ জান ধরিতে'—গানের একস্থলে গাহিলেন ঃ তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ। গোবিন্দ চৌধুরী 'ওঙ্কার মূর্তিতে মন জান না কি উহারে'—গীতের একস্থলে লিখিলেন, আজিকার দুর্গারূপধারিণী দেবী আগামী কাল শ্যামসঙ্গিনী রাধারূপে দেখা দিবেন।

'আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে।
কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে ॥'

পদকার শম্ভুচন্দ্র রায় এক শ্যামা বিষয়ক গানে লিখিতেছেন—

'তীর্থবাসী হওয়া মিছে তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনে রে মন কোন তীর্থ কোথায় আছে ॥'

এই গানেই রাসলীলার উল্লেখ করিয়া বলিলেন রামের উদ্ধার কারিণী যে কালী কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের উদ্ধার কারিণী মায়ারূপ সেই কালীই—

'দ্বারকা মথুরা পুরী শ্রীবৃন্দাবন আদি করি
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন কংস রাজা বধে জীবন
মায়ারূপে হয়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে ॥

অজ্ঞাত এক পদকর্তা ভাবিয়া পান না-'জানিনা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)!' কারণ শ্যামার বিভূতি অনেক, অনেক রূপ। সেই রূপাবলীর মধ্যে 'কভু শ্যামসোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে'। শ্যামা কখনো শ্যামপ্রেম-ভাগিনী রাধিকা, কখনো রাধিকার মানভঞ্জনে চরণে লুণ্ঠিত শ্যাম।

এই একই ভাব দাশুরায়ের 'যে ভাবে তারাপদ ঘটে কি তার আপদ' পদের শেষ পঙ্‌ক্তি, 'কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী।' সেই শ্রীমতী রাধা সত্যই মন্দাকিনী। নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের আনন্দরসমন্দাকিনী বৃষভানুনন্দিনী রাধা। দেওয়ান রামদুলাল নন্দী 'জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি'— পদটিতে বলিলেন বৈরাগী বৈষ্ণবের নিকট তারা রাধিকাই।

'শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবেরই উক্তি মা।
গৌরী বলে সূর্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা জি ॥'

সমস্যার সমাধান করিলেন রামপ্রসাদ। হরি-হরে, বৃন্দাবন-কাশীধামে, বাঁশি-অসিতে, যমুনা-জাহ্নবীতে, শ্যাম-শ্যামায় প্রভেদ দেখা মনের ভ্রম, চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধ হওয়া।

'ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত'

হরি হর তোর এক হলোনা।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝনা,
কেবল ভব চক্রে বেড়াও ঘুরে
করে আত্ম প্রতারণা
অসি-বাঁশীর মর্ম বুঝে
(তোমার) কর্ম করা আর হোলো না।
যমুনা আর জাহ্নবীতে
একভাবে মনে ভাব না।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এযে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর
চক্ষু থাকতে হলে কানা ॥'

শ্যাম-শ্যামা যে অভিন্ন এই তত্ত্বের দুইটি সূত্র এই প্রসংগে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। (এক) কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা (দুই) সর্বেষাম্ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রীদেবতা। তাই শ্যামাগানে শ্যাম স্বতঃই আসিয়াছে। তত্ত্ব ব্যতীত কবিমনের রোম্যান্টিক দিক আমাদের নিকট উন্মোচিত হয় না। শাক্তপদকারবৃন্দ যুগযুগান্তরে রূপরূপান্তরের সন্ধানে ফিরিয়াছেন।

যে হিমালয়ের গহন কন্দরে গঙ্গোত্রী, সেই হিমালয়ের দুর্ভেদ্য দরীস্থলেই যমুনোত্রী। গঙ্গাই হউক, যমুনাই হউক, সাগরসঙ্গামিনী হইয়া অনন্ত অম্বুধিতে মিশিয়া গিয়াছে। শিবমৌলীবিহারিণী গঙ্গার স্রোতোধারায় অবিরত ধ্বনিত হইতেছে হর, হর, হর, হর। আর রাধাকুঞ্জ-বিপ্লাবিনী যমুনার তরঙ্গ প্রবাহে সতত শব্দিত হইতেছে হরি, হরি, হরি, হরি। কিন্তু উভয় প্রবাহেই আনন্দ বেদনার কলগীতির মুখরতা। বাঙ্গালীর ভক্তকবিচিত্তে আনন্দ-বেদনার প্রকাশ শাক্ত ও বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের সুধাসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

॥ শাক্তপদ-সাহিত্যে সুভাষিত সমীক্ষা ॥

বাংলাসাহিত্যের যে দুই শাখা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় ক্ষেত্রকে বিপ্লাবিত করিয়া গঙ্গাযমুনার মতো বহিয়া যাইতেছে সেই দুইটি হইল শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলী। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কবি রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুকবির ভাবনার ধারা শাক্তপদসাহিত্যের সুরতরঙ্গিনীকে কল্লোলিনী করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বারংবার সেই—পতিতোদ্ধারিণীর পূতসলিল-স্পর্শে নিজেকে ধন্য করিয়াছে, হইয়াছে সঞ্জীবিত।

বাঙ্গালীর মনের ভাষা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শাশ্বত সত্য হইয়াছে প্রকাশিত; তাই অন্তরের প্রীতিবিমিশ্র আগ্রহবশে শাক্তগীতিগুলির বহুপাঠ ও বহুশ্রুতি তাহার পঙ্‌ক্তিনিচয়কে সুভাষিতের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শাক্তসাহিত্যের জনপ্রিয়তা প্রাজ্ঞ-অর্বাচীনের বিভেদ ঘুচাইয়াছে, তাহার বাক্যাবলী জনসাধারণের মুখে মুখে সঙ্গীত ও আবৃত্ত হইয়া ফিরিয়াছে।

বাঙ্গালীর বাৎসল্য-ভাবনাই গৌরীকে কন্যার আসনে সমাসীন করিয়াছে, বঙ্গভূমি এবং গিরিপুরীর ভেদ দূর করিয়াছে। বৎসরান্তে তনয়াকে পিতৃগৃহে আনিতে হইবে। মেনা গিরিরাজকে পাঠাইয়াছেন কৈলাসমুখে, অপেক্ষা করিয়া আছেন অধীর প্রতীক্ষায়। বৈরাগী বাউলের দল খঞ্জনী-একতারা বাজাইয়া বাংলার গ্রামে গঞ্জে পথে ঘাটে সোনালী শরতের শিশির ধোওয়া ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে গাহিয়া ফিরিতে থাকে—

'গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী'

পদকার দাশুরায় যেন বঙ্গজননীর কোন প্রতিবেশিনী। দূর হইতে বন-সীমান্ত ছাড়াইয়া উমাকে আসিতে দেখিয়া কন্যাবরণের ত্বরা জাগাইতেছেন।

শাক্তসাহিত্যে ধৃত এই গীতের কথা কি বাঙ্গালী ভুলিবে! নবমীর অন্তে দুর্গার বিদায়।—বিজয়া। বাঙ্গালীর আনন্দের হাট যায় ভাঙ্গিয়া। সেই নবমী রাত্রি শেষ হইয়া যাউক, কোন্ বঙ্গবাসী বা চাহিবে! চিরকালের বাঙ্গালী মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালীর অন্তরের ভাবনাকে তাঁহার কবিতায় মুক্তি দিলেন—

'যেয়ো না রজনী আজি ল'য়ে তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।'

ভক্ত কবির হৃদয়ে সেই দুর্গাই হইলেন জগজ্জননী, জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া অকস্মাৎ কবি রামপ্রসাদের মনে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসে, তিনি যে চিন্ময়ী, গাহিয়া উঠেন—

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥

এই সম্বিৎ দৃঢ় হয়, যখন তাঁহার মনে আসে ত্রিনয়নী জগজ্জননীর যে নয়নত্রয় চন্দ্র সূর্য হুতাশনে গঠিত সেই নয়নত্রয় কোন কারিগর নির্মাণ করিতে পারিবেন। তিনটি তো দূরের কথা একটিরও নির্মাণ কি কাহারো সামর্থ্যে কুলাইবে! সেই পূর্ব পদে কবির প্রশ্ন না কি আত্ম-জিজ্ঞাসা—

মায়ের আছে তিনটি নয়ন চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন
কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ॥

শাক্তপদসাহিত্যের 'মা কি ও কেমন, শাখার' শক্তিদেবতা নগ্নিকা কালীর প্রতি রামপ্রসাদের এক বিনীত প্রার্থনা সকলের প্রার্থনা হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইতেছে। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি যে দেশকাল গোষ্ঠীর ঊর্দ্ধে, তাঁহার কবিতা তাই সার্বজনীন; তাহার পঙ্‌ক্তি তাই সুভাষিত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ॥

মা বসন পর
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি,

অনেক কথা বলার পর শেষে বলেন, যেখানে কারণ উল্লিখিত—

মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে—
দ্বিজরামপ্রসাদ হ'য়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো ॥

শ্যামভাবনায় ভাবিত শক্তিগীতিগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে—

এবং কমলা কান্তের—

জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয় ॥

গীত দুইটি বহু বিখ্যাত। 'কলো কালী, কলো কৃষ্ণঃ কলো গোপাল-কালিকা'। তবে বাংলার যে মৃত্তিকায় শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠে সেই মৃত্তিকায় বৈষ্ণব সাধনা কি করিয়া গড়িয়া উঠে—বিস্ময়ের বিষয়। বাংলা যেমন এক অদ্ভুত দেশ, বাঙ্গালী তেমনি এক অদ্ভুত জাতি। চিত্তের অভিনব রসায়ণে তাহারা বিষম ধাতুর বিবাহ দিয়াছে। কালী মিলিযাছে কালায়, গঙ্গা যমুনায়, হরহররব হরি হরি ধ্বনিতে, খঞ্জনী মৃদঙ্গে, বিল্বদল তুলসীপত্রে, রক্তচন্দন হরিচন্দনদ্রবে, অসি বাঁশীতে, জবা মাধবীতে। ভক্তজনের শরণাগতির মধ্যে কালীকালার, শ্যামা শ্যামের একাকার অদ্বয়রূপের অভিব্যক্তি। এ হেন সঙ্গীত বাঙালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে আকুল করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এইগুলিকে কেবল সুভাষিত বলিলে কম বলা হয়।

ভবযন্ত্রণায় কাতর ভক্তচিত্তের আকূতি শাক্তকবিবৃন্দের রচনায় বহুধা প্রকাশিত। এই সংসারের মায়ামোহময় বিবিধ বন্ধনে বাঁধা পড়ে মানুষ। কিন্তু একসময় উপলব্ধি করে এই সকল বন্ধন, যন্ত্রণাভোগ, বৃথা পরিশ্রম, অনর্থক প্রাণান্তকর কষ্টবরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। মানুষের সখেদ অভিব্যক্তিগুলি কবিকণ্ঠের বাঙময় প্রকাশনে সার্থক। শাক্তপদাবলীতে ইহা 'ভক্তের আকূতি' নামে সংজ্ঞিত। এই পৃথিবীর যাতনাব্যথিত মানবের যন্ত্রণামুক্তির অভিলিপ্সাকে রামপ্রসাদ বাংলার বিখ্যাত কলুর তেলের ঘানিতে চোখ বাঁধা বলদের উদাহরণে ব্যক্ত করিলেন ঃ

মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?

এই একই পদে শ্যামামায়ের নিকট কবির সাভিমান অনুযোগ ঃ

কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত ॥

বৃথা শ্রম তো ভূতের বেগার খাটা। সংসারের আকর্ষণে মানুষ মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হইয়া পুত্র-পরিবারের জন্য সবটাই খাটিয়া মরে। শ্যামার নাম পর্য্যন্ত লইতে ভুলিয়া যায়। লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাইয়া যখন দেখে, কোনো উদ্বৃত্তই দেখিতে পায় না। সেই অবস্থাকে রূপ দিয়া রামপ্রসাদ বলেন ঃ

মলেম ভূতের বেগার খেটে
আমার সম্বল কিছু নাইকো গেঁটে।

মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে যে আত্মীয়-স্বজনের জন্য নানা মিথ্যা, অন্যায়, ছল চাতুরী, পর্য্যাপ্ত পরিশ্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়াছিল সেই আত্মীয় স্বজন ভবমুক্তির কেহ নয়, তখন নিজেকে একান্ত নিরাশ্রয় ভাবে। রামপ্রসাদ নিরালম্ব হতাশাদীর্ণ মানুষের মানসিক পরিস্থিতিকে গানে প্রকাশ করিলেন। বলিলেন ঃ

বল মা আমি-দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।

তখন মা কালীর উপর কি অভিমানই না হয় ভক্তের। সে বিদায় চায় এই জগৎ হইতে। গীতিকার নরচন্দ্ররায় ঃ

যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নেই।
ভালয় ভালয় বিদেয় দেমা আলোয় আলোয় চলে যাই ॥

একসময় ভক্ত আত্মদোষ উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়। পাঁচালীকার দাশুরায় বলেন—

দোষ কারো নয় গো মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ॥

চতুর ভক্ত রামপ্রসাদ তো একবার শ্যামা মার ভক্তিরত্নভাণ্ডারের তবিলদারী খুঁজিলেন, নিমক হারাম নন, তাহাও সোচ্চারে বলিলেন—

আমায় দেমা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই শংকরী ॥

এই উদ্ধৃতিচয় যে সুভাষণের মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত, তা বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিজ্ঞাত সত্য।

পদকর্তা নবাই ময়রা যে গীতে শ্যামা মাকে শ্যাম রূপে শ্রীমতী রাধাকে বামে লইয়া নাচিতে বলিলেন সে গীত বাঙ্গালীর অতি প্রিয়। শ্যামাকে নাচিতে হইবে রাসমন্দিরে। একা নাচিলে চলিবে না। বামাঙ্কে বার্ষভানবী রাধা থাকিবেন সঙ্গিনী হইয়া। সে রাসমন্দির বৃন্দাকাননে নয়। ভক্তের হৃদয় সেই রাস-রস-ভূমি ঃ

হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
একবার হয়ে বাঁকা দেমা দেখা
শ্রীরাধারে বামে লয়ে ॥

শ্যামা রূপে নাচিবার স্থান আছে। শোকদুঃখ-যন্ত্রণার চিতাগ্নি যে ভক্ত-চিত্তে অবিরত জ্বলিতেছে সেই ভক্তচিত্ত শ্যামা মার নৃত্যস্থলী ঃ

শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

কৃষির দেশ বাংলাদেশ। রামপ্রসাদের কৃষিরূপক শ্যামাসংগীত কিষাণেরও মুখে মুখে ফিরে। সেখানেও কৃষি, তবে মাটির জমিনে নয়, মানব জমিনে ঃ

মনরে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।

যেমন জমিন তার তেমন ফল। মানব মনের মাটির জমিনে ভক্তিসোনার ফসল। কিষাণ মানুষের মন।

এ অনবদ্য সুভাষিত।

শাক্তপদসাহিত্যের পদে পদে বহু বহু সুভাষিত। আর একটি অতুলনীয় সুভাষিত পর্য্যায়ের উৎকলন এখানে রাখিয়া আমরা দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি শেষ করিব।

সঙ্গীত সন্দর্ভ মতে রচয়িতা নরচন্দ্র, সাধারণ্যে গীতটির রচয়িতা দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ঃ

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দেও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী ॥
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি
তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি।

শাক্তপদাবলীর পঙক্তি সকল কেন সুভাষিত পর্য্যায়ের মর্য্যাদায় বিভূষিত এ প্রসঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি একান্ত প্রাসঙ্গিক। 'একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকালে প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোক বিশালবিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপশালিনী মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিভিতেছিল। যে বারান্দায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র রশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না। ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেকদূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিরা রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা বক্ষ হইভে সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে ঃ

'সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে ॥

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গলাভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম। এ জাহ্নবী জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে। তাহা বুঝিতে পারিলাম তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বোধ হইল। এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।'

শাক্তপদাবলী 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। তাহার প্রমাণ সমানধর্মা পাঠকের অনুভূতি। 'সচেতসামনুভবঃ প্রমাণংস্তত্র কেবলম্ ॥'

॥ শাক্তসাহিত্যের ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র,
গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও নজরুল ॥

ক. শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

যে কালে প্রভাকরপত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের কীর্তি-খ্যাত নাম বাঙ্গালীচিত্তে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহা অধিক দিনের কথা নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কাল ১৮১১-১৮৫১। বাঙ্গালীরা সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। যে শ্লেষানুপ্রাণিত ভণিতি দিয়া ঈশ্বর গুপ্ত নিজনামের সঙ্গে প্রভাকর পত্রিকার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও বাঙ্গালী সহজে ভুলিতে পারিবে না ঃ

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর

এই পঙ্‌ক্তি-যুগলের মধ্যে অহঙ্কার আছে কিনা বলিতে পারিনা, তবে আত্মপ্রত্যয় ও যথার্থ-ব্যাহৃতি যে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে কল্পনার দূরযাত্রা খুঁজিয়া না পাইয়াও বঙ্গ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কবি-স্বীকৃতিকে যে স্বাগত জানাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব তাহা লইয়া যে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যরাজ্য সেই বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিলেন 'তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।' শাক্তগীতি ও শাক্তভাবনা বাঙ্গালী চিন্তার অপরিহার্য অঙ্গ। সেই বিষয়েও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসৃষ্টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শাক্ত পদাবলী চয়নে ঈশ্বরগুপ্তের মোট পাঁচটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। চারটি আগমনী পর্য্যায়ের, একটি জগজ্জননীর রূপ বিভাগের।

শক্তি দেবতা দুর্গা বঙ্গজ-জন-গণ-মানসে কন্যার আসন পরিগ্রহ করিয়া আছেন, এ সত্য অনস্বীকার্য্য। বৎসরান্তে কন্যাকে গৃহে আনিবার ধারণাই আগমনী-গীতিকার সৃষ্টিমূলে রহিয়াছে। প্রসন্ন শরতের দিনে বৎসরাবসানের পরে কন্যা-কল্পা দুর্গা বঙ্গভবনে আসিবেন এ ভাবনা সকল বাঙ্গালীর ভাবনা। ঈশ্বর গুপ্তকেও এই ভাবনা পাইয়া বসিয়াছিল।

শাক্তপদাবলী-নিবন্ধ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম আগমনী কবিতাটি জননী-মেনা-মুখে জনক হিমালয়ের প্রতি উৎসারিত ও উদ্দিষ্ট। জলধি-জল-নিমগ্ন সন্তান মৈনাকের বিরহাতুরা জননী কন্যা উমাকে নিকটে পাইবার জন্য ব্যাকুলা। মঙ্গলা শিবানীর সংবাদ বহুদিন পান নাই তিনি। যে সংবাদ অধুনা পাইয়াছেন তাহাও সুসংবাদ নহে। কন্যা উমা ভগবতী ভিখারী শিবের ঘরে পড়িয়া ভিখারিণী হইয়াছেন ঃ

বল্গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা
বৃথা এই আঁখি-তারা সব অন্ধকার ॥

ত্রিজগতে শক্তিদেবতা উমাই শাক্তের একমাত্র উপাস্যা। কৌশলে ঈশ্বরগুপ্ত লিখিলেন ঃ

ত্রিজগতে নাহি অন্যে একমাত্র সেই কন্যে
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার!

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত আগমনী বিষয়ক দ্বিতীয় পদটিও উমাজননী-মেনকা-মুখ-নিঃসৃত ও পিতা হিমালয়ের উদ্দেশ্যে কথিত। সেখানে শ্মশানচারী শিবের গৃহিণী কন্যা উমার জন্য জননী হৃদয়ের ক্লেশ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। পদটির আরম্ভাংশ এইরূপ ঃ

কৈলাস সংবাদ শুনে মরি হে পরাণে
কি করহে গিরিবর, যাও যাও এস জেনে।

শেষাংশে উমা গৌরীর কালী-রূপ-ধারণের লৌকিক কারণ কবি বলিলেন ঃ

শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হয়ে
উমা আমার রাজার মেয়ে পাগলিনী অভিমানে
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুরাপানে।

এই পদটি সম্পর্কে পদাবলী-সঙ্কলয়িতা পাদ-টীকায় লিখিতেছেন 'এই গানটিই যৎ-সামান্য পাঠান্তরিত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া কোনো কোনো সঙ্গীত পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত আগমনী পর্য্যায়ের তৃতীয়গানের পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা অধিক। ছাব্বিশটি। বাঙ্গালী জননীর প্রাণ গানের কলিতে কলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কন্যা উমাকে ভিখারী শিবের ঘরে সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে হয়। একদা বঙ্গ সমাজে হা- অন্ন-পরিবারে সতীনের যন্ত্রণা সহিয়া বঙ্গকন্যাকে জীবন কাটাইতে হইত। কন্যা-জীবনের ব্যথাবেদনার স্পর্শ মাতাকে আকুল করিয়া ফেলিত। সেই সমাজ-চিন্তা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-মুখে ধরা পড়িয়াছে ঃ

ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে, হ'য়েছে পাষাণ ॥
ননীর পুতলী তারা, রবিকরে হয় সারা
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালা-পালা
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ ॥
শিরে সুরতরঙ্গিনী, হ'য়ে শিবসোহাগিনী
করি কলকলধ্বনি করে অপমান।

সারাদিন ঘরে ঘরে ভোলানাথ ভিক্ষা করে
যথাকালে খায় হ'লে দিবা-অবসান ॥

শিবের জটাকলাপবন্ধ নির্ঝরিণী জাহ্নবী এখানে গৌরীর সতিনী—স্বামীর সোহাগে মাথায় উঠিয়াছে। তাহাতেও রক্ষা ছিল যদি না সে বিলোল-বীচি-বল্লরীতে কল-কলিত- কথা-মালিকায় তাহাকে অপমানিত করিত।

পদটির শেষাংশ সুন্দর কল্পনায় সংযুক্ত। কবি ঈশানীর সঙ্গে ঈশানকে—কন্যার সঙ্গে জামাতাকে আনিতে বলিয়াছেন। ভয়হর দুর্গানামের কথাও আছে ঃ

দুর্গা নামে যাবে ভয়, তা হে কি বিপদ হয়
আন আন হিমালয় ঈশানী-ঈশান ॥

আগমনী-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বিরচিত গ্রথিত পদসমূহের শেষটি গৌরীর প্রতি উদ্দিষ্ট শংকরের কথা! পিতৃগৃহে যাইবার যে অনুমতি গৌরী প্রার্থনা করিয়া ছিলেন এই পদে সেই অনুমতি প্রার্থনার অনুমোদন। গৌরী একলিকা যাইবেন না, সহচর হইবেন শিব। বশংবদ স্বামি-স্বভাব পদটিতে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

জনকভবনে যাবে ভাবনা কি তার?
আমি তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আর!
আহা আহা মরি মরি বদন বিরস করি
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি কেঁদোনাক আর!
হৃদয়েশি অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ কি দোষ আমার!
যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি
কখনো কি করি আমি অন্যথা তাহার?

পদটির পরবর্তি অংশে তত্ত্ব কথার স্পর্শ। যেমন ঃ

সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া
তোমার বিচিত্র মায়া বুঝে উঠা ভার।

'যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতী কখনো কি করি আমি অন্যথা তাহার' —অংশে গৌরীর প্রতি শিবের বশংবদত্ব কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের পঞ্চমসর্গে ব্রহ্মচারিবেশ হইতে প্রকাশিত মূর্তি শিবের উমার প্রতি উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয় ঃ

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাস ঃ
ক্রীত স্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥

শাক্তপদাবলীচয়নে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের অন্যরচনাটির উপজীব্য বিষয় জগজ্জননীর রূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জগজ্জননীর ভীষণ-সুন্দর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জগজ্জননী অঙ্গদ্যুতিতে সজলমেঘবর্ণা, বয়োধর্মে তারুণ্যমণ্ডিতা, ভাল-ফলকে শশিকলাকল্প তৃতীয়নেত্রশোভিতা! এই পৃথিবীতে দৈত্য নিধনার্থে

তাঁহার আবির্ভাব। দানবনিধনসময়েও কবি তাঁহার অঙ্গ হইতে লাবণ্য পুঞ্জ ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছেন। সে রূপ-রুচি ভুবনছলনা বিশ্ববিমোহিনী। কবির রচনাবলীতে বিস্ময়ের ঘোর। কবি যেন জানিয়াও জানেন না, চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না ঃ

কে রে বামা বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধ'রেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী করিছে দনুজজয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ
মদননিধনকরণকারণ, চরণ-শরণ লয় ॥
বামা হাসিছে, ভাসিছে, লাজ না বাসিছে
হহুংকার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥

উৎকলিতাংশে প্রায় অষ্টাদশক্রিয়াপদসঙ্গিনী ভাষার সাবলীল নৃত্যপরা সঙ্গীত-মূর্তি যেন জগজ্জননীর দনুজদলনী অনুপমা বিশ্বমোহিনী কান্তির প্রতিচ্ছবি। ঈশ্বর গুপ্তের এ কাব্যসর্জনা সমানধর্মার চিত্ত-চমৎকার-কারিণী।

বোধেন্দু বিকাশে উৎকলিতাংশের মতো বেহাগরাগিণী একতালা তালের অন্য একটি গান আছে ঃ

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী
সুবেশী, এ যে নহে মানুষী
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প
গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি চরণে কৃত্তিবাস ॥
কে রে করাল-কামিনী মরাল-গামিনী
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী
রূপেতে প্রভাত করিছে যামিনী,
দামিনী জড়িত-হাস।
কে রে যোগিনী সঙ্গে, রুধির রঙ্গে
রণ-তরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।
আহা যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব
হইল খর্ব, গেলরে সর্ব
চরণ সরোজে পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ।

দেখি নিকটমরণ কর রে স্মরণ
মরণ-হরণ, অভয়-চরণ
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥

এই সৃষ্টিতেও সেই শব্দক্রীড়া। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বলিয়াছেন ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে 'তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি।'

গ্র. আগমনী ও বিজয়া গান : মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র

বাংলাসাহিত্যের কাব্যেতিহাসে মধু-নবীন দুই কীর্তিখ্যাত নাম। মধুসূদন দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেন। প্রথম জন গুরুকল্প পূর্বসূরী ও পথপ্রদর্শক, দ্বিতীয়জন শিষ্যকল্প উত্তরসূরী ও অনুসারী। মধুসূদনের সাল ১৮২৪-১৮৭৩; নবীনচন্দ্রের ১৮৪৭-১৯০৯। ধর্মান্তরিত হইয়াও মধুসূদন কাব্যসর্জনায় শ্রীমধুসূদন; নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টি কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যপ্রমুখকে উপজীব্য করিয়া। শাক্ত-বৈষ্ণবের তর্ক দূরে থাকুক বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের প্রতি উভয়ের গভীর আগ্রহ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে দোল-ঝুলনের মতো আগমনী বিজয়ার আবেদন যুগ-যুগ-বাহিত। শক্তি-তত্ত্ব শাস্ত্রকণ্টকিত, কিন্তু শক্তিদেবতা দুর্গা কখন যে বাঙ্গালী চিত্তে আদরণীয়া কন্যার আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। বৎসরান্তে কন্যাকল্পা দুর্গাকে পিতৃগৃহে আনিবার পুলকমিশ্র-আকুলতা এবং তিনটি দিনের পরে তাঁহাকে স্বামিভবনে প্রেরণের বেদনাকাতর বিরহবোধ সকল বঙ্গজহৃদয়-সাধারণ। এই আবেগআবেশে মথিত হইয়াছে এই দুই কবি-চিত্ত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শাক্ত-পদাবলী চয়নে মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত দুইটি শাক্ত কবিতা ও মধুসূদন দত্ত রচিত একটি শাক্তকবিতা চয়িত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের দুইটি কবিতার একটি আগমনী ও অন্যটি বিজয়া-বিষয়ক; মধুসূদনের চতুর্দশপদীকবিতাবলী-বিখ্যাত রচনা বিজয়া বিষয়ক।

নীবনচন্দ্রের রচিত আগমনী গান শাক্তপদাবলী চয়নে আগমনী পর্য্যায়ের দ্বিতীয় স্তবকে গৃহীত। গানটি জননী মেনকার। হিমনগের প্রতি দৃষ্টি দিয়া মাতা মেনকা বলিয়া উঠিয়াছেন। আলোকোদ্ভাসিত হিমগিরিশ্রেণীতে সূর্য্য-সারথী অরুণ-প্রকাশ নয়, নয় উদয়-নবীন-চন্দ্র-দ্যুতি; ইহা তুহিন মধ্যবর্তিনী গৌরাঙ্গী গৌরীর গৌর-আভা। গৌরী আসিতেছে তাই অগ্রবর্তিনী হইয়াছে তাহার আলোকসঙ্কাশ গৌর কান্তি!

দেখে আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসে রে,

উমা আমার আসে বুঝি
উমা আমার আসে রে।
এ নহে অরুণ-আভা,
নহে শশধর বিভা
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর
গৌর-আভা হাসেরে ॥

মাতৃনেত্রে পশ্চিমের আকাশ-ফলকে তনয়া উমার যে মুখ-সুষমা ভাসিয়া উঠে তাহা শারদচন্দ্রমার বিমোহনসৌন্দর্য্যকেও হার মানায়। উমা মুখের নিকট শরৎ-গগনের বাঁকা চন্দ্রকলাও লাগে না। চারিদিকে আরাত্রিকের বাদ্য। বৎসরান্তরে মাতৃপ্রাণ জুড়াইতে আসিতেছেন পার্বতী ঃ

শারদশশী বঙ্কিম, করি ঐ আভাহীন,
পশ্চিম গগনে ঐ উমামুখ ভাসে রে।
বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্বতী
জুড়াতে মায়েরই প্রাণ উমা আমার আসেরে।
বৎসর-অন্তরে আজ উমা আমার আসেরে ॥

শ্রুতিসুখদ শব্দসন্নিপাতের সঙ্গে উৎপ্রেক্ষা-ব্যতিরেকাদি অলঙ্কারের মণ্ডণ ও কোমল বাৎসল্যভাবের সুবলন গানটিকে হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন করিয়াছে।

বিজয়াপর্য্যায়ের গানে মধুসূদনের রচনা পূর্ববর্তিনী হইয়া গ্রথিত। পরবর্তিনীটি নবীনচন্দ্রের। সংকলয়িতার সচেতন-মন এই গ্রন্থনে কাজ করিয়াছে।

নবমী নিশীথিনীর প্রতি জননী মেনার প্রার্থনা—সে যেন শেষ না হইয়া যায়। নবমীর অন্তে যে দশমী! এবং সেই দশমী যে বিদায় দশমী! তনয়া-বিপ্রয়োগবেদনা জননীর নিকট সুদুঃসহ। নবমী-অন্তের দশমী প্রভাতে সূর্য্যোদয় ও বিহগকুজন কিছুই আনন্দদ হইবে না। দুই-কবির রচনায়ই বাৎসল্যের সঙ্গে কারুণ্যের সন্নিবেশ। মধুসূদন লিখিলেন ঃ

যেয়ো না রজনি, আজি ল'য়ে তারা-দলে
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনা ভাবে
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারাকুন্তলে
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।

দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

ইহা সনেট। সনেট হইলেও, বাঙালী কবি মধুসূদনের হৃদয়-সমুত্থ সঙ্গীত। এই গানের প্রভাব নবীনচন্দ্রে কি প্রকারে অনুভূত হইয়াছিল নবীনচন্দ্রের রচনা পড়িলে তাহা প্রতীত হয়ঃ

যেওনা, যেওনা, নবমী রজনি,
সন্তাপ হারিণী ল'য়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চ'লে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায়, ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবেরে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।

ইহা গান। বাঙালী কবি নবীনচন্দ্রের অন্তরের গান! বুঝি নবীনচন্দ্র যখন এই সঙ্গীত সৃষ্টিতে বসিয়াছিলেন তখন মধুসূদনের রচনাটি তাঁহার মনে মনে গুঞ্জরিত হইতেছিল। হইবারই কথা। তনয়া-বিশ্লেষ-ব্যথা উভয় কবির মর্মলোককে যে মথিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহলেশ থাকে না। সঙ্কলন-গ্রন্থে প্রাচীন কবি-বৃন্দের আগমনী-বিজয়া বিভাগের সঙ্গীতাবলীর সঙ্গে এই দুই নবীন কবির রচনা যথার্থই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত শাক্তগীতি প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রতিভার দান অবিস্মরণীয় মূল্য বহন করে। যে শাক্তপদাবলী বাঙলা ও বাঙালীর প্রাণরসধারার পরিচয় বহন করে সেই শাক্তপদাবলীর আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননী রূপ, ভক্তের আকূতি, করুণাময়ী মা, লীলাময়ী মা প্রভৃতি বিভাগেও তাঁহার গীতসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

বৎসরান্তে মাত্র তিনটি দিনের জন্য উমা কৈলাসে আসিবেন হিমপুরী হইতে, আবার এই তিনটি দিনের পরেই তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবেন কৈলাসে—উমার আগমন ও বিদায় গ্রহণ বাঙলার পদসাহিত্যে 'আগমনী' ও 'বিজয়া' সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু হইয়া রহিয়াছে। বাঙালী হৃদয়ের বাৎসল্য রস আগমনী ও বিজয়া পর্য্যায়ের গানে প্রাধান্য পাইয়াছে, বলা বাহুল্য। 'কু স্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী' গানটি জননী মেনার মুখে হিমালয়ের প্রতি উদ্দিষ্ট। উমা কেবল শ্মশানবাসিনী হইলে বা কথা ছিল, তাঁহার গৌর অঙ্গ কালি হইয়াছে. মুখে স্মিতহাস্যের স্থলে অট্ট-অট্ট হাস্য স্থান পাইয়াছে। আরো আছে, উমা হইয়াছেন আলুলায়িত কেশকলাপা, শবাসনা, ত্রিনয়না, যোগিনী-সঙ্গিনী, রণ-রঙ্গিনী ও সিংহবাহিনী। কুস্বপ্ন-জাগর হৃদয়ে উমাকে কৈলাসে আনিতে মাতা মেনা হিমালয়কে ত্বরিত করিতেছেন ঃ

উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধা-রাশি।

পদ-নিহিত বচন-বিন্যাসে মাতৃ-হৃদয়ের ব্যগ্রতা সুষ্ঠু অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পিত্রালয়ে কন্যা উমা আসিয়াছেন, তখন কন্যা-জননীর সংলাপ। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পদে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বাগভঙ্গিতে সেই মর্মস্পর্শিতা ও সহজ সারল্য। মেনকা লোকমুখে নানা কথা শুনেন, শুনেন শিবের ভিক্ষাবৃত্তির কথা। তাঁহার জননী-চিত্ত আর ধৈর্য্য ধরে না ঃ

ওমা, কেমন ক'রে পরের ঘরে
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই।
মার প্রাণ কি ধৈর্য্য ধরে!
এবার নিতে এলে, বলবো—'হরে
উমা আমার ঘরে নাই!'

ভিক্ষোপজীবি-জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া বাঙ্গালী জননীর উদ্বেগ উমা-জননী মেনকার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

উমার উক্তি-নিহিত গিরিশচন্দ্রের পদে উমা-গত প্রাণ শিবের পরিচয়—'হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই।' আত্ম-বিস্মৃত-প্রাণ শিব তুলনা-রহিত। উমা বলিতেছেন : ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে

ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে

এক্‌লা পাছে যায় গো চলে আপন হারা এমন কই।

উমা দিবস-ত্রয়ের জন্য আসিয়াছেন মাত্র। কিন্তু মাতা মেনকা আরো কিছু দিন তাঁহাকে রাখিতে চাহেন। পদটির আরম্ভ 'এসেছিস্ মা—থাক না উমা দিন কত।'

অকপট হৃদয় জামাতাকে তিনি জানেন। মানাভিমান-বর্জ্জিত সেই শিব। মেনকা শিবকে কৈলাস হইতে আনাইয়া লইবেন হিমপুরে 'বলিস যদি আনি মা জামাই সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই।'

এই পদটিও বাঙালী মায়ের হৃদয়ের ছবি-বিশেষ। বিবাহিতা কন্যা পরের এ সত্যও মেনকা মুখে প্রকাশ করিয়া গিরিশচন্দ্র বলেন 'স'পে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত'। এ যেন কালিদাসের সেই বিখ্যাত-ব্যাহৃতি 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব'।

'বোঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে' পদে গিরিশচন্দ্র মেনকার মুখে আরো কিছুদিন নগ-নগরীতে কন্যা উমাকে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উমা সন্তান-বিরহ-যন্ত্রণা বুঝে নাই বলিয়া কৈলাসে চলিয়া যাইতে চাহে। জামাইকেও তিনি কৈলাস হইতে আনিবেন :

বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায়
রাজার জামাই থাকবে হেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ॥

বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা জামাতাকে একত্র লাভ করার আনন্দ গিরিশচন্দ্রের উৎকলিত পদে প্রকাশিত ; 'যে ডাকে সে তার কাছে যায়' উক্তিতে শিবের ভক্ত-বৎসল স্বভাবের পরিচিতি ; 'প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে' অংশে গিরিশচন্দ্রের হর-গৌরী দর্শনাভিলাষের ইঙ্গিত।

'বিজয়া' সঙ্গীতে গিরিশচন্দ্রের মেনকা কন্যা পার্বতীকে কৈলাসে পাঠাইতে একান্ত কাতরা। কৈলাসের আকাশ ঘিরিয়া ঘন মেঘের সঞ্চারণা, অদৃশ্য সূর্য্য-চন্দ্র ; তাহার উপর জামাতা ভূত-প্রেত সঙ্গী, ভিক্ষোপজীবী। সাধারণ বঙ্গললনার মতো হিমগিরি-গৃহিণী ভাগ্যের দোষ দেন 'মন বোঝাব কেমন ক'রে, কপাল-পোড়া কে ঘোচাবে।' অবশেষে মেনকা স্থির করেন তিনি তাঁহার সুবর্ণ-প্রতিমা গৌরীকে কৈলাসে পাঠাইবেন না। মেনকার উক্তিতে বঙ্গ জননীর চিত্তলীন চিন্তা ও মুখের ভাষার প্রতিভাস :

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে।
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে ;
যায় যাবে সে গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে।

বাঙ্গালী সমাজে এমনও দিন ছিল দরিদ্র পিতামাতা অর্থের জন্য কন্যা সম্প্রদান করিতেন, কন্যারও মুখ খুলিয়া বলার কিছু ছিল না। সেই পিতামাতা নির্বাক থাকিতে পারেন, মেনকা থাকিবেন না ; তাই বলিতেছেন ঃ

কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে
উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধ'রে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচিত 'জগজ্জননীর রূপ' পর্য্যায়ের গীতগুলি ভাষা ও ভাব-সুষমায় অনবদ্য। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে যিনি কন্যা ছিলেন তিনি এখানে জননী। তিনি পূর্বের মতো এখনও হরমনোমোহিনী আছেন, তবে কবি সেই জননীর কালো রূপের মধ্যে অজস্র আলোকের রূপ দেখিতে পাইয়াছেন ; যাঁহারা প্রকৃত চক্ষুষ্মান অর্থাৎ ভক্ত তাঁহারা সেই আলোকোজ্জ্বলরূপের সন্ধান পাইবেন ঃ

বিমল হাসি খরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ,
ভ্রমর ভ্রমে কমল ভ্রমে
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

জগজ্জননীর এরূপ কেবল সুন্দর। কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এমনও পদ আছে গিরিশচন্দ্রের। সেখানে তিনি মদমত্ত মাতঙ্গিনী ও উলঙ্গিনী। তাঁহার দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ চরণে চরণে জড়াইয়া জড়াইয়া যায়। নখদ্যুতিতে অরুণিমা, পদপাতে পদ্মপ্রকাশ, অঙ্গের মধু-গন্ধে আকৃষ্ট মধুব্রতসংঘের মধুর গুঞ্জরণ। আবার, অবিরাম অট্টহাস্যে সৌদামিনীর প্রকটমানতা, কালো কালিমার বর্ণ-ঘটায় উজ্জ্বল আলোর সম্প্রকাশিত বিভা ঃ

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তল দল বিজড়িত পায় পায় ॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গ-বৃন্দ গুঞ্জি ধায়।
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ ঘটায় ॥

জগজ্জননীর ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ অন্য একটি পদে ঃ

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ডশোভিত কর
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী ভীমা ভুবন ত্রাসিনী

কিংবা এই পদে ঃ

ঊর্দ্ধ্ব জটাজুট গভীর-নিনাদিনী
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব-বিমর্দ্দিনী
দনুজ হ্রাস ত্রাস, লক লকু রসনা,

অসুর-শির-চুর, ভীষণ দশনা
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া টল টল মেদিনী ॥

ইহাদের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার মতো গিরিশচন্দ্রের অন্য রচনাও আছে। সেখানেও সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি ঃ

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্ত দশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
অট্ট অট্ট হাস ত্রিপুরত্রাস
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ

উৎকলিতাংশচয়ে জগজ্জননীর যেমন ভয়ংকর রূপের প্রাধান্য তেমনি সর্বজন-সন্তোষণ অবিমিশ্র মোহনসৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে গিরিশচন্দ্র রচিত এমন পদের দৃষ্টান্ত এখানে তুলিয়া দিই ঃ

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে পড়ে হায়!
পদ্ম-ভ্রমে পদতলে পড়ে অলি দলে দলে
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

এবং

জয় নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল উজ্জ্বল বরণে।
মধুর হাস তমোবিনাশ, মনবিকাশ স্মরণে।
নগবালা নব নলিনীমাল, নবনীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর শোভিত ভাল, তড়িত জড়িত চরণে।
তন্ময়ী তারা ত্রিতাপ তারিণী, শরণাগত শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী, দুর্গে দুখ হরণে ॥

জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় কবিকৌশল লক্ষ্য করিবার মতো। ভাষা ভাবানুরূপ; কবি ব্যতিরেক, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলংকারকে সাহায্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

'ভক্তের আকৃতি' পর্য্যায়ের এক গানে গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন তিনি জগজ্জননীকে বারংবার ডাকিতেছেন, কিন্তু জগজ্জননী সেই ডাকে সাড়া দিতেছেন না। জগজ্জননীর প্রতি অনুযোগপূর্ণ উক্তি ঃ

ও মা, কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে তো ডাকব না আর,
লাগে কিনা দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাকো একবার চেয়ে
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে ॥

'করুণাময়ী মা' শীর্ষক পদবিভাগে কবি গিরিশচন্দ্রের ভণিতি সরল-সহজ ও সুবোধ্য। কবি বলিতেছেন তাঁহার আকুল ডাকে মা সাড়া দিয়াছেন, অভয়াব অভয়-চরণ লাভ করিয়াছেন, আর তিনি কাহাকেও ভয় ডর করিবেন না ঃ

কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে।
মা বলে 'আয়রে কোলে', মুখ মুছায়ে কোলে টেনে।
পেয়েছি অভয়ারে, আর কিরে ভয় করি কারে ?
মা ব'লে বারে বারে চেয়ে রব চরণ পানে ॥

কবি উপলব্ধি করিয়াছেন মা জগজ্জননী একান্ত ভক্ত-বৎসলা। হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তাপিত প্রাণ শীতল হয় ; মাতৃ-আহ্বান কর্ণে হয় ধ্বনিত ঃ

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না।
হৃদয় খুলে ডাক মা ব'লে, পুরবে মনের বাসনা ॥
মা বলে ডাকলে পরে, তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে, ডাকছে রে ভাই শোন না।

'লীলাময়ী মা' বিভাগের পদে গিরিশচন্দ্র জগজ্জননীর কৌতুক ঘন অপূর্ব লীলার কথা বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহারই প্রতি প্রশ্ন মুখে ঃ

শিব যদি মা তোমার স্বামী লোটায় কেন পদতলে ?
বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে।
চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা ?
তোর আবার কি স্বামী ওমা, মা তুমি, 'মা' সবাই বলে।
ধরা কাঁপে পদ ভরে, বাজে নাকি বুকে ধ'রে ?
নইলে বল কেমন ক'রে শিব ধরেছে হৃদ্-কমলে।

ঘ. রবীন্দ্রনাথের শ্যামাগীত—বাল্মীকিপ্রতিভা, বিসর্জন ও অন্যত্র

রবীন্দ্ররচনাবলীতে গীতিকাব্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাল্মীকির কবিপ্রতিভালাভের পূর্বে তাঁহার কার্য্য ছিল দস্যুতা। অরণ্য পরিবেশে দস্যুনেতা বাল্মীকি যখন নাট্যের প্রথমাঙ্কে প্রবেশ করেন তখন অন্যান্য দস্যু একত্রে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি গাহিয়া উঠিয়াছে। গানটির শেষাংশে কালী শ্যামার উল্লেখ। কালী শ্যামা লৌকিক ধারণায় দস্যু-দেবী বা ডাকাতে কালী-রূপে পূজিতা। দস্যুর দল গাহিয়াছে ঃ

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

সে দিন ছিল অমাবস্যা। অমাবস্যার অন্ধকারসমবর্ণা কালী শ্যামার পূজার যোগ্যা তিথি অমাবস্যা। তাই দস্যুদলপতি বাল্মীকি ডাক দিয়া বলিয়াছেন ঃ

শোন্ তোরা সবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা
বলি নিয়ে আয়॥

দলপতির আদেশে সকলে শ্যামা কালীর জয়ধ্বনি সহ গান ধরিয়াছে। এই গানে উন্মাদিনী অসংখ্য যক্ষ-রক্ষ-সঙ্গিনী আলুলায়িত কেশপাশা, অট্টহাস্যযুক্তা শ্যামার নৃত্যপরা মূর্তির উল্লেখ ঃ

কালী কালী বলোরে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো- বলো হো।
নামের জোরে সাধিব কাজ—
বলো হো হো হো, বলো হো বলো হো!
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ, যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে
ওই লট্ট পট্ট কেশ অট্ট অট্ট হাসেরে
হাহাহা হাহাহা হাহাহা।
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়!
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয়।

সঙ্গীতটির 'ওই ঘোর মত্ত' হইতে 'অট্ট অট্ট হাসেরে' পর্যন্ত অংশটি শাক্ত-পদাবলীধৃত বানোয়ারীলালকৃত

'চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে নাচিছে পরমরঙ্গে।'
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা'

কিংবা মহাকবি গিরিশচন্দ্রঘোষ রচিত 'মদমত্ত মাতঙ্গিনী নেচে ধায়' গীতটির

'অট্টহাস্য অবিরত তড়িত প্রকট কত / উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ ঘটায়' অংশকে মনে করাইয়া দিবে।

ইহার সহিত রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের পদও মনে পড়িবার কথা।

'বাল্মীকি প্রতিভার' দ্বিতীয়দৃশ্য। অরণ্যস্থলীতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে দেখা যায় স্তবে আসীন বাল্মীকি। কণ্ঠে গান ভবানী শ্যামার :

রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো
রণরঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত-অসি
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা
উড়ো কালী কপালিনী মহাকালসীমন্তিনী
লহো জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা॥

শক্তিদেবতা শ্যামা হইলেন ভবদারা তারা কালী কপালিনী মহাকাল-সমীন্তিনী ও পরাৎপরা। শক্তিদেবতা সম্পর্কে এই জাতীয় অভিধা প্রায়ই দৃষ্ট হয়। তিন কড়ি বিশ্বাস 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের এক গানে লিখিলেন 'কোথায় গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি। দয়া ক'রে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী।' কপালিনী কালী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ভাষায় 'নর-কর-বেষ্টিত কপাল মালিনী।' এই গিরিশচন্দ্রই অন্য এক গীতে মহাকালসীমন্তিনীকে বর্ণনা করিলেন 'মহাকালকামিনী উৎকট আসব-পান-মগনা।' এইগুলি জগজ্জননীর রূপ-বিভাগে। দর্পনারায়ণ কবিরাজ 'ভক্তের আকূতি' অংশের এক গানে লিখিতেছেন 'প্রণমামি পরাৎপরা পতিত পাবনী।'

দস্যুগণ যখন বলির জন্য এক বালিকাকে আনিয়াছে তখন বাল্মীকি-কণ্ঠে গান শুনি :

নিয়ে আয় কৃপাণ। রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও—যা ত্বরায়
লোলজিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে
করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।

'লোলজিহ্বা লকলকে'র সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'লক্ লক্ রুধির লোলুপ রসনা' 'তড়িত খেলে চোখে করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত ঘোর দন্তভায়'-এর সঙ্গে গৌর মোহনরায়ের ' চপলা জিনি ত্রিনয়নী চপলা জিনি দন্ত শ্রেণী' ইত্যাদি মিলিবে ভালো।

জীবরক্তে দেবীর যে তৃষাতৃপ্তি ঘটেনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিসর্জন নাট্যে দেখইয়াছেন। এই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র দ্বিতীয় দৃশ্যেই বাল্মীকির ভাবান্তর-ঘটানা।

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমিতেও রহিয়াছে অরণ্য। পূজোপকরণের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া দস্যুদল যখন নৃত্যে মাতিয়াছে তখন বলির জন্য আনীতা বালিকা গাহিয়াছে :

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী ;
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওমা ত্রিনয়নী ॥

বাল্মীকি-প্রতিভার পঞ্চমদৃশ্যে দেখি দস্যুদলপতি বাল্মীকির পাষাণ হৃদয় যখন করুণার অজস্রধারায় গলিয়া-ঝরিয়া গিয়াছে তখন শ্যামা মাকে উদ্দেশ্য করিয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন :

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা ;
এত দিন কী ছল করে তুই পাষাণ ক'রে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন
আমায় তুমি ছলে ছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা !
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ॥

কবি পাষাণী শ্যামাকে এতদিন জানিতেন। এবার করুণাময়ীকে জানিলেন। মায়াময়ী মহামায়ার ছলনা ভেদ করিতে পারিয়াছেন তিনি। আর নির্দয়তা নৃশংসতা নয় এবার হৃদয়কে করুণাধারায় স্নাত করিবার আহ্বান। দস্যুদলনায়ক বাল্মীকি এখন পরম সারস্বত। তাঁহার কণ্ঠে সুললিত দেবভাষার সঙ্গীতোৎসারণা-'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাম্।'

'বিসর্জন' নাটকের বিখ্যাত শ্যামাগীত-'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত শাক্তপদাবলী চয়নে সংকলয়িতা গীতটিকে জগজ্জননীর রূপ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ঃ

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
আমরা নৃত্য করি সংগে ;
দশ দিক্ আঁধার ক'রে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙারসনা
দেখে মরিবারে ধাইছে পতংগে !
কালো কেশ উড়িল আকাশে
রবি সোম লুকাল তরাসে,
রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু-ভঙ্গে !

-সমরপুলকে উলঙ্গিনী শ্যামা নাচিতেছেন। তাঁহার নৃত্যের আবেশে ও

তালে তালে আমরা সকলেও নাচিতেছি। সেই শ্যামা দিগম্বরী। তাঁহার ঘূর্ণী-নৃত্যে দশদিক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। দশদিক অন্ধ অন্ধকারে ছাইয়া দিয়া শ্যামা নর্তনরংগে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার আরক্ত জিহ্বার উপমা অগ্নির শিখা। রক্ত জিহ্বার দ্যুতিতে অগ্নি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে পতংগের দল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। নৃত্যপরা শ্যামার কৃষ্ণকান্তি কেশকলাপ আকাশস্পর্শী হইয়া উড়িতে লাগিল। দেখা গেল না সূর্য, দেখা গেল না চন্দ্র। প্রলয়ত্রাসে তাহারা যেন ভয় পাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। কালিকার কৃষ্ণবর্ণ অংগ বাহিয়া দনুজগণের অঙ্গনির্গত রক্তিম রক্তধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু আশ্চর্য সেই শ্যামার ভুরু-ভঙ্গিমায় ত্রিভুবন কাঁপিতেছে।

সংগীতটিতে ভয়ানক রসের উৎসার কিন্তু অন্তপঙ্‌ক্তিতে মাধুর্যের স্পর্শ। 'দেখে মরিবারে ধাইছে পতংগে' অংশটি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গগত 'কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্‌ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' শ্লোকাংশ মনে করাইবে। 'ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু ভংগে'র সংগে এই রবীন্দ্রনাথেরই 'চিত্রা' কাব্যগত 'উর্বশী' কবিতার 'তোমার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল' মিলাইয়া পড়িবার মতো।—

বিসর্জন নাটকের

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই।
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষণিক রোষে
মুখ তো ফিরালি শেষে। অভয় চরণ কাড়লি কই।

—গানে শ্যামাজননীর প্রতি সন্তানের অভিমানোক্তি স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। শ্যামা জননী ক্ষণকালের জন্য রোষ ভরে সন্তানের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেও অপার উদার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই।

২৮ সংখ্যার স্বরবিতানের—

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ড বেয়ে
ধরণী রাঙা হলো রক্তে নেয়ে॥
ডাকিনী নৃত্যকরে প্রসাদ রক্ত তরে—
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে॥

—সঙ্গীতে শ্যামার সেই দনুজদলনী মূর্তি। দনুজগণের কর্তিত মস্তক হইতে শোণিত প্রবাহ ঝরিয়া গলিয়া পড়িয়া ধরিত্রীকে রঞ্জিত করিয়াছে। সঙ্গিনী ডাকিনীর দল যেমন প্রসাদরক্ত পানের জন্য নাচিতেছে তেমনি তৃষাতুর ভক্তও চাহিয়া রহিয়াছে।

শাক্ত-বৈষ্ণব-প্রভাব বাংলার কবি তথা জনগণের মানসে সুচিরকাল যাবৎ যুগপৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সর্জনায় তাহা সপ্রমাণ। তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলীতে যেমন রাধাকৃষ্ণকথা এই গীতিচয়ে তেমনি শক্তিদেবতা শ্যামাপ্রসঙ্গ।

৬. রজনীকান্তরচিত শক্তিগীতি

বাংলার কাব্যেতিহাসে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের নাম সমুল্লেখ্য মর্যাদার গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহার কাব্য-গীতির বিশেষ এক ধারা শক্তিদেবতাকে উপজীব্য করিয়া প্রবাহিত। শাক্তভক্তিগীতিসূত্রে তিনি রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রমুখ কবিগণের উত্তরসূরী।

শাক্তপদাবলী সাহিত্যের একটি বিভাগ আগমনী নামে খ্যাত। একটি আগমনী পর্য্যায়ের গানে জননী মেনামুখে কবি বলিতেছেন ঃ

ও মা উমা এ আনন্দ কোথা রাখি বল্।
নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল।

নগরবাসী নরনারীর দল উমাকে সামান্য এক মেয়ে বলিয়া ভাবিতে পারে না, তাহারা উমাকে শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি বলিয়া ভাবে। কিন্তু রজনীকান্তের মেনকা উমাকে সে সব বলিয়া ভাবিতে পারেন না, তাঁহাকে কেবল কন্যা বলিয়াই ভাবেন। উমাকে কন্যারূপে ভাবিবার সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া না যায় তাঁহার। যে জ্ঞাননেত্রে উমাকে পরমা শক্তি বলিয়া চিনিতে পারা যায়, তিনি সে জ্ঞাননেত্র চাহেন না। বলিয়া উঠেন ঃ

না না উমা দিসনে নয়ন ভাঙিস্ নে মা সুখের স্বপন
তুই আদ্যাশক্তি ভাবতে আমার চক্ষে আসে জল।
স্বপ্ন যদি হয় মা তারা করিসনে মা স্বপ্নহারা
আমি কন্যাহারা হ'তে নারি, (আমার) এক মেয়ে সম্বল ॥

স্বর্গদেবতা কবিকল্পনায় মর্ত্যমায়ার বন্ধনে ঘরের আদরিণী কন্যারূপে বিভাবিত।

শাক্তপদাবলীর অন্য একটি ভাগ জগজ্জননীর রূপ নামে চিহ্নিত। রজনী কান্তের রচিত 'আমি চাহি না ওরূপ' গানটি এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। কবির মতে জননীর মৃন্ময়ী মূর্তি নয়, তাঁহার ইঙ্গিতে যে বিশ্বভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটিত হয়। জগজ্জননীর বদন-সুষমার বিন্দু দিয়া কোটি কোটি শারদ শশীর নিষ্কলংক সৌন্দর্য্যের সমুদ্ভব, নয়নকোণে কোটি সূর্য্যের আবির্ভাব ; শ্রীপদ-নখে সহস্র আকাশের নক্ষত্রচয়, প্রতি রোমকূপে কোটি জগতের রূপ পরিদৃশ্যমান ঃ

কোটি কোটি নিষ্কলংক শরদিন্দু
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে এক বিন্দু
নয়ন কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ আবির্ভাব নিরন্তর রয়।
শ্রীপদ নখরে, এক আকাশের নয়,
সহস্র গগনের নক্ষত্রনিচয় ;

প্রতি রোমকূপে কোটি জগৎ রূপে
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়।

কবিকল্পনা এখানেই বিশ্রান্তি মানে না। নিখিল জগতের চঞ্চল সৌদামিনী-সংঘ স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত-অচঞ্চল রূপে মোহান্ধকার দূর করিতে মায়ের অধরে মধুর হাসির রূপ পরিগ্রহ করে। জগন্মাতার স্নেহ-দয়া-ক্ষমার সীমা নাই। সেই স্নেহ-দয়া-ক্ষমা মৃতসঞ্জীবনীসুধার উপমা ঃ

নিখিল জগতের সমগ্র চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল প্রশান্ত অচলা
মোহধ্বান্ত নাশি' মায়ের মধুর হাসি
অসীম-স্নেহ-দয়া ক্ষমামৃতময়।

এই জগজ্জননী জগতের জীবে দয়ার্দ্রচিত্তা হন, আশীর্বাদের বরাভয়-রক্ষাকবচ যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দেন। ইহা মৃন্ময়ীমূর্তিতে সম্ভব কি করিয়া? কোন কুম্ভকার কি ইহাকে গড়িয়া দিতে পারে?

শাক্তপদাবলীর এক উল্লেখ্য অংশ ভক্তের আকূতি। রজনীকান্তের গান এই ভক্তের আকূতি পর্যায়ে সহজেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। 'আর কতদিন ভবে থাকিব মা' গানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত শাক্তপদাবলী সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ থাকে রজনীকান্তের এই একটি রচনাই গৃহীত হইয়াছে। এই গানটিতে রজনীকান্তের ভক্তহৃদয় শ্যামামায়ের নিকট আকূতিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা-বেদনা দুঃখ-যাতনার স্পর্শ সেই গানের ভাষায়-সুরে সঞ্চারিত ঃ

আর কতদিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
(তুমি) দেখা ত দিলে না কোলে ত নিলে না
কি আশে পরাণ রাখিব মা?

এই পৃথিবীর বঞ্চনা কবিকে কাতর করে, এই মানুষের অনাদর কবিকে পীড়িত করে; কবির আক্ষেপ এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহার মায়ামোহের ঘোর কেন কাটিতেছে না ঃ

(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,
তবু মোহ নাহি টুটে ঘুম নাহি ছুটে
আর কতদিন জাগিব মা?

সঙ্গীতটির অন্তিমস্তবক একান্ত মর্মস্পর্শী। দুঃখহারিণী জননীর নিকট প্রশ্ন আর কত দিন কাঁদিবেন, কতদিন ধূলিতে ক্লিন্ন করিবেন দেহ ঃ

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,

কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো,
(আমি) আঁধারে গড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আর কত ধূলো মাখিব মা।

অন্য একটি গানে অভিমানময়ী আকুতি। নিজেকে পাতকী বলিয়া অভিহিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতেছেন তিনি যদি অন্ধকারপূর্ণ চিরমৃত্যুর সিন্ধু-সলিলে ডুবিয়া যান তাহাতে জগজ্জননীর মহিমার বৃদ্ধি ঘটিবে না :

মা গো এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধুনীরে
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।

পার্থিব জ্ঞান বুদ্ধি বল সবই পাইয়াছেন তিনি, কেবল জগজ্জননীর করুণানুশীলন করিতে পারেন নাই তিনি। কবি-কণ্ঠে সীমাহীন হতাশার অভিব্যক্তি :

মোহ ঘিরিল মোরে বহি' চির ঘুম ঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে হায়।

অবশেষে শ্রীচরণে স্থান পাইবার প্রার্থনা :

দুষ্কৃত এ পতিতে হবে গো স্থান দিতে
অশরণের শরণ শ্রীচরণ ছায় ॥

রজনীকান্ত এক সময় বুঝিতে পারেন তাঁহার সকলই ভুল হইয়া গিয়াছে ; এই জগতে কেবল পিপাসা, শ্রান্তি। মিথ্যা-মমতা তাঁহাকে ভ্রান্ত করিয়াছে। 'মা গো আমার সকলি ভ্রান্তি' গানে কবির করুণাভিক্ষা সেই জননীর নিকট :

দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
'আশা' রূপে মাগো নিরাশ প্রাণে জাগো
দিয়ে ও-চরণ, অক্ষয়-শান্তি।

শক্তিবিষয়ক কোনো গানে কবি রজনীকান্তের আত্মবিলাপের প্রকাশ। পরশরতন শক্তিজননীর কথা না ভাবিয়া সারা জীবন ছেলেখেলার খেলায় বিভোর হইয়া মাতিয়াছেন। নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন—'ও মা কোন্ ছেলে তোর আমার মতন, কাটায় জীবন ছেলে খেলায় ?'

'আমায় পাগল করবি কবে' গানে কবির শ্যামানুরক্তির গভীরতা সুষ্ঠু প্রকাশিত হইয়াছে। নির্জনে নীরবে তিনি 'মা' 'মা' করিয়া হাসিবেন, কাঁদিবেন, অবিরত ক্রন্দনে দুই নেত্র ধারাবিপ্লাবিত হইবে। কবির কামনা শ্যামারাধনায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ সবই সহ্য হইবে, দেহটা পৃথিবীতে থাকিবে, প্রাণ থাকিবে শ্যামার চরণতলে।

এই শক্তিগীতগুলি কবির ব্যক্তিচিত্তের চিন্তাভাবনাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাষা ও শব্দবিন্যাস গীতি কবিতার একান্ত উপযোগী। প্রকাশ শৈলীর নবীনতাই কেবল রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত হইতে স্বাতন্ত্র্য দ্যোতিত করে। কিন্তু ভক্তি-ভাবুকতার ভাবৈক্য সর্বত্র সমান।

চ. নজরুল সঙ্গীতে শ্যামা-কথা

কবির কোন জাতি নাই। বিংশশতাব্দীর কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় তাই শ্যাম-শ্যামার অন্তর্ভুক্তি। কবি নিজে বলিলেন ঃ

আমার মনের দোতারাতে
শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার
সেই দোতারায় ঝংকার দেয়
ওংকার রব অনিবার ॥

নজরুল সঙ্গীত বিবিধ বিষয়ে বিচিত্র। সেই বিবিধ বিষয়ের মধ্যে শ্যামা তথা শক্তি বিষয় অন্যতম। শাক্তপদ সাহিত্যের বিভিন্ন পদকে আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। সেই বিভাগগুলির মধ্যে নজরুলের শক্তিগীতিগুলির অন্তর্ভুক্তি হইবার যোগ্য। নজরুলের শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতের উল্লেখ্য অপর বৈশিষ্ট্যও আছে। তাহা গৌরীর শিবানুরাগ। এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভবে নগনন্দিনীর শংকরানুরক্তি মনে পড়িবার কথা।

'তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে
উপবাস-ক্ষীণতনু যোগিনী বেশে ॥
বুকে চাপি করতল
বিল্বপত্র দল
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে ॥
অস্তরবি তার সহস্র করে
চরণ ধরে বলে ফিরে যেতে ঘরে ॥
শিব দাও শিব দাও বলে
লুটায় ধূলি তলে
কৈলাস গিরি পানে চাহে অনিমেষে ॥'

বেলাশেষের অনশনশীর্ণতনু যোগিনী বেশ-ধরা গৌরী আপন প্রিয়ের প্রিয়-পুজোপচার বিল্বদল করতলে রাখিয়া আপন বক্ষে চাপিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রিয় স্পর্শ প্রাপ্তির আবেশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছেন। অস্ত সূর্যের সহস্র রশ্মি তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুনয় জানাইয়া ব্যর্থ হয়। মুখে শিব শিব প্রার্থনা, নয়নে শিবালয় কৈলাসের প্রতি নিমেষালস দৃষ্টি।

নজরুল কল্পনায় শিবানুরাগিনীর নিকট দিবাভাগের মতো বিভাবরীও অভিনব হইয়া দেখা দেয়। পূর্বরাগবশগা উমার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নাই। জাগরণজনিত লালিমার কথা না বলিয়া কবি বলিলেন 'আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমারুণরাগে'। প্রিয়তমের সঙ্গে বুঝি প্রথম প্রেমবিবশার স্বপ্নসংযোগ ঘটে ঃ

স্বপনে কি শিব এসে
বর দিল বরবেশে
বালিকা বলিতে নারে শরম লাগে ॥

গিরিরাণী মেনকার আদরিণী কন্যার অরুণরাঙ্গা চোখ দেখিয়া ভয় পান ; বুঝি, কন্যা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাই মাতৃকণ্ঠে জানিবার ব্যগ্রতা। 'কি হয়েছে উমা তোর ?' লজ্জার লাল আভার স্পর্শ পার্বতীর বিধুবদনে অনুপম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। সে সৌন্দর্য্য কবিভাষায় 'কুমকুম ভোরের চাঁদে'। প্রশ্ন শুনিয়া তনয়া মাতৃবক্ষে নিজ মুখখানি লুকাইতে চেষ্টা করেন। আপন প্রথমানুরাগের কথা মার নিকট কী করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই মুখ লুকাইবার মধ্যে গৌরীর শিবানুরক্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশিত। ভাষার অকৃত্রিম সারল্য সঙ্গীত-সুষমার উপচিতি বিধান করিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীতে দুর্গার আগমনী। নজরুল সঙ্গীতে দুর্গা ও শ্যামা উভয়েরই আগমনী। অর্থাৎ নজরুলে দুর্গা ও শ্যামা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক হইয়া যান।

শাক্তপদাবলীতে গিরিপুরে মেনকা, পুরবাসী ও পুরবাসিনীর দল আগমনী রচনা করিয়াছেন। নজরুল-সাহিত্য আগমনী রচয়িত্রী তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি ও কবিবাসনা। যেই-ই শ্যামা সেই দুর্গা এই ভাবনা 'রোদনে তোর বোধন বাজে আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী' গানের কলিতে প্রতিফলিত :

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী
আমরা যে তোর মানব ছেলে
আমরা ত মা দানব নই।
তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে
তাই পা রেখেছিস্ শিবের পরে
স্বামীকে তুই মা চিনতে নারিস্
চিনবি ছেলেয় কেমনে কই ॥

কবি ইহার পরেই বলেন তিনি পাষাণকন্যা। শাক্ত পদসাহিত্যে পাষাণী দুর্গার আগমনী বর্ণিত হইয়াছে :

তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ !
তুই সব খেয়েছিস্ সকল খাগি
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি
তোর আপনার ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ মুক্ত হই ॥

বৎসরান্তে দুর্গা তিনদিনের জন্য আসেন পিত্রালয় হিমপুরে। 'দশ হাতে ঐ দশদিকে মা ছড়িয়ে এল আনন্দ'। এই আনন্দের প্রকাশ তটিনীতরঙ্গের হিল্লোলে। প্রাণে প্রাণে খুশীর বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। ধরণীর পূজারিণীবেশ দেবী পূজার জন্যই। মা আসিতেছেন শরতের মেঘমুক্ত ভোরের রাঙা আলোয়। দুর্গার মুখের অভয় হাসির ছবি। অরুণ কিরণে হেরি মা তোমারি মুখের অভয় হাসি'। দশমী অন্তে দুর্গাকে কৈলাসের পথে বিদায় দিতে মাতৃ-প্রাণের ব্যথা

অর্থে হইয়া উঠে। শাক্তপদকার গণের বিজয়া শীর্ষক রচনায় তাহা অভিব্যক্তি পাইয়াছে। নজরুলও বিদায় গান রচনায় ব্যথা পান। তাই তিনি বলেন :

আয় উমা মা রাখব তোরে ছেলের সাজে
সাজিয়ে তোরে।
মার কাছে তুই রইবি নিতুই
যাবি না আর শ্বশুর ঘরে ॥

মাতৃ-হৃদয়ের বেদনার প্রকাশে নজরুলের সরল সহজ শৈলী এখানে এতই সঙ্গত যে কবি যেন মায়ের মুখের ভাষা এবং সংলাপের রীতিটি পর্য্যন্ত এখানে ধরিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য এই অংশ রচনা করিতে বসিয়া নজরুলের রামপ্রসাদী গান মনে পড়িয়া থাকিবে :

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥

শ্যামা-রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি নজরুল কেবল রূপ বর্ণনা করেন নাই, আপন অভিলাষও ব্যক্ত করিলেন :

তোর বরাভয় রূপ দেখায়ে
দূর কর মা আঁধার ভীতি।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে মা
দেখা পূর্ণ চাঁদের জ্যোতি ॥

কবির হৃদয়-কমল মাতৃপদের অরুণ দ্যুতি দেখিতে চায় বলিয়া পত্রক্রোড়ে সে কোরক হইয়া রহিয়াছে। এখনো শতদলে বিকচ বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

শ্যামারূপ বর্ণনায় কবি অন্যত্র যখন বলিলেন 'আর কি লুকাবি কোথায় মা কালী' তখনও দেখি কবির মনোবাসনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বিশ্ব-ভুবন অন্ধকার করিয়া, সুখের সংসার শ্মশান করিয়া শ্যামা মা তাঁহার ভুবন ভরা রূপ দেখাইয়াছেন। পূজার মধ্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় নাই, কবি তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন চোখের জলে। শ্যামা মা কবির ভাষায় 'দুখদুলালী'। কবিচিত্তে দুঃখের স্পর্শ গভীর বলিয়াই কবির শ্যামা দুখদুলালী। অতএব ইহাকে কেবল শ্যামাগীত বলিলে অল্প বলা হইবে। কবির ব্যক্তি হৃদয়ের প্রকাশে ইহা গীতি-কাব্য। এই গীতিকাব্য ধর্ম আরো প্রকট হয় যখন তাঁহাকে ভাষায় ভক্তের আকুতি অজস্র ধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে—'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল'। এই প্রসঙ্গে নজরুলের এই বিখ্যাত শ্যামা গীতিটি স্মরণীয় :

বল রে জবা বল্।
কোন সাধনায় পেলি শ্যামামায়ের চরণতল।
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে
আনন্দ বিহ্বল ॥

শ্যামা মায়ের প্রিয় পুষ্প জবার প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া রচিত কবির এই ভক্তি-গীতি কবিচিত্তের ভাবকে প্রকাশ করে। ভক্তজনারাধ্যা শ্যামা জননীর চরণতল যে বহু দুর্লভ সাধনার ধন। মায়ামোহময় সংসারের বন্ধন না কাটাইতে পারিলে জীবনে শ্যামালাভ ঘটে না। জবাফুল নিশ্চয়ই মায়াতরুর মোহ কাটাইতে পারিয়া শ্যামা মায়ের চরণে লুটাইতে পারিয়াছে। জবা পুষ্পের সকল অঙ্গ ব্যাপিয়া যে লালিমা তাহা তাহার আনন্দ বিহ্বলতা প্রকাশ করিতেছে।

শাক্ত পদাবলীর রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের শক্তিগীতিগুলির সংগে সম আসনে স্থাপিত হইবার যোগ্যতা গানটির আছে, ইহা বলা বাহুল্য॥

॥ শাক্তপদসাহিত্যে গীতিকাব্যচিন্তা ॥

ইংরাজীতে যাহাকে 'লিরিক' (Lyric) বলা হয় বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যে তাহার আখ্যা গীতিকাব্য হইলেও ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে তাহার কোনো সংজ্ঞা নাই। তাহা খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত। পাশ্চাত্যে 'লিরিক' কেবল প্রেমোপজীব্য কিন্তু ভারতে তাহার উপজীব্য বিষয় ব্যাপক। ভারতবর্ষ ধর্ম-অর্থকাম তিনটিকেই সমান স্থান দিয়াছেঃ 'ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ।' সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি, নীতি প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টির বিষয়বস্তু হইয়াছে।

গীতিকাব্য কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উৎকলিত করি—'গীত হওয়াই গীতি কাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল ; অগেয়গীতি কাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বক্তব্যকে আরও স্ফুটতর করিয়া বলিলেন—'যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ কি শোক, কি ভয় কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না ; কতটা ব্যক্ত হয় কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যে টুকু অব্যক্ত থাকে সেটুকু গীতি কাব্য প্রণেতার সামগ্রী।'

কবির ব্যক্তিনিষ্ঠচেতনা (Subjectivity), তীব্র ভাবানুভূতি, রোম্যান্টিকতা, পরিমিত আয়তন, সুললিত শব্দচয়ন, সুরমূর্চ্ছনাময় ছন্দোবন্ধন ইত্যাদি লিরিক বা গীতিকাব্যের গুণ।

সত্যই নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে গীতিকাব্য একেবারে স্বতন্ত্র। নিভৃতে বসিয়া, নিজের মনের কথাকে নিজের সুরে-ছন্দে প্রকাশ করাই হইল গীতি কাব্যের মৌল ধর্ম। জীবন-প্রয়োজন-বোধ-সম্ভূত বস্তুনির্ভরতা এখানে থাকে না, এখানে থাকে মন্ময় ভাবনাময় একটি কবিচিত্তের স্পর্শকাতর মর্মলোক-চারণা। এখানে থাকে না বস্তুলীন চেতনা, থাকে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে উত্তরণাকুল কবিচিত্তের আনন্দবেদনাঘন অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি সুমিত আয়তনে কাব্যের ললিতচারু প্রকাশে ও সার্বজনীন আবেদনে হইয়া উঠে সুষমা-সুন্দর। গীতি কাব্যের এই কলাবিধি শাক্তমহাজন বৃন্দ বিরচিত পদসমূহে লক্ষিত হয়।

আমাদের বাংলাসাহিত্যের শাক্তপদাবলী ভক্তিমূলকগীতি কাব্যের অন্তর্গত। এই পদাবলী কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই নয়, অগেয় গীতিকাব্য নয় ইহা শাক্ত মহাজনগণের গান—সুরে সুরে, বৈরাগীর খঞ্জনীর তালে তালে গীত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-মন হরণ করিয়া আসিতেছে।

বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া অংশে দেবী দুর্গার বাল্যাবস্থার চিত্র, কৈলাসপুর স্বামিভবন হইতে নগ-নগরী পিতৃপুরীতে বৎসরান্তে আগমন এবং পিতৃবাস হইতে পতিগৃহে গমন বিশদভাবে বিন্যস্ত ও বিবৃত। এই পর্যায়ের পদগুলিতে বাৎসল্য ভাবনার প্রাধান্য। শাক্তকবিগণের উপাস্যাদেবী দুর্গা তখন আপন আপন আদরিণী কন্যার স্থান পরিগ্রহ করেন। তাই পদনিচয়ে ভাবাবেগের তীব্রতা। কন্যার চির অদর্শনে জনক-জনকী হৃদয়ের বেদনা ও কন্যা-বিদায়ে ব্যাকুলতা কবিগণের নিজ নিজ জীবনে অনুভূতি-উপলব্ধিরূপে আগমনী-বিজয়া-পর্যায়ে কাব্যকায়া লাভ করিয়াছে,—ভাবিতে দ্বিধা নাই। এই বাল্যলীলা আগমনী ও বিজয়া শীর্ষক পদনিচয়ে কবিগণের ভক্তিবিলসিত অন্তরের পরিচয়ও পরিস্ফুট। বাল্যলীলার একপদের সমাপনাংশে রামপ্রসাদ সেন গাহিলেন ঃ

শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়
জগত-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

জগজ্জননী দুর্গাকে কন্যারূপে লাভ করিয়া হিমালয়-মেনকার অজস্র পুণ্যের উল্লেখের মধ্যে কবি-হৃদয়ের বাসনা কি ব্যক্ত হয় নাই ?

আগমনী বিষয়ে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত একটি গান। দুর্গাকে বৎসরান্তে গৃহে আনিতে গিরিরাজ হিমালয় কৈলাসপুরীতে গিয়াছেন ; দুর্গা পিতাকে প্রণাম করিতে উদ্যতা। তখন :

জগতজননী তায় প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা ;
আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে॥

পুণ্য-ফলে দুর্গাকে কন্যারূপে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও কি কবি-বাসনা অভিব্যক্ত নয়? আবার কমলাকান্তের ভক্তহৃদয় পিতা হিমালয়কে কন্যা জগজ্জননীর প্রণাম লইতে বাধা দিয়াছে। অতএব শাক্তপদাবলীতে আগমনী-বিজয়াংশে ভক্তিমিশ্র ব্যক্তিভাবনার ইঙ্গিত।

কবির ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ 'ভক্তের আকূতি', 'মনোদীক্ষা' প্রভৃতি অংশে পরিস্ফুট। তখন পদাবলীর Subjectivity বা মন্ময় চিন্তার গীতিকাব্য-ধর্মবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। 'ভক্তের আকূতি'তে কবিবক্তব্য এই যে তিনি সংসারের মায়ামোহে বন্ধ হইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। ভ্রম-ভ্রান্তিতে তিনি বিভ্রান্ত। পরপারে যাওয়ার সম্বল অর্থাৎ শ্যামাদুর্গার প্রতি ভক্তি তাঁহার সঞ্চয়ে আদৌ নাই। তাই উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতাপূর্ণ প্রার্থনা। রামপ্রসাদের একটি পদের অন্তভাগ ঃ

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।

চোখঢাকা কলুর বলদের সঙ্গে ব্যর্থ জীবন নিজেকে তুলনা করিয়াছেন কবি রামপ্রসাদ ঃ

মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?

তিনি নিজেকে ভূতের বেগার বলিয়াও অভিহিত করেন ঃ

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকে গেঁটে ॥

ভক্তিসম্বলশূন্য কবির ব্যক্তি হৃদয়ের নিঃসংকোচ প্রকাশের আরো উদাহরণ আছে অনেক। দাশরথি রায়ের একটি পদে প্রথম পাঁচ পঙ্‌ক্তিতে আপন অভিলাষ ঃ

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন ব'লতে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয়-মাঝে উদয় হ'য়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে
মিশা'য়ে ভক্তিচন্দনে। পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

'মনোদীক্ষায়' রামপ্রসাদ মনকে বুঝাইতেছেন ঃ

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তাই জাননা ?

কিংবা ঃ

মনরে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা।

মনোদীক্ষার এক পদে কমলাকান্ত মনকে কালী নামে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন ঃ

কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালী-নাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥

শ্যামাভক্ত কমলাকান্তের ব্যক্তি-অভিলাষের মতো রামকুমার নন্দী মজুমদারের অভিলাষ ঃ

মন, ভে'ব নারে ডুবে ভব-নীরে
ভব-ভাবিনীরে ভাব রে।
মা ব'লে ভাষিবে, অমনি ভাসিবে,
অশিবে নাশিবে শিবে রে ॥

ভক্তকবিগণের এই ব্যক্তি-অন্তরের ঈপ্সা সম-হৃদয়-সার্বজনীন-স্তরে সমুত্তীর্ণ। ভাবাবেগের তীব্রতার প্রকাশ 'ভক্তের আকুতি'তেই অনেক। এই সংসারের পাশাখেলায় কবি হারিয়া গিয়াছেন জানাইতে লিখিলেন ঃ

হুন্দ হলো চোদ্দ পোরা, বন্ধ পথে যায় না পাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর 'সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী', চন্দ্রনাথ দাসের 'সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলাখেলা, ধূলা ছেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'চরণ ধরে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা', এবং রজনীকান্তের ঃ

'আর কতদিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে তো নিলেনা
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?'

প্রভৃতি অংশ ভাবের তীব্র আবেগ প্রকাশের উদাহৃতি। এই অংশ-নিচয়ে ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখিলেন 'এইজন্য শাক্তপদ খাঁটি গীতিকাব্য! ইহাতে ভক্ত কবির চিত্তই মুখ্য বা একমাত্র আলম্বন।'

কবি-ধর্ম কবি-মর্ম ও কবি-কর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। শাক্তপদরচয়িতৃ-বর্গের সংসার-বিরাগী মনকে যখন কল্পনাভিসারী হইতে দেখি তখন এই দুর্জ্ঞেয়তা-বিষয়ে সন্দেহলেশ থাকে না। আকাশের শশী, কাননের শেফালিকা, নির্ঝরিণীর নির্মল শান্ত জলের শতদল কবি গোবিন্দ চৌধুরীর মেনকাচিত্তে উমা-স্মৃতির উদ্বোধ ঘটায় ঃ

সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি আমার কৈ শশিমুখী ?

শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি'
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী ?
নির্ঝরিণীর জল, হ'ল নিরমল
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল ?

কেবল স্মৃতি জাগরণ নয়, শরতের শীত সমীরণের স্পর্শ উমাশরীর-স্পর্শচেতনা আনে মেনার :

শরতের বায়ু যখন লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায়
যাও যাও গিরি আনগে উমায়
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই ?

কল্পনার এই দূরে যাত্রা সত্যই অপূর্ব। ইহার মধ্যেও আবেগ-তীব্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন মেনা-মুখে 'প্রাণ রাখা দায়'। 'যাও যাও গিরি আনগে উমায় উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই।'—অংশে তনয়াদর্শনে ব্যাকুলা জননীর চিত্ত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতের আগমন, বিহঙ্গের কলকাকলী, পুষ্পগন্ধমন্থর পবনের মন্দপ্রবাহ, গগন-ফলকে সূর্যের ক্রমপ্রকাশ মেনকাকে বিজয়া বা দুহিতার বিদায় স্মরণ করাইয়াছে। 'বিজয়া'র পদে হরিনাথ মজুমদার :

মাগো, রজনী প্রভাত হ'য়েছে।
ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥
ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে,
বিদায় দিতে তোমায় বিজয়া বলিছে ;

আগমনীতে যে প্রকৃতি বিজয়াতেও সেই প্রকৃতি। কবি কল্পনার আত্যন্তিকতা বা রোম্যান্টিকতা প্রকৃতি ব্যতীত যে প্রায়ই অসম্ভব !

কবিকল্পনাকে যুগাতিক্রামিনী হইতে দেখা যায় এমন পদও বিরল নয়। যেমন 'ভক্তের আকৃতি'-তে নবাই ময়রার পদ :

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।

এই 'ভক্তের আকৃতি'তে রামপ্রসাদের পদ :

যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?

'মা কি ও কেমন' পর্য্যায়ের রচনায় এই রামপ্রসাদের 'কালী হলি মা রাসবিহারী'-পদে :

নিজতনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী
ছিল বিবসনকটি, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নগরী, নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন-ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস এবে-মৃদু-হাস ভুলে ব্রজকুমারী।
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥

দ্বাপরের প্রতি যাত্রা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যেরও এই 'মা কি ও কেমন' শীর্ষক পদে :

জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হ'য়ে এলো কেশী, করে ল'য়ে অসি দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥

ব্রজভূমির রাসমন্দিরে রাধাদ্বিতীয় বনমাল, পীতবাস, বংশীবদন কৃষ্ণের বঙ্কিম মূর্তি, নন্দালয়ে যশোদা দুলাল নীলমণি কৃষ্ণের নৃত্যপর ছবি, বৃন্দাবিপিনে গোপীবিমোহন কৃষ্ণের কান্তি, এমন কি রাধা কৃষ্ণের রহঃক্রীড়াস্থলী যমুনাবারিও কবি কল্পনার বিষয় হইয়াছে। কবি-মনের রোম্যান্টিকতার স্পর্শ এই গুলিতে বিদ্যমান বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রোম্যান্টিকতা বা সৌন্দর্য্যপিপাসার সঙ্গে রহস্যময়তার যোগ নিবিড়। কবি জানিয়াও জানেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না—এমন রহস্যময় ভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে শাক্তপদাবলীর বহু সংখ্যক পদে।

শাক্তপদাবলীর 'জগজ্জননীর রূপ' অংশে জগজ্জননীর রূপ-বর্ণনা করিতেছেন রামপ্রসাদ। তিনি ভুবনমনোমোহিনীকে চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিতেছেন না :

ও কে রে মনোমোহিনী—
ঐ মনোমোহিনী।
ঢল-ঢল-ঢল তড়িৎ-ঘটা, মণি-মরকত-কান্তিছটা
এ কি চিত্ত-ছলনা, দৈত্যদলনা, ললনা-নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥

সাধারণ্যে দৃষ্টা হর-হৃদি বিহারিণী শ্যামা কালিকার মূর্তি এ নয়। অঙ্গেঅঙ্গে সুষমাময়ী সৌদামিনীর সমন্বয়, মিলন মাণিক্য-মরকতাদিমণির। দৈত্যদলনা বটে তবে চিত্তছলনাও। পদ্মিনীপরাভবকারিণী মূর্তি তাঁহার।

রহস্যময়তার সঙ্গে বিস্ময়ের সুবলন এই রামপ্রসাদের অন্যএকপদে :

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে ধরি করতলে গজ-গরাসে ॥

শ্যামলিমার সঙ্গে নীলিমার মিশ্রণ শ্যামাশরীরে প্রত্যক্ষ করেন কবি। অর্ধচন্দ্রকপালিনীর নীলকমলোপম মুখমণ্ডলে অপূর্বশ্রী, রূপচ্ছটায় দামিনী-প্রতিভাস ঃ

কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর-নিকর তিমির নাশে ;
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘনঘোর রবে উঠে আকাশে।

কমলাকান্তের রচনার মধ্যেও পরিচিতির মধ্যে অপরিচয়ের দ্যোতনা ঃ

রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্ত কেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ংকরী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥

মহারাজ মহতাব চাঁদের পদেও এই একই কল্পনা 'কেও বিবসনা, রুধিরে মগনা রক্তবর্ণা কার নারী' কিংবা 'অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা'। অজ্ঞাত কোনো কবির রচনায় যখন পড়ি 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ-রাশি,' তখন তাঁহার চিন্তার বিভাবনা চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। কালিমায় আলোক প্রকাশ। কবি-ভক্তের হৃদয়ে গহন অন্ধকারে আশার আলোক তো ঐ আলোকময়ী জননী! বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দ আচার্যের রচনায় রাধারূপ বর্ণনায় পাই ঃ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা যায়।

কিন্তু শাক্তমহাজনরচনাতে শ্যামারূপ বর্ণনায় 'ঢল-ঢল-ঢল তড়িৎঘটা মণি-মরকত-কান্তি ছটা', বা 'রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়' ইত্যাদি সত্যই বিস্ময়াবহ।

শাক্তপদাবলী-সংকলিত অধিকাংশ পদই গান। সেখানে সুরের প্রাধান্য হইলেও কোথাও কোথাও ললিত ছন্দোবন্ধন ও শ্রবণ-সুখদশব্দচয়ন লক্ষণীয়। মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রচিত একটি কবিতা ; অনুপ্রাস-উৎপ্রেক্ষা-ব্যতিরেক প্রভৃতি অলংকার-সন্নিবেশও সুন্দর ঃ

তুষার ধবল হৃদে নীলিম নলিনী
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি'
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥
সদা মনে অভিলাষ কাটিয়ে সংসার পাশ ;
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ-দুখানি॥

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত জগজ্জননীর রূপ মনোহর ছন্দে-শব্দে অনবদ্য ; অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারও চারু ঃ

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তল দল বিজড়িত পায় পায়॥

নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্মফোটে
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়।
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়।

এই গিরিশচন্দ্রেরই অন্য একটি লোভনীয় রচনা সরল ও প্রাঞ্জল, ব্যতিরেক অনুপ্রাসাদিতে মণ্ডিত ঃ

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভুষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায়!
পদ্মভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে
এলোকেশী কে রূপসী ডাকলে তাপিত-প্রাণ জুড়ায়॥

ত্রিপদীবাহিত, শ্লেষ-যমক-রূপক ইত্যাদি অলঙ্কারে শোভিত শ্রুতিসুখকর একটি পদের একাংশ ঃ

মন, ভে'ব নারে ডুবে ভব-নীরে
ভব-ভাবিনীরে ভাব রে।
মা ব'লে ভাষিবে, অমনি ভাসিবে
অশিবে নাশিবে শিবে রে॥
কেন অহরহ বৃথা কাজে রহ,
ত্বরিতে তরিতে তরীতে আরোহ
তরণী তারিণী-পদ-সরোরুহ,
তনুরুহ-রূপে যে ধরে ভবে রে॥

উদ্ধৃত পদটির রচয়িতা রামকুমার নন্দী মজুমদার, পদটি 'মনোদীক্ষা' বিভাগের।

॥ শাক্তপদসাহিত্যে সমাজ-চিন্তা ॥

কোনো না কোনো প্রকারে সাহিত্য সমাজরূপের দর্পণ হইয়া উঠে। আমাদের দুই সুসমৃদ্ধ পদাবলী সাহিত্য ইহার ব্যতিক্রম না হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা শাক্ত পদাবলীতে তদানীন্তন সমাজ স্ফুটতর প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। শাক্তমহাজনগণের গান ভক্তিরসবিলসিত হইলেও গানের প্রকাশ-শৈলী বাস্তবের কঠিন ভূমিকে বারংবার স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। বাল্যলীলা, আগমনী-বিজয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা প্রভৃতি সব পর্য্যায়ের গানেই বাংলার সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবিম্বন প্রতিভাত হয়।

উমার বাল্যলীলা বর্ণনায় রামপ্রসাদ সেন বলিতেছেন আকাশের চন্দ্রকে ধরিয়া দিবার আবদার জুড়িয়াছে উমা। এই অসম্ভব প্রার্থনা পূরণ করিতে জননী মেনা বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এদিকে উমাও কাঁদিয়া আঁখি ফুলাইয়াছে, স্তন্যপান পরিত্যাগ করিয়াছে, পরিত্যাগ করিয়াছে ক্ষীর-ননী-সর গ্রহণ। তখন মেনা স্বামী হিমগিরিকে কন্যা সম্পর্কে বলিতেছেন :

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান, নাহি খায়
ক্ষীর ননী সরে।

অবোধ শিশুকে লইয়া বঙ্গগৃহের জননীচিত্তের উদ্বেগ ও স্বামীর সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ ইত্যাদি রামপ্রসাদের অবিদিত থাকিবার কথা নয়। তাই বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের সুন্দর চিত্র তাঁহার পদে ধরা দিয়াছে।

জননীর কথা শুনিয়া পিতা কন্যা-সান্ত্বনার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন :

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে ॥

শিশু-সান্ত্বনার জন্য এবম্বিধ প্রয়াসও বঙ্গ-সমাজে লক্ষিত হয়।

দুরন্ত শিশু ঘুমাইলে জননী শান্তি পান। চঞ্চল শিশু সহজে ঘুমাইতে চাহে না। কবি রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার এক পদে উমার চঞ্চল স্বভাব প্রকাশ করিয়া মেনকাকণ্ঠে জয়াসম্ভাষে বাণীরূপ দিলেন :

আর জাগাস, নে মা জয়া, অবোধ অভয়া
কত ক'রে উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

জনক-জননীর হাত ধরিয়া হাঁটিহাঁটি পা-পা করিয়া চলার ছবি বাঙ্গালী সমাজে অতি পরিচিত। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জ্জা) সেই ছবিকে তাঁহার পদে রূপ দিলেন :

চঞ্চল চরণে চলে অচল নন্দিনী
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা ধন্য ধন্য গণি ॥

বৎসরান্তে কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া লইবার ত্বরা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর ভবনে ভবনে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহা ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষ রীতি। সারা বৎসর কন্যার জন্য জননী চিত্তের কতো না অধীরতা, সেই অধীরতা কন্যা যতো সুখিনী হউক তাহার সম্পর্কে, দুঃখিনী হইলে তো কথাই উঠে না। আবার সেই কন্যাকে যখন শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হয় তখন জনকজননী আত্মীয়-পরিজনের বেদনা অসীম হইয়া দেখা দেয়। বাস্তবের এই চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া শাক্তপদসাহিত্যের আগমনী-বিজয়া অংশের বিরচন। আগমনী-বিজয়া পর্য্যায়ের গীতাবলী বাঙ্গালী সমাজের বিচিত্র-চারু স্বভাবসৌন্দর্য্য, রীতি-নীতি, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতির পরা প্রকাশনী হইয়া সমগ্র শাক্তপদসাহিত্যকে বাঙ্গালীর প্রাণের কাব্যে পরিণত করিয়াছে।

বাঙ্গালী সমাজে দেখা যায় কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়াছে, সঙ্গে আসিয়াছে জামাতা। আগমনী গানে অজ্ঞাত কোনো লেখক লিখিলেন :

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে,
গিরিপুরে ক'রবো শিবস্থাপনা।

কন্যার সঙ্গে জামাতা পাইলে কন্যার জনক-জননীর আনন্দ যে বাড়ে, তাহা বাঙ্গালীর অজানা থাকিবার কথা নয়।

বঙ্গ জননীর কন্যামমতা কত গভীর হয়, তাহার প্রকাশ রামপ্রসাদী সঙ্গীতে—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই ব'লে মানবো না ॥

জননী মেনকার আদরিণী কন্যা এমন ঘরে পড়িয়াছে যে 'শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।' মেনকার এ-ভাবনা সকল বাঙ্গালী মায়েরই ভাবনা।

দুহিতার জন্য উদ্বিগ্না মাতা মেনা কুস্বপ্ন দেখেন, স্বামী গিরিরাজকে গৌরী আনিতে বলেন। কবি গিরিশচন্দ্র :

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী ;
... ...

... ...
উঠ হে উঠ অচল পরাণ হ'ল বিকল
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধা রাশি।

কবি কমলাকান্তের পদেও মাতৃ-হৃদয়ের এই আকুলতা ঃ

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হ'য়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।

কন্যাকে ঘরে আনিতে পিতা-মাতার কথোপকথনের মতো পিত্রালয়ে আনিবার অনুমতি প্রার্থনায় কন্যা-জামাতার সংলাপ বাঙ্গালী গৃহস্থজনের অতি পরিচিত বিষয়। কবি কালীনাথ রায়ের এক পদে পিতা হিমাচল যখন কন্যা উমাকে বলেন ঃ

চল মা চল মা গৌরি গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতা-মাতার ॥

তখন উমা স্বামী শঙ্কর সন্নিধানে বলেন ঃ কবি অজ্ঞাত—

বদন তোল মদন-রিপু যাব পিতার বসতি।
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগীন্দ্র দেও অনুমতি

কন্যাকে নিকটে পাইবার জননী চিত্তের আকুলতার মতো জননী-নিকটে যাইবার জন্য কন্যার আকুলতা। কবি কমলাকান্ত এক পদে গাহিতেছেন ঃ

গঙ্গাধর হে শিবশংকর. কর অনুমতি হর, যাইতে জনকভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে ॥

বঙ্গ সমাজে বিবাহিতা কন্যা স্বামিগৃহ হইতে পিতৃ-পুরে প্রত্যাবর্তন করিলে বাল্য-কৈশোরের সঙ্গিনীগণের হৃদয়াবেগ-উল্লাসের ছবি কবি রামপ্রসাদ সেনের কবিতায় ঃ

যত সহচরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে—বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।

দুহিতাকে নিকটে পাইয়া পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দ বঙ্গ গৃহকে যেভাবে উচ্ছল করিয়া তোলে সেই উচ্ছলতা নগপুরে। কমলাকান্ত লিখিলেন ঃ

আমার উমা এলো' ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী সারি সারি সারি দৌড়ি গৌরীমুখ-পানে চায়।
... ...

... ...
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুরে কিন্নরীগণ সাজে ;
কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুরসহচরী সঙ্গে ;
আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায় ॥

বহু দিনান্তে পিত্রালয়ে আগতা কন্যার প্রতি জননীর আদর যত্ন বঙ্গ গৃহে কত ঐকান্তিক ও স্নেহপূর্ণ হইয়া উঠে তাহার ছবি রাজা মহেন্দ্রলাল খানের একটি পদে প্রতিবিম্বিত ঃ

ওগো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ বারেক ডাক 'মা' ব'লে।
পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হ'য়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন কমলে।

কন্যাবৎসলা বঙ্গমাতা কন্যাকে আরো কিছুদিন ধরিয়া রাখিবার কত কৌশলই না করেন। বিজয়া পদে গিরিশ ঘোষ মেনকাকে বঙ্গমাতা করিয়া তুলিয়াছেন ঃ

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে!
বলে বলুক যে যা বলে মানবো না আর জামাই ব'লে;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে।

কমলাকান্তের জননী মেনা বঙ্গ জননীই। মেনকা জয়াকে দিয়া জামাইকে বলেন ঃ

জয়া, বলগো পাঠানো হবে না।
হর, মায়ের বেদন কেমন জানে না॥

দরিদ্র জামাতার গৃহে কন্যা পাঠাইতে স্বচ্ছ অবস্থাসম্পন্না বঙ্গমাতার যে অনীহা ভিখারী শিবের গৃহে উমা পাঠাইতে রাজনারী মেনার সেই অনীহা ঃ

একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার
পরিধান বাঘ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি।
সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে।

সমাজের নানা আচার, শাক্তপদ সাহিত্যের বিভিন্ন পদে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মা কি ও কেমন' পর্য্যায়ের গোবিন্দ চৌধুরীকৃত একটি পদে পুতুলখেলার ইঙ্গিত—'কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুত্তলি সনে'। 'ভক্তের আকুতি' পর্য্যায়ে রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকে লিখিলেন ঃ

ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঞ্জুরি প'লো॥
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভালো,।
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঞ্জা ছকায় বদ্ধ হলো॥

পাশাখেলার মতো গ্রাবু খেলার উল্লেখ পাই 'মনোদীক্ষা' পর্য্যায়ে রসিকচন্দ্র রায়ের এক পদে ঃ

সাধনরূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা মেরে ॥

'ভক্তের আকূতি' অংশে ভোজবাজি ও ভানুমতীর খেলের কথা আছে। কুহক বিদ্যার উল্লেখও সেইখানে। কবি প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ

ভোজের খেলা খেলতে ভবে
আমারে একলা পাঠালি।
ও মা কি ভাব ভেবে বল্‌না শিবে
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি ॥

এই পদেই মায়াময়ী ভানুমতীর কুহকজালের সমুল্লেখ ঃ

মনে করি খেলবো না আর,
ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক
আবার তার কুহকে ভুলি ॥

কবি রামপ্রসাদ সেন 'ভক্তের আকূতি' অংশে এক পদে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন। সেখানে ডিক্রী, আসামী, প্যাদা, জমিদারী, হুজুর, উকিল, ডিসমিস, সওয়াল-বন্দি ইত্যাদি সবই বর্তমান। পদটির আরম্ভ এই রকম ঃ

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পদে গারদ বা জেলখানার রূপক ; সেখানে মেয়াদ, গারদ, দূত, পায়ের বেড়ি প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে ঃ

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারাসুত পায়ের শৃঙ্খল ॥

কবি রামপ্রসাদ এই সংসারে নিজেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত কলুর বলদের সঙ্গে তুলনা করিয়া শক্তি দেবতার নিকট আকূতি নিবেদন করেন,—কলুর বলদ বাংলাদেশের সমাজে অতি পরিচিত ঃ

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষ করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ॥

এই ভবসংসারে কবি বৃথা পরিশ্রমই শুধু করিয়াছেন, তাই কণ্ঠে নির্বেদ। পরপারে যাওয়ার কোনো কাজই করেন নাই তিনি। তাই নিজেকে ভূতের বেগার বলিয়া অভিহিত করিয়া বৃথা পারিশ্রমিকের বেগার মজুরীর কথা বলিতেছেন অন্য এক বিখ্যাত পদে ঃ

মলেম ভূতের বেগার-খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সমাজের কৃষিপ্রাণতা ভক্তকবি রামপ্রসাদের অজ্ঞাত থাকিবার কথাই নয়। 'মনোদীক্ষা' শীর্ষক পদে কবি লিখিলেন ঃ

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইলো পতিত, আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা।

'আলো-চাল-বুট ভিজানা' দিয়া মাতৃ-পূজা ও 'মেষ-মহিষ আর ছাগল-ছানা' দিয়া বলি প্রথার উল্লেখ এই রামপ্রসাদ সেনেরই এক পদে ঃ

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়
আলোচাল আর বুট-ভিজানা ?
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ?

ঘুস বা উৎকোচ-প্রথা রামপ্রসাদেরও আমলে বর্তমান ছিল। তাই তিনি পদটির উপসংহারে লিখিলেন ঃ

প্রসাদ বলে, ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো ক'রবে পূজা, মা তো আমার ঘুস খাবে না ॥

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন পদে গলায় ফাঁস, কুশপুত্তলিকা দাহ, তবিলদারী, রজক, চোরকুঠুরী, ঘুড়ি-উড়ানো, বন্ধক, সতীন, গয়া-গঙ্গা-বারাণসী-দ্বারক-মথুরাপুরী ইত্যাদির উল্লেখ প্রাচীন সমাজব্যবস্থার বিচিত্ররূপ ও প্রথাকে উদ্ঘাটিত করে।

পরিশিষ্ট

বৈষ্ণবশাস্ত্র পদাবলীর অলংকার, ছন্দ, ভাষাশৈলী, প্রবচন-অর্থগৌরবধন্যস্, ভাষিত পদাংশ।

বৈষ্ণবপদাবলী হইতে সঙ্কলিত কয়েকটি অলঙ্কারের উদাহরণ

অনুপ্রাস ঃ

অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ ॥
স্বরবর্ণের বৈষম্য থাকিলেও ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনিসাম্য হইলে হয় অনুপ্রাস অলংকার ঃ

১. শোন্ শোন্ লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি,—
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ
করিলি কি।—কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি

২. কান্তকাতর কতহুঁ কাকুতি
করতকামিনী পায়—বিদ্যাপতি

৩. কুবলয় কন্দনা কুসুম কলেবর
কালিম কান্তিকলোল।
কোমল কেলিকদম্বকরম্বিত
কুন্তল কান্ত কপোল।
—গোবিন্দদাস

৪. মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শবদ গাঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুল মালে রঞ্জ।
অঞ্জনযুত কুঞ্জ নয়নী খঞ্জন
গতি হারী ॥—জগদানন্দ

শ্লেষ ঃ

শ্লিষ্টৈ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে ॥ একটি মাত্র শব্দের এক বার মাত্র প্রয়োগে অর্থের ভিন্নতা ঘটিলে শ্লেষ অলংকার হয় ॥

১. স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।

যমক ঃ

সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে॥
পৃথক্ অর্থ থাকিয়া বা না থাকিয়া স্বরধ্বনি সহ ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমিক ব্যবহারকে যমক অলংকার বলা হয়॥

১. সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তনু সমাধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥
—বিদ্যাপতি

২. যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল
—জ্ঞানদাস

৩. নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল
শ্রমজল ঢল ঢল বদন হনু চন্দ।
—গোবিন্দদাস

ব্যাজস্তুতি ঃ

উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।
নিন্দা-স্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং
গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ॥
ব্যঞ্জনার দ্বারা নিন্দা স্থানে স্তুতি এবং স্তুতিস্থানে নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়॥

১. সুনয়নী কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরির সম লাগি।
রসবতী তাক পরশরশে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
—গোবিন্দদাস

২. যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায়রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বামরে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নামরে।
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নামা পায়
শ্যাম গন্ধ॥—চণ্ডীদাস

বক্রোক্তি ঃ

অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা
যোজয়েদ্ যদি।
অন্যঃ শ্লেষেণ কাক্বা বা
সা বক্রোক্তিঃ॥
বক্তার অভিপ্রেত অর্থের পরিবর্তে শ্রোতা অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়॥

১. ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলু বিদগধ রাজ॥
নয়ন কাজর অধরক শোভা।
বান্ধি রাখল অতি অতি
মনোলোভা॥—জ্ঞানদাস

সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ ।।

একটি বাক্যে দুইটি ভিন্ন পদার্থের বাচ্যসাদৃশ্য দেখান হইলে উপমা অলংকার হয় ।।

১, অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা—চণ্ডীদাস

২. কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।
—গোবিন্দদাস

৩. তিলেক না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি।
—চণ্ডীদাস

৪. তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুতমিতরমণী সমাজে।
—বিদ্যাপতি

৫. দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে হেন নীল
সরোমাঝে ।।—চণ্ডীদাস

৬. কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে ।।
—চণ্ডীদাস

স্মরণ ঃ

সদৃশানুভবাদ্-বস্তু-স্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে ॥

কোনোও বস্তুর অনুভবদ্বারা তাহার সদৃশ অন্য বস্তুর স্মৃতি মনে জাগিলে স্মরণ অলঙ্কার হয় ॥

১. কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কালকেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥
—চণ্ডীদাস

২. এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নবপরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥—চণ্ডীদাস

রূপক ঃ

রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে
নিরপহ্নবে ॥

উপমেয়কে অস্বীকার না করিয়া তাহার সহিত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয় ॥

১· বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅরসপীবে—বিদ্যাপতি

২· নয়ন কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিঁধিতে চায়—গোবিন্দদাস

৩. হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমকহার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
—বিদ্যপতি

৪· শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
—বিদ্যাপতি

৫. দিয়া হাস্য-সুধা-চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেইকালে পড়িল রূপেরজালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় লাগিল ॥
ধৈর্যশীল-হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥
(আমার) চিত্তশালে মত্তহাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ॥
—জগদানন্দ

৬· গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়—উদ্ধবদাস

৭. শ্যামশুক পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে ॥—চণ্ডীদাস

ব্যতিরেক ঃ

আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানা—
ন্যূনতা হথবা। ব্যতিরেকঃ—
উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইলে ব্যতিরেক অলংকার হয় ॥

১. অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা
তরুণারুণ থলকমল দলারুণ
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা ॥—গোবিন্দদাস

২. কিবা দন্ত ভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথার সিন্দুরে জিনিয়া অরুণে
কানে কর্নবালা ঢোঁড়ি ॥
শ্রীফলযুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী জিনিয়া কৃশমাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করিকর পরা ॥
চরণযুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায় ॥—চণ্ডীদাস

৩. জিনি ময়মত্ত হাতী গমনমন্থরগতি
ধরণী করয়ে টলমল ॥—জ্ঞানদাস

উৎপ্রেক্ষা ঃ

ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা
প্রকৃতস্য পরাত্মনা।
প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলিয়া যখন উৎকট এককোটিক সংশয় জাগে, তখন উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

১. চঞ্চললোচনে বংক নেহারনি অঞ্জন
শোভন তায়,
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায় ॥—বিদ্যাপতি

২. নব নীরদ তনু তাড়িত লতা জনু
পীতপতনি বনি ভাল
—গোবিন্দ দাস

৩. চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়শীর ডরে ॥
—জ্ঞান দাস

৪. সুমেরু উপরে হার সুরেশ্বরী
ভরে ভাঙ্গি পাছে যায় ॥
—কবি শেখর

৫. সজনি ভল কএ পেখন না ভেল।
মেঘমালা সয়ঁ তড়িত-লতা জনি
হিরদয়ে শেল দঈ গেল ॥
—বিদ্যাপতি

৬. যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরিরেহা
দন্দ পসারি গেলি ॥—বিদ্যাপতি

৭. চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা ॥
বদন মোছল পরচুর। মাজি ধয়ল
জনু কনক মুকুর।
তেই উদসল কুচজোরা। পলটি
বৈসাওল কনক বটোরা ॥
—বিদ্যাপতি

অসঙ্গতি ঃ

কার্য্যকারণয়োর্ভিন্নদেশতায়ামসঙ্গতিঃ ॥
কার্য্য এবং কারণ দুই পৃথক্ আশ্রয়ে
অবস্থান করিলে অসঙ্গতি
অলঙ্কার হয় ॥

১. নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি ॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর ॥
... .
... .
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুঁহু কহ গদগদ ভাষ ॥
—গোবিন্দদাস

২. আর অপরূপ কহিল নহে।
যথা মেঘ তথা বারি না রহে ॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়ন যুগলে বহায় বারি ॥
—জ্ঞানদাস

অপহ্নুতি ঃ

প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ ॥

উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া উপমানের স্থাপনা হইলেই অপহ্নুতি অলংকার হয় ॥

গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন যদি শ্লেষেণান্যথা বান্যথয়েৎ সাপ্যপহ্নুতিঃ ॥

১. কাহাঁ নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ পদ এহ ॥
—গোবিন্দদাস

২. ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণদাগ মিছাই ভাবহ ॥
—চণ্ডীদাস

নিশ্চয় ঃ

অন্যান্নিষিধ্য প্রকৃতস্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ ॥

উপমানকে নিষেধ করিয়া উপমেয়ের স্থাপনা হইলেই নিশ্চয় অলংকার হয় ॥

কতি হুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সংকর হুঁ বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ।
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ নহঞ কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহ এহন সুছন্দ।
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ পংক ॥
—বিদ্যাপতি

ভ্রান্তিমান ঃ

সাম্যাদতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতা ॥

এক বস্তুকে যদি অন্যবস্তু বলিয়া ভ্রম হয় এবং যদি কবিপ্রতিভার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাহা হইলে ভ্রান্তিমান্ অলংকার হয়।

১. ফুয়ল কবরী উরহি লুঠাওত
কোরে করত তুয়া ভানে।
—জ্ঞানদাস

২. রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়াভাবে তরু দেই কোর।
—গোবিন্দদাস

৩. দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল-কুল ॥
আঁখি তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্মভাবি লুব্ধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥—চণ্ডীদাস

বিষম ঃ

গুণৌ ক্রিয়ে বা চেৎ স্যাতাং
বিরুদ্ধে হেতুকার্য্যয়োঃ।
যদ্বারব্ধস্য বৈফল্য মনর্থস্য চ সম্ভবঃ।
বিরূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং
মতম্ ॥

কারণ ও কার্য্যের বিরূপতা, ঈপ্সিত ফলের স্থলে অবাঞ্ছিত ফল এবং একই আধারে একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন ঘটিলে বিষম অলঙ্কার হয় ॥

১. কনকাচল যব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিনফলে দিনকর শীত না-
নিবারল
হাম জীয়ব কথি লাগি ॥
—জ্ঞানদাস

২. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥—চণ্ডীদাস

নিদর্শনা ঃ

সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধো হ সম্ভবন্
বাপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ
সা নিদর্শনা ॥

ব্যঞ্জনায় দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্ভব বা অসম্ভব সম্বন্ধ দ্যোতিত হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয় ॥

১. জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরঈ।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরঈ ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥
জহাঁ জহাঁ নয়নবিকাস।
তঁহি তঁহি কমলপরকাস ॥
জহাঁ লহু হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অঁমিয় বিথার ॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ।
তহিঁতহিঁ মদন সরলাখ॥-বিদ্যাপতি

২. হাসিখানি মুখেতে মিশায় ;
নবীন মেঘের কোরে বিজুরী
প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইল তায়।—জ্ঞানদাস

দৃষ্টান্ত ঃ

দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ
প্রতিবিম্বনম্ ॥

উপমেয় এবং উপমান দুই পৃথক্ বাক্যে থাকিয়া উভয়ের ভিন্ন ধর্ম সত্ত্বেও ভাবসাদৃশ্যে একই সাধারণধর্মে পরিণত হইয়া এবং তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া যে অলঙ্কার হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত ॥

১. সবঁহু মতঙ্গকে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী ॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত ॥
—বিদ্যাপতি

২. অঙ্কুরতপনতাপে যব জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিফলে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয় নেহে ॥
—বিদ্যাপতি

সমাসোক্তি ঃ

সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র
কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপ ঃ
প্রস্তুতে হন্যস্য বস্তুনঃ ॥

কার্য্য, লিঙ্গ এবং বিশেষণের দ্বারা প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার সমারোপিত হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় ॥

১. মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া
বাজে ও-অধরমৃত খাইয়া খাইয়া ॥
—শ্রীরঘুনন্দন

২. নাসিকা সো অঙ্গ সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম ॥
—গোবিন্দদাস

অর্থান্তরন্যাস ঃ

সামান্যং বা বিশেষেণ
বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্য্যং চ কারণেনেদং
কার্য্যেণ চ সমর্থ্যতে ॥

সামান্য বিশেষের দ্বারা বিশেষ সামান্যের দ্বারা এবং কার্য্য কারণের দ্বারা, কিংবা কারণ কার্য্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয় ॥

১. মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার
মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে
কিনা হয় ॥—চণ্ডীদাস

২. দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সবদুর ভেল ॥
ভণই বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔষধে ন রহ বিয়াধি ॥
—বিদ্যাপতি

স্বভাবোক্তি ঃ

স্বভাবোক্তিদুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপ-
বর্ণনম্ ॥

কোনোও বস্তুর বর্ণনা যদি সূক্ষ্ম ও চমৎকার হয়, তাহা হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয় ॥

১. দাঁড়াইয়া নন্দের আগে
গোপাল কাঁদে অনুরাগে
বুক বহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে
অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥
আনের ছাওয়াল যত
তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বাঁধে কারে।
যে বল সে বল মোরে
না থাকিব তোমার ঘরে
এনা দুঃখ সহিতে না পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননী
মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করে বিচার ॥
—বলরামদাস

অতিশয়োক্তি ঃ

সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে ॥
উপমানের দ্বারা উপমেয়ের নিগরণ অর্থাৎ পূর্ণগ্রাস যখন সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, তখন অতিশয়োক্তি অলংকার হয় ॥

১. অধিক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ ॥
—গোবিন্দ দাস

২. যাঁহা যাঁহা নিকট সই তনু তনু
জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ্গু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
—গোবিন্দ দাস

৩. গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা
জানি।
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ
কে রোপিল আনি ॥—জ্ঞান দাস

বিশেষোক্তি ঃ

সতি হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা ॥
হেতু বা কারণ থাকিলেও যদি ফলাভাব ঘটে, তবে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয় ॥

১. যদি করি বিষপান
তথাপি না যায় প্রাণ
অনল আমারে নাহি দহে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়
মরণ যে বাসে ভয়।
কালা যার হিয়া মাঝে রহে ॥
—চণ্ডীদাস

বিভাবনা ঃ

বিভাবনা বিনা হেতুং
কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।
হেতু-ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি ঘটিলে বিভাবনা অলংকার হয় ॥

১. এ ছার নাসিকা মুই যত
করি বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায়
শ্যামগন্ধ ॥—চণ্ডীদাস

আক্ষেপঃ

বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষ-
প্রতিপত্তয়ে।
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগো
দ্বিধা॥

যাহা প্রকৃতপক্ষে বলিবার ইচ্ছা, বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য তাহা যদি নিষেধের মত করিয়া উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে আক্ষেপ অলংকার হয়॥

১. সখিগণ সাহস ছুবই ন পারই
তন্তক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লি
চলি কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেলি সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি জানে॥
—বিদ্যাপতি

অপ্রস্তুত প্রশংসাঃ

ক্বচিদ্‌-বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা
বিশেষতঃ।
কার্য্যান্নিমিত্তং কার্য্যং চ হেতোরথ
সমাৎ সমম্‌॥
অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতং চেদ্‌ গম্যতে
পঞ্চধা ততঃ।
অপ্রস্তুত প্রশংসা স্যাদ্‌॥

১. নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজি ভাল॥
অধরের তাম্বুল কপোলে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়াটি
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হ'লে মরি লাজে॥
—চণ্ডীদাস

বিরোধাভাসঃ

জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈ গুর্ণো
গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ॥
ক্রিয়া ক্রিয়াদ্রব্যাভ্যাং যদ্দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা
মিথঃ।
বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোঽসৌ
দশাকৃতিঃ॥

যখন সাধারণভাবে দুইটি বস্তুকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, অথচ তাৎপর্য্যে সেই বিরোধ দূরীভূত হয়, তখন বিরোধাভাস অলংকার হয়॥

১. সবে বলে মোরে কানুকলঙ্কিনী
গরবে ভরল দে—জ্ঞান দাস
২. রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।—চণ্ডীদাস
৩. সজল নয়ান করি
পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগচারি—বিদ্যাপতি
৪. দশ দিশি বিরহ হুতাশ।
শীতল যমুনা জল
অনল সমান ভেল
ভণতহি গোবিন্দ দাস॥
—গোবিন্দ দাস

শাক্তপদাবলী হইতে সঙ্কলিত কয়েকটি অলঙ্কারের উদাহরণ

অনুপ্রাস ঃ ১. চঞ্চল চরণে চলে অচল-নন্দিনী—কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
(কালীমির্জা)

২. ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন তরঙ্গ
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে —হরিনাথ মজুমদার
(কাঙাল ফকিরচাঁদ)

৩. নগবালা নব নলিনীমাল, নবনীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর শোভিত-ভাল তড়িত জড়িত চরণে
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্লেষ ঃ ১. গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে —রামনিধি গুপ্ত

২. তুমি তো অচল গতি বল কি হইবে গতি —ঈশ্বর গুপ্ত

যমক ঃ ১. শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা
মায়ের আমার নাম তারা ত্রিনয়নে তিন তারা
—অন্ধচন্ডী

২. তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
—রামদুলাল নন্দী

উপমা ঃ ১. তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী
—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)

২. তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ পানে।
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

স্মরণ ঃ ১. হেরিয়ে গগনতারা মনে হলো প্রাণের তারা —অন্ধচন্ডী

২. সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি আমার কৈ শশিমুখী —গোবিন্দ চৌধুরী

রূপক ঃ ১. কালী-পদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান্ উড়তেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল
—নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২. মজিল মনভ্রমরা কালী পদ নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ব্যতিরেক ঃ ১. শারদ শশী বঙ্কিম, করি ঐ আভাহীন
পশ্চিম গগনে ঐ উমা মুখ ভাসেরে —নবীনচন্দ্র সেন

২. চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা জিনি শীঘ্রগামিনী, চপলারূপে আলো করে
—গৌরমোহন রায়

উৎপ্রেক্ষা ঃ ১. তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি
—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালীমির্জা)
২. আনচান করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী যেন ব্যাকুল অন্তরে —রামচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩. কে রে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে —রামপ্রসাদ সেন

সমাসোক্তি ঃ ১ রজনী, জননী, তুমি পোহায়োনা ধরি পায় —অজ্ঞাত
২. ওরে নবমী-নিশি না হইও রে অবসান।
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
৩ যেয়ো না রজনি, আজি ল'য়ে তারাদলে—মধুসূদন দত্ত

বৈষ্ণবপদাবলীর সাধারণ ছন্দোরীতির দু-একটি উদাহৃতি

১. একাবলী ঃ

(ক) ও নব/জলধর/অঙ্গ। ৪+৪+৩
ইহথির/বিজুরিত/রঙ্গ ॥
ও বর/মরকত/ঠান।
ইহ কা/ঞ্চনদশ/বাণ ॥
—গোবিন্দ দাস

(খ) বহু দিন পরে/বঁধুয়া এলে ৬+৫
দেখা না হইত/পরাণ গেলে
এতেক সহিল/অবলা বলে
ফাটিয়া যাইত/পাষাণ হলে॥
—চণ্ডীদাস

২. পাদাকুলক ঃ

(ক) মন্দির/বাহির/কঠিনক/পাট
৪+৪+৪+৪
চলইতে/শঙ্কিল/পঙ্কিল/বাট
—গোবিন্দদাস

(খ) চির চন/দন উরে/হার ন/দেলা।
৪+৪+৪+৪
সো অব/নদী গিরি/আঁতর
/ভেলা ॥—বিদ্যাপতি

৩. পজ্ঝটিকা ঃ

অব মথু/রাপুর/মাধব/গেল।
৪+৪+৪+৪
গো কুল/মাণিক/কো হরি/নেল ॥
—বিদ্যাপতি

৪. পয়ার ঃ

(ক) তোমারে বুঝাই বন্ধু/তোমারে বুঝাই। ৮+৬
ডাকিয়া সোধায় মোরে/হেন জন নাই ॥—চণ্ডীদাস

(খ) রূপলাগি আঁখি ঝুরে/গুণে মন ভোর। ৮+৬
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে/প্রতি অঙ্গ মোর ॥—জ্ঞানদাস

৫ ত্রিপদীঃ

(ক) বঁধু কি আর বলিব তোরে
(২)৮
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
৬+৬
রহিতে না দিলি ঘরে ।। ৬+২
—চণ্ডীদাস

(খ) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
৬+৬
অনলে পুড়িয়া গেল । ৬+২
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
৬+৬
সকলি গরল ভেল ।। ৬+২
—জ্ঞানদাস

(গ) ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
৬+৬
অবনি বহিয়া যায় । ৬+২
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে ৬+৬
মদন মুরুছা যায় ।। ৬+২
—গোবিন্দ দাস

৬. দীর্ঘ ত্রিপদীঃ ৮+৮।। ১০
একা কুম্ভ কাখে করি যমুনাতে
জল ভরি
জলের ভিতর শ্যামরায় ।
ফুলের চূড়াটি সাথে মোহন
মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে মিশায় ।।
—জ্ঞানদাস

৭. বৈষ্ণব মহাজন পদে সংস্কৃত ছন্দের অনুকৃতিঃ ছন্দ তোটক। গঙ্গাদাস কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী'তে তোটকের লক্ষণ 'বদ তোটকমব্ধিসকারযুতম্ ।' যে ছন্দের প্রতি চরণে চারিটি 'সগণ থাকে তাহা তোটক ! 'সগণ' প্রথম দুই বর্ণ লঘু শেষ বর্ণ গুরু ।

কলধৌ/তকলে/বর গো/রতনু ।
তছু স/ঙ্গ ওর/ঙ্গ নিতা/ই জনু ।।
কোটিকা/মজিনে/কিয়ে অ/ঙ্গ ছটা ।
অবধৌ/ত বিরা/জিত চ/ন্দ্র ঘটা ।।
—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণবপদাবলীর ভাষাশৈলীর উদাহরণ

১. নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান ।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান ।।
সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোরী ।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ।।
—বিদ্যাপতি

২ কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত ।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত ।।
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি ।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ।।
—চণ্ডীদাস

৩. আধক আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি
কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ।।
সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে
বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম।।
—গোবিন্দদাস

৪. বঁধু, তোমার গরবে
গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে।।
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।।
—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সঙ্কলিত কয়েকটি অর্থগৌরবধন্য ও বহুশ্রুত পদাংশ

১) পুরুষ ভমরসম
কুসুমে কুসমে রম
পেঅসি কর এ কি পারে।
—বিদ্যাপতি

২) পরক বেদন দুখ ন বুঝয়ে মুরুখ
পুরুষ নিরাপন চপলমতী।
—বিদ্যাপতি

৩) ভাল মন্দ দুই সঙ্গচলি জায়ব
পর উপকার সে লাভ।
—বিদ্যাপতি

৪) সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
—বিদ্যাপতি

৫) শীতের ওড়ণী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।
—বিদ্যাপতি

৬) হাথক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
—বিদ্যাপতি

৭) সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া
মরমে পশিলগো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
—চণ্ডীদাস

৮) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়। —চণ্ডীদাস

৯) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
—চণ্ডীদাস / জ্ঞানদাস

১০) সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
চণ্ডীদাস / জ্ঞানদাস

১১) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে
মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি
অঙ্গ মোর ॥ —জ্ঞানদাস

১২) রাঙের পোয়ে কি সোনার সাধ ॥
—জ্ঞানদাস

১৩) হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।
—গোবিন্দদাস

শাক্তপদাবলীর ছন্দ

বলাবাহুল্য, শাক্তপদাবলী ভাবের নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় ও ভক্ত-হৃদয়ের যথার্থ প্রকাশে এক উল্লেখ্য সমন্বিত সাহিত্য। মাতৃসাধনার এমন মহিমাদ্যোতক সাধন-সঙ্গীত বাংলায় নাই। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে রচনারীতি বা আঙ্গিক নির্মাণে শাক্তপদাবলীতে যথেষ্ট সচেতন শিল্পিমানসের পরিচয় অল্প। শাক্ত কবিগণ বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস জগদানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবকবি বা ভারতচন্দ্র প্রমুখ মঙ্গলকবিদের মতো 'রসনারোচন শ্রবণবিলাস রুচির পদ' রচনা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কাব্যকায়া গঠনে উদ্যোগী হন নাই'। শাক্তপদসাহিত্যে ভক্তকবিবৃন্দ জগজ্জননীর নিকট নিজজীবনের আকুতি উপস্থাপিত করিতে যেমন সহজ সরল ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন তেমনি তাহার ছন্দকেও পারিপাট্যরহিত করিয়াছেন।

তবুও শাক্তপদাবলীর ছন্দ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দই অধিক, মাত্রাবৃত্ত বিরল বলিতে হয়। এখানে উল্লেখ থাকে প্রায় সব শ্রেণীর ছন্দে পর্বের মাত্রা সমতা অটুট রক্ষিত হয় নাই। পর্বে পর্বে চরণে চরণে মাত্রা গণনার মধ্যে তারতম্য আছে। অক্ষরবৃত্তে তানের প্রভাবে, স্বরবৃত্তে শ্বাসাঘাতের আধিক্যে সে তারতম্য অনেক সময় ধরা পড়ে না। মনে রাখিতে হয় শাক্তপদাবলী সঙ্গীত, এখানে সুরধর্মই তাহার প্রাণ; ছন্দের অনুশাসন এখানে প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে।

আমরা কয়েক প্রকার ছন্দের পরিচয় এখানে রাখিতেছি ঃ

এক) অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ ঃ

ক) পয়ার বা দ্বিপদী

১) জনকভবনে যাবে / ভাবনা কি তার। ৮+৬ = ১৪ মাত্রা
আমি তব সঙ্গে যাব / কেন ভাব আর ॥

২) আর কেন কাঁদ রানী / উমারে আনিতে যাই। ৮+৮ = ১৬ মাত্রা
গেলে যদিকৃত্তি বাস / না পাঠান ভাবি তাই ॥

৩) বল গিরি এ দেহে কি / প্রাণ রহে আর। ৮+৬=১৪ মাত্রা
মঙ্গলার না পেয়ে মং / গল সমাচার ॥ (শব্দখণ্ডন লক্ষণীয়)

৪) বারে বারে কহ রাণী / গৌরী আনিবারে।
জানতো জামাতার রীত / অশেষ প্রকারে ॥

[এখানে 'জামাতার রীত' পর্বে একমাত্রা বেশী আছে, কিন্তু তানের প্রবাহে তাহা লক্ষিত হয় না।]

খ] ত্রিপদী: (লঘু)

১. জান না রে মন / পরম কারণ। ৬+৬
কালী কেবল / মেয়ে নয়। ৬+৫
মেঘের বরণ / করিয়ে ধারণ। ৬+৬
কখন কখন / পুরুষ হয় ॥ ৬+৫

[এখানে 'কালী' 'মেয়ে' তিন মাত্রার মতো দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়]

২ ত্রিপদী (দীর্ঘ)

অতি অবশেষে নিশি। গগনে উদয় শশী। ৮+৮
বলে উমা ধরে দে / উহারে। +৮+৪
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখ / মলিন ও মুখ শশী। ৮+৮
মায়ে ইহা সহিতে কি / পারে ॥ +৮+৩

গ] চৌপদী (দীর্ঘ)

১. পথশ্রমে স্বেদে / সিক্তকলেবর ॥ ৬+৬
ক্ষুধায় মলিন / হয়েছে অধর ॥ ৬+৬
যত্নে ক্ষীর সর / রেখেছি মা ধর ॥ ৬+৬
দিব বদন ক / মলে ॥ ৬+২

২. লঘু চৌপদী

জনক ভূপতি যার ৮
দুখিনী নন্দিনী তার ৮
বন্ধু যার রত্নাকর ৮
বাস হিম ঘরে। ৬

দুই] স্বরবৃত্ত (পয়ার):

১. সারাদিন ক / রেছি মাগো / সঙ্গী লয়ে / ধুলা খেলা। ৪+৪+৪+৪
ধুলো ঝেড়ে / কোলে নে মা / এসেছি গো / সন্ধ্যা বেলা।

২ কৈ হে গিরি / কৈ সে আমার / প্রাণের উমা/ নন্দিনী। ৪+৪+৪+৩
সঙ্গে তব / অঙ্গনে কে / এলো রণ / রঙ্গিনী।

তিন] মাত্রাবৃত্ত

১. প্রসাদ হাসিছে / সরসে ভাসিছে / বুঝেছি জননী / মনে বি-চারি।
মহাকাল কানু / শ্যামাশ্যাম তনু / একই সকল / বুঝিতে না-রি ॥
৬+৬+৬+৬

২. ললাট ফলকে / অলকা ঝলকে / নাসা-নলকে / বেসরে মনি !
মরি / হেরি একিরূপ / দেখদেখ ভূপ / সুধারস কূপ / বদন খানি ॥
৬+৬+৬+৫

শাক্তপদাবলীর ভাষাশৈলীর উদাহরণ

(ক)

১. গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে ক'রবো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না ॥
—রামপ্রসাদ সেন

২. সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী ?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী !
নির্ঝরিণীর জল, হ'ল নিরমল
ঐ এল হেসে শ্বেত শতদল
শতদল বাসিনী কোথায় আমার বল ? —গোবিন্দ চৌধুরী

৩. পুরবাসী বলে—"উমার মা
তোর হারা তারা এলো ওই।"
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
"কই উমা" বলি "কই" ! —গদাধর মুখোপাধ্যায়

৪. রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায় ! —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৫. মা বসন পর
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো ॥ —রামপ্রসাদ সেন

৬. সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'।
—রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

৭. হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে। —নবাই ময়রা

শাক্তপদাবলীর ভাষাশৈলীর উদাহরণ

(খ)

১. বিষমোজ্জ্বল জ্বলাবিভাসিত কপাল,
খল খল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী, ভীমা ভুবনবাসিনী।—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২. বামা হাসিছে, ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুংকার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।
বামা টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥—ঈশ্বর গুপ্ত

৩. ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী
কাতর কিংকরে হের হরমোহিনী।
কংকালী করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি,
গিরিজা গণেশজননী (মাগো)। —দর্পনারায়ণ কবিরাজ

৪. বিহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে!
নারী হ'য়ে রণে একি রহস্য,
অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য,
ঈষৎ হাস্য যুক্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে॥ —নন্দকুমার রায় (মহারাজ)

৫. নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দুল ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসাধনী॥ —শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)

৬. রঙ্গে নাচে রণ মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ংকরী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

।। রাধাকৃষ্ণ কথা ঃ শাক্তপদকারবৃন্দ, মধুসূদন, ভানুসিংহ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ।।

রাধাকৃষ্ণ কথা তথা ব্রজবিষয় বাঙালী কবি-সাহিত্যিক মানসে যে অসীম প্রভাব রাখিয়াছে 'শ্যামাগানে শ্যামভাবনা' প্রবন্ধে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নবাই ময়রা, গোবিন্দ চৌধুরী, শম্ভুচন্দ্র রায়, রামদুলাল নন্দী প্রমুখ শাক্তকবিগণের রচনা আলোচনাক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

কৃষ্ণকথা-সংবলিত ব্রজবিষয়কে আমাদের বঙ্গভূমি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল মধুসূদনের সাহিত্যবিচিত্রা তাহার অন্যতম প্রমাণ। 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র প্রথম ও চতুর্থ সর্গে স্থানে স্থানে কালিন্দীকূলের কুঞ্জভাবনা ও বিরহিণী রাধার কথা স্থান পাইয়াছে। 'মেঘনাদবধে'র প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে প্রসঙ্গক্রমে ব্রজ-বিষয়ের উপস্থাপনা। মধুরচিত 'ব্রজাঙ্গনা'র নামেই প্রকাশ সেখানে ব্রজবালা রাধার উপজীব্যতা। মধুসূদনকে তাঁহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন 'মধু তোমার কাব্যে সিংহনিনাদ শুনেছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কি তোমার হাতে বাজতে পারে না?' তারই উত্তর এই ব্রজাঙ্গনা। মধুসূদনের চিত্ততটে যেখানে উত্তাল জলধি-গর্জ্জন শব্দিত হইয়াছিল সেইখানেই ধ্বনিত হইল যমুনার মধু-মধুর কলধ্বনির শ্রুতিরম্য সঞ্চার। এখানে বংশীধ্বনি, জলধর, যমুনাতটে ময়ূরী, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি, ঊষা, কুসুম, মলয়মারুত, গোধূলি, গোবর্দ্ধনগিরি, সারিকা, কৃষ্ণচূড়া, নিকুঞ্জবনে সখী বসন্তে প্রভৃতিতে ব্রজাঙ্গনাবিরহ বিলসিত হইয়া আছে। কাব্যের সেই ব্রজাঙ্গনা-রাধার ব্যাকুলতার হেতু ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের মুরলী-শ্রবণ, পদাবলী সাহিত্যে যে মুরলী-শ্রবণে রাধার এ-কুল ও-কুল ভাসিয়া গিয়াছিল, নিস্তরঙ্গ কুলবতীজীবনে তরঙ্গ জাগিয়াছিল প্রবল রূপে। মধুসূদন একস্থলে লিখিলেন ঃ

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে
রাধিকা রমণ
চল সখি! ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

আবার কোথাও ব্রজভূমিতে রাধার নিঃসীম অসহায়তার প্রকাশ 'হায়রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার'। বৈষ্ণব মহাজন বচনে 'আনের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি'—রাধা-ভণিতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

'বীরাঙ্গনা'র 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'র পত্র ব্রজভাবনার অনেক পরিচিতি বহন করে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর 'পরিচয়', 'কল্পনা', 'জয়দেব' প্রভৃতি কবিতা ব্রজভাবনাবিষয়ক।

ভানুসিংহ-রবীন্দ্রনাথের এক সমুল্লেখ্য সৃষ্টি 'ভানু সিংহের পদাবলী' বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর ধারাবাহিত। সেখানে মাধব-শ্যামের সঙ্গে সখীসহিতা রাধা, বর্ষা-বসন্ত, মিলন-বিরহ সবই আছে। সেখানে আছে বংশী নিঃস্বন,

'গোপবধূজন বিকশিত যৌবন, পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন, নীলনীর'পর ধীর সমীরণ'। অধিক কী, বিষয় বস্তুর সঙ্গে ব্রজবুলী-মাধুরীমুগ্ধ ভানুসিংহের ব্রজবুলী-অনুসরণে ভাষা-রচন-প্রয়াস আছে। তার এক যথার্থ উদাহৃতি ঃ

পিনহ চারু নীলবাস হৃদয়ে প্রণয় কুসুমরাশ
হরিণনেত্রে বিমলহাস কুঞ্জবনমে আও লো ।।
ঢালে কুসুম সুরভ ভার ঢালে বিহগ সুরবসার
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার বিমল রজত ভাতিরে ।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যূথি জাতিরে ।।

রাধাকৃষ্ণ কথাকে অবলম্বন করিয়া অন্য যে সকল বাঙ্গালী কবি-গীতিকার রসিক বাঙ্গালীর হৃদয়-মন-তর্পণে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেন অন্যতম। যমুনায় জল আনিতে গিয়া যমুনাসোপানবর্তিনীমূলে কিংবা বনান্তরালে বংশীশ্রবণে রাধা হৃদয়ের ভাবতরঙ্গের সংক্ষুব্ধ অনুভূতি পদাবলীতে কাব্যশরীরিণী হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহারই ছায়া অতুলপ্রসাদের এক সঙ্গীতে। সঙ্গীতে রাধা অনুল্লিখিতা। কবি-অন্তরে রাধাভাবে পূর্ণাবিভাব। অভিসার স্পৃহা বলবতী। কুঞ্জকাননে বাঁশরী বারংবার বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। অন্তরের সম্বরণ সম্ভব হয় কি করিয়া! মুরলীরবে সুরধনীতে নৃত্য লাগে, পিককণ্ঠে আকুল গান জাগে. প্রাণে বহে পেমমন্দাকিনী ঃ

বাজে বাজে গো বাঁশরী নিকুঞ্জ কাননে
অন্তর সম্বরি রাখি কেমনে !
নাচে সে মুরলী শুনি সুরধুনী—
আকুল পিককুল গাহে সুতানে ।

অতুলপ্রসাদের রাধাকৃষ্ণোপজীব্য সঙ্গীতভাবনার এক বিখ্যাত গান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। গানটি কীর্তনাঙ্গ ঃ

আজ আমার শূন্যঘরে আসিল সুন্দর
ওগো অনেক দিনের পর ।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর
ওগো অনেক দিনের পর ।

বলাবাহুল্য গানটি শুনিয়া সহৃদয় পাঠকের মনে হইবে দীর্ঘ অদর্শনের পর ভুবনসুন্দর কৃষ্ণ বুঝি রাধাকুঞ্জে আসিয়াছেন এবং মনে পড়িবে চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদ 'বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইতে পরাণ গেলে।' কেবল একটি নয়, বৈষ্ণব-ভাবনায় অধিবাসিত তাঁহার গীতচয় ক্ষণে ক্ষণে বৈষ্ণব-মহাজন গান স্মরণ করাইবে।

শ্যামাসঙ্গীতের মতো রাধাকৃষ্ণ কথার সঙ্গীতও কবি নজরুল ইসলামের রচনায় ভাবাবেশ, পদলালিত্য ও সুরের অনুপম মাধুরীতে ধরা দিয়াছে। কেবল

রাধাকৃষ্ণোপজীব্য সঙ্গীত নয়, নদীয়া সুন্দর চৈতন্যচন্দ্রকে লইয়া তাঁহার গানের শিল্পকর্ম। এক উদাহরণ ঃ

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়
তারে কেউ বলে শ্রীমতি রাধা
কেউ বা বলে শ্যামরায়।
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে
রাধাকৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে
কেউ বলে তায় গৌরহরি
কেউ অবতার বলে তায়।

বৈষ্ণবপদ সাহিত্যের মতো নজরুল রচনাতেও বাল্যলীলা, গোচারণ, রূপবর্ণন, পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, হোলী, ঝুলন, রাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গীতের সন্নিবেশ। বৈষ্ণবকাব্যে রাধা-আর্তি বহুধা প্রকাশিত। বিংশশতাব্দীর নজরুল সঙ্গীতে এই রাধা আর্তি অতুলনীয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে মথুরাগত কৃষ্ণের প্রতি রাধার দূতীবিসর্জন দেখি। মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যোগিনীবেশে ফিরিবার জন্য অনুরূপবেশ-বাসে সাজাইতে সখীর প্রতি শ্রীমতীর আহ্বানও শুনি। নজরুলে কৃষ্ণান্বেষণকারিণী রাধা স্বয়ম্' সহজচারু শব্দসন্নিবেশে রাধার বেদনাতুর অভিমানের স্পর্শ সহৃদয়-হৃদয় কে স্পর্শ করে, করে আকুল ঃ

আমার হৃদয়ের রাজা রাজ্য পেয়েছে
দেখিতে যাইব আমি
যদি চিনিতে না পারে আসিব লো ফিরে
দুয়ারে ক্ষণেক থামি।

বিভিন্ন শাক্ত কবি, মধুসূদন, ভানু সিংহ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের রচনায় রাধাকৃষ্ণ কথার ধারা আমরা সংক্ষেপেই আলোচনা করিলাম। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর রসধারা যুগে যুগে সমগ্র বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছে—এ কথা বলা বাহুল্য অন্যান্য কবির রচনায়ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।*

* প্রস্তুত গ্রন্থে শাক্তপদাবলীর ধারায় ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিবৃন্দ বিষয়ে আলোচনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তাহার সঙ্গে সমতা বিধান করে। পরম বিবুধ শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের নির্দেশক্রমে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি পরিশিষ্টাংশে সংশ্লিষ্ট হইল।

শাক্তপদাবলী হইতে সঙ্কলিত কয়েকটি প্রবচন ও সুভাষিত-পর্য্যায়ের উদাহৃতি

(১) মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?—রামপ্রসাদ সেন

(২) কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো—ঐ

(৩) ম'লেম ভূতের বেগার খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে—ঐ

(৪) বলমা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শংকরী হেথা—ঐ

(৫) আমায় দেওমা তবিলদারী
আমি নিমক্‌হারাম নই শংকরী—ঐ

(৬) শ্মশান ভালবাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি ।।—রামলাল দাস দত্ত

(৭) মনরে কৃষিকাজ জাননা
এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা—
—রামপ্রসাদ সেন

(৮) মনগরীবের কি দোষ আছে ।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে—ঐ

(৯) ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে !—রসিকচন্দ্র রায়

(১০) সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি 'আমি' ।—রামদুলাল
নন্দী (দেওয়ান)

(১১) আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানসী ।—রামপ্রসাদ সেন

পরামৃষ্ট—সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বৈষ্ণব পদাবলী/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত
বৈষ্ণব পদাবলী/ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
পদকল্পতরু/বৈষ্ণবদাস সংকলিত, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত
গৌরপদতরঙ্গিণী/মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত
পদামৃতমাধুরী (১ম—৪র্থ খন্ড)/খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ব্রজবাসী সম্পাদিত
পদাবলী পরিচয়/ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধনা/ঐ
বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া/ঐ
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১ম-৪র্থ)/হরিদাসদাস

পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম)/স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে/ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি/ডঃ জনার্দন চক্রবর্তী
কীর্তন/খগেন্দ্রনাথ মিত্র
পদাবলী সাহিত্য/কালিদাস রায়
চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা/ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ
বৈষ্ণবরস প্রকাশ/ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ/ডঃ সুকুমার সেন
বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়/ডঃ নীলরতন সেন
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য/শঙ্করীপ্রসাদবসু
A History of Brajabuli Literature/Sukumar Sen
The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal/
Dr. Dinesh Sen
Early History of Vaisnava Faith & movement/Dr. S.K. De
Obscure Religious cult/Dr. S.B. Dasgupta.
শাক্তপদাবলী/কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত
রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী/বসুমতীসাহিত্যমন্দির প্রকাশিত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্যঃ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা/জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ/ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/ডঃ সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/ডঃ ভূদেব চৌধুরী
নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি/সম্পাদনা ঃ ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যদর্শ—দণ্ডী/ ,, ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন/ ,, ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়
নাটক লক্ষণ রত্নকোষ—সাগরনন্দী/,,ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ/,, ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলনীলমণি—রূপগোস্বামী/,, হরিদাস দাস
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—ঐ/,, ঐ
অলংকার চন্দ্রিকা—শ্যামাপদ চক্রবর্তী
কাব্যালোক—ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত
কালিদাস গ্রন্থাবলী—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথবিদ্যাভূষণ
অগ্নিপুরাণ ঃ ব্যাস/সম্পাদনা ঃ আচার্য বলদেব উপাধ্যায়
বিষ্ণুপুরাণ ঃ ঐ } আর্যশাস্ত্রপ্রকাশন
ভাগবত ঃ ঐ }

বেণীসংহার : ভট্ট নারায়ণ/মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য
মালতীমাধব : ভবভূতি/ঐ
প্রবোধচন্দ্রোদয় : কৃষ্ণমিশ্র যতি /শ্রীবাসুদেব শর্মা
বিদগ্ধমাধব : রূপগোস্বামী/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
গাথাসপ্তশতী : হাল/শ্রীপার্বতী চরণ ভট্টাচার্য
প্রাকৃত প্রকাশ : বররুচি/পণ্ডিত উদয়রাম শাস্ত্রী
নলচম্পূ : ত্রিবিক্রমভট্ট/পণ্ডিত কৈলাশপতি ত্রিপাঠী
কাব্যমীমাংসা : রাজশেখর/সি. ডি. দালাল
অমরু শতক/ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
রবীন্দ্ররচনাবলী—ভানুসিংহের পদাবলী, আধুনিক সাহিত্য ও অন্যান্য
জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ/ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নরহরিচক্রবর্তী জীবনী ও রচনাবলী/ডঃ মিহির কুমার চৌধুরী
বক্রোক্তিজীবিত / কুন্তক, অলংকার-কৌস্তুভ-কবিকর্ণপুর, ভাবপ্রকাশন-সারদাতনয়, রাজ্যানুশাসন—হেমচন্দ্র, নাট্যদর্পণ—ভেঞ্জল, ষট্ সন্দর্ভ—জীবগোস্বামী
হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ / হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য